পুতুল দিদি

বিমল মিত্র

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

নীলনেশা ... ১

বংশধর ... ২৪

লজ্জাহর ... ৪৭

জেনানা সংবাদ ... ৬১

পুতুল দিদি ... ৯০

আমৃত্যু ... ১১২

মনের গহনে ... ১৩৪

মিলনান্ত ... ১৫৩

দড়ি ... ১৬৯

আর একজন মহাপুরুষ ... ১৭৮

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু—

নীলনেশা

রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের শ্বশুরও রায়সাহেব। রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি। শ্বশুর-জামাই দু'জনেই রায়সাহেব, এমন যোগাযোগ সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু শ্বশুর-জামাই দু'জনের বহু দুর্ভাগ্যের ফলেই বুঝি এমন ঘটেছিল।

ঘটনাটি ঘটেছিল পাটনায়।

মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় তখন পাটনা সেক্রেটারিয়েটের সামান্য একজন সুপারভাইজার থেকে পদোন্নতি হয়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। সহরে এবং অফিসে বেশ প্রতিপত্তি। সামনের সব ক'টা উন্নতির ধাপ চোখের সামনে জল্ জল্ করছে। একটিমাত্র ছেলে, একটিমাত্র রূপসী স্ত্রী এবং একটি সুন্দর অট্টালিকার মালিক। ব্যাঙ্কের টাকায়, স্বাস্থ্যের জৌলুসে, প্রতিপত্তির প্রসারে মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের বৃহস্পতি তখন তুঙ্গীই বলতে হবে।

সেই সময়ে সেই চৌদ্দ বছর আগে চাকরি খুইয়ে রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি মেয়ের কাছে এলেন। সঙ্গে আরো তিনটি অবিবাহিতা মেয়ে। জ্যোটি, লোটি আর রুবি। জ্যোটি, লোটি আর রুবিকে নিয়ে মিলির বাড়ীতে থেকেলেন। মিলি বড় মেয়ে।

মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় স্টেশনে গিয়েছিলেন মিলিকে নিয়ে। শ্বশুরকে আনতেন। রাশ-ভারী, সৌখীন, সাহেবী মেজাজের লোক। সস্ত্রীক রিসিভ্ করতে না গেলে কী ভাববেন তিনি।

শীতকাল সেটা। তাঁর পেটেণ্ট থ্রি-পিস্ স্যুট্, সাহেব-বাড়ীর অভিজ্ঞ টেলারের তৈরী। হাতে স্টিক্। বাটন্-হোলে বোকে। মাথায় ফেল্ট হ্যাট্—বাঁকানো। মুখে লম্বা চুরুট।

চায়ের টেবিলে মিলি বললে—তুমি তা'হলে চাকরি ছেড়ে দিলে বাবা?

সেই সময়ে চৌদ্দ বছর আগে চাকরি ছেড়ে দেওয়া চারটিখানি কথা নয়। বিশেষ করে জ্যোটি, লোটি, রুবির তখনও বিয়ে দিতে হবে। সারা জীবন মোটা মাইনে পেয়েছেন, আর দু'হাতে খরচ করেছেন। না করেছেন একটা বাড়ী, না জমিয়েছেন টাকা। কেবল লাঞ্চ, পার্টি আর স্যুট।

মিলির কথার উত্তরে বললেন—চাকরি আর করবো না রে মিলি—

—তা' হলে'? কথাটা বলতে গিয়ে বড় মেয়ের গলায় যেন আটকে গেল।

—বাঃ, তা' তোরা আছিস কি করতে?

বলে হাসতে হাসতে চুরুট ধরালেন একটা। তারপর বললেন—আমি বুড়ো বাপ সারা জীবন চাকরি করি, এইটেই তুই চাস নাকি?

কথাটা বলে মিলি, জ্যোটি, লোটি, রুবি শেষ পর্যন্ত জামাই মৃত্যুঞ্জয়ের মুখের ওপর চোখ বুলালেন। কিন্তু কেউ হাসলে না দেখে নিজেই হো হো শব্দে হেসে উঠলেন।

তারপর চায়ে চুমুক দিয়েই বললেন—এ কি চা রে মিলি? কত করে পাউণ্ড? ফ্লেভার নেই তো তেমন—

আড়চোখে স্বামীর দিকে চেয়ে মিলি কুণ্ঠিত হয়ে বললে—কেন বাবা, এ তো দামী চা।

—তা' হোকগে দামী, আমার জিভে এ-চা চলবে না মা—

ঘাড় নাড়তে লাগলেন রায়সাহেব জে ডি. ব্যানার্জি। সদ্য কলকাতা ফেরত। পাটনার পাড়াগেঁয়ে মেয়ে-জামাইকে ফ্যাশন শেখাবার অধিকার আছে বৈকি তাঁর।

—আর, এ কাপ ডিশ্‌ও চলবে না, আর কিছু না হোক্ চা-টা বাপু আমাকে দিয়ে পছন্দ করিয়ে কিনো, চা-টাই যদি পছন্দ মত না খেলুম তাহলে বেঁচে থেকে লাভ ?

কিন্তু দেখা গেল রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জির কিছু পছন্দ হওয়াই ভারি শক্ত।

—লুঙ্গি দিয়ে কখনও জানলা-দরজার পরদা হয় ? মৃত্যুঞ্জয়ের দেখছি সবই পাটনাই টেস্ট—

—বাড়ী করেছ, কিন্তু ডাইনিং হল-এর স্ট্যাণ্ডার্ড সাইজই জানো না—

—ড্রইং রুমে জর্জ দি ফিফ্‌থ্‌-এর ছবি রেখেছ, কিন্তু কুইন মেরীর ছবিটা নেই পাশে—ইংরেজদের চরিত্রে এইটে পাবে না, এই সেন্‌স্ অব্ প্রোপোরশনের অভাব···

—আ···হা·· তোমাদের কিচেনের পোজিশনটাই ঠিক হয়নি, কিচেন হবে নর্থ-ঈস্ট্ কর্ণারে—মৃত্যুঞ্জয়ের দেখ্‌ছি······সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হলে কি হবে······

পরদিন থেকে রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি সংস্কারে লেগে গেলেন। জ্যোটি, লোটি আর রুবি আদেশ পালন করে। মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীর সামনের গেট্-এ ট্যাবলেট্ লাগানো হলো। পালিশ করা সেগুন কাঠের বোর্ডের ওপর "রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি" লেখা। বিকেল বেলা ড্রসিং গাউন পরে একবার বাগানে দাঁড়িয়ে দেখে এলেন। তারপর নিজের চুরুটের আর চায়ের ব্র্যাণ্ড লিখে চাকরকে বাজারে পাঠানো হলো। নতুন নেটের পর্দা এল দরজা-জানলার জন্যে। মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে থেকে থেকে মিলিটারও টেস্ট খারাপ হয়ে গেছে।

মিলির টেস্ট মৃত্যুঞ্জয়ের টেস্ট সকলের টেস্ট বদলাবার চেষ্টায় লেগে পড়লেন জীবনপণ করে রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি। প্রথম দিনটি ···সেরক।

মিলি বললে—ওপরের দক্ষিণের ঘরটাতেই তোমার থাকবার ব্যবস্থা হলো বাবা—

বাড়ীর শ্রেষ্ঠ ঘর সেটা।

ঘরখানা গোছানো হলো। রায়সাহেবের পছন্দমত গোছানো হলো। শোবার খাটের পাশে 'হোয়াটনট্'। চিঠি লেখবার টেবিল একটা জানলার দিকে মুখ করে। একটা ট্রিপয়। আর খাটের দিকে মুখ করে বসানো ড্রেসিং আলমারী। রায়সাহেব বললেন—লর্ড কিচেনারের বেডরুম এইরকম সিম্প্‌ল ছিল—

তখন কি মিলি জানতো, না মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় জানতেন। কেউ জানতো না। জ্যোটি, লোটি, রুবিও জানতো না যে, চৌদ্দ বছর রায়সাহেব এ-বাড়ীতে থাকবেন। শুধু থাকা নয়, সদম্ভে সগৌরবে থাকবেন মাথা উঁচু করে।

দেশী ইংরিজী একখানা দৈনিক পত্রিকা আসতো মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে। তিনি বাতিল করে দিলেন। কুড়ি বছর "হোয়াইটম্যানে" সহ-সম্পাদকের চাকরী করে এসেছেন। ওইটে চাই। "হোয়াইটম্যান" আসতে লাগলো পরদিন থেকে।

চায়ের টেবিলে পরোটা বা ওমনি কিছু একটা হোত।

রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি আপত্তি করলেন।

—তোদের এইটে ভারি খারাপ সিস্টেম মিলি, টেবিলে খাবি অথচ লুচি পরোটা, দু'তিন টাকা বেশী পড়ে বটে, কিন্তু বেকারীতে বলে রাখলো রোজ সকালে কেক বা পেস্ট্রি দিয়ে যায়—কোনও হাঙ্গাম নেই, কত পরিশ্রম বাঁচে,……

পরদিন থেকে তা-ই হলো।

বাথরুমটা সাজানো গেল নতুন করে। বিলিতি টুথ পেস্ট, বুরুশ, হেয়ার অয়েল আর সাবান। বাজারের শ্রেষ্ঠ জিনিস সব। টেবিলে উঠলো বিলিতি লেটার প্যাড।

মিলির বাবা, মৃত্যুঞ্জয়ের শ্বশুর। রায়সাহেব শ্বশুর। সৌখীন ইংরিজী জানা পাকা সাহেব শ্বশুর। খাতিরের কোনও ত্রুটি রাখলেন না জামাই।

সেক্রেটারিয়েটের বন্ধুবান্ধব আসে বাড়ীতে।

মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় আলাপ করিয়ে দেন—ইনি আমার শ্বশুর, রায়-সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি—

চুরুটটা মুখে লাগিয়েই রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি মাথা নাড়েন। ভোরবেলা শার্টের গলায় টাই থাকে না, কেমন যেন খালি গা—খালি গা মনে হয় তাঁর।

বলেন—মেজর উইন্‌স্‌ফোর্থ যেবার বেঙ্গল গবর্ণরের মিলিটারী সেক্রেটারী, সেইবার আমি রায়সাহেব হলুম—কিন্তু এখন রায়সাহেবিটাও ছ্যা ছ্যা হয়ে পড়ছে—রামা-শ্যামা—ডিক্-হ্যারি সবাই পাচ্ছে—কোনও ইজ্জৎ রইল না আর আমাদের—

তারপরেই প্রশ্নকর্তা যদি প্রশ্ন করেন তো ভালোই, না হলে নিজের রায়সাহেব হওয়ার ইতিহাসটা নিজেকেই বলতে হয়—

'হোয়াইটম্যান'-এ আমার লীডার পড়েই তো প্রথম মেজর উইন্‌স্‌ফোর্থ চমকে যায়, খাস্ বাচ্ছা কিনা, বিলিতী গুণের কদর করতে জানে—তার যখন শুনলে লিখেছে একজন বাঙালী আরো অবাক, একদিন নেমন্তন্ন করলে ডিনারে। বললে—বাঙালীর মধ্যেও যে জিনিয়স জন্মায় এটা তোমাকে দেখার আগে কল্পনাও করতে পারিনি মিস্টার ব্যানার্জি—ওয়েল্, তখনও আমি শুধু মিস্টারই ছিলাম কিনা—

তারপরেও যদি প্রশ্নকর্তা আগ্রহ না দেখান, তখন নিজেকেই বলতে হয়—

—আশ্চর্য হ'য়ে গেলেন মেজর যখন শুনলেন আমি একটা রায়সাহেবিও পাইনি। বললেন—ওয়েল্, এটা আমারই কর্তব্য, দেখি আমি কী করতে পারি—

রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি সে-প্রশ্নের উত্তর দেবেন না। চুরুটটাকে দাঁতে চেপে সেইখানে বসেই বহুদিন আগে শেখা মেজর উইন্‌স্‌ফোর্থের সুরের অনুকরণ করে চীৎকার করবেন—মহারাজ—চা—

আগে হাতে করে চায়ের কাপ দেওয়া হোত। রায়সাহেব আসার পর ট্রের বন্দোবস্ত হয়েছে।

বিকেলবেলা একটা পর্ব আছে রায়সাহেবের। সামান্য পর্ব নয়। ঝাড়া ঘণ্টা খানেক লাগে। তখন বেরোয় আলমারী থেকে নিভাঁজ স্যুটগুলো। একটা একটা করে মিলি কিংবা জ্যোটি, লোটি, রুবি যে কেউ নামিয়ে দেয়। যেটা কাল পরেছেন আজ সেটা পরতে নেই। সবগুলো বিছানার ওপর পর-পর বিছিয়ে দিতে হবে। রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি একটা সেট বেছে নেবেন তারি মধ্যে থেকে। কোনও দিন ওয়ালনাটের স্টিক, কোনও দিন য়্যাশ্‌ কাঠের। স্যুটের সঙ্গে যেন ম্যাচ করে। মাথায় লাইট নেভি-ব্লু ফেল্ট হ্যাট্। আর ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে দাঁতে কামড়ানো চুরুট। পায়ে পেটেণ্ট লেদারের শু।

হাতের পাঁচটা আঙুলের মতন ওই চুরুটটা ছিল তাঁর শরীরের সঙ্গে একাত্ম। বাথরুমে যাবার সময়ও মুখে থাকতো চুরুট। মিলির মনে পড়ে না বাবাকে কখনও সে চুরুট ছাড়া দেখেছে। কোথাকার কোন্ লর্ড স্যালিস্‌বারী নাকি মারা যাবার পর হিসেব করে দেখা হয়েছিল জীবনে যত চুরুট তিনি খেয়েছেন তা' জোড়া দিলে সাড়ে ছ' মাইল লম্বা হয়। তা ছাড়া চুরুট খেলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে। সেই লর্ড স্যালিস্‌বারী বলেছিলেন—ইতিহাসে কোনও চুরুটখোরের আত্মহত্যার রেকর্ড নেই—

রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি বলতেন—চুরুট খেতে শেখান আমা, মিঃ অকিনলেক—এদিকে তো পণ্ডিত লোক, ইংরিজীর মাষ্টার—ইংরি ভাষাটা গুলে খেয়েছিলেন—ওদিকে চুরুট খান আমার মত—তাঁর কাছে তো এই ইংরিজী বিদ্যেটা আর চুরুট খাওয়াটার হাতে খড়ি আমার—

স্যুট্ পরে ছড়িটি ফেলতে ফেলতে যা'রা পাটনার রাস্তায় রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জিকে হাঁটতে দেখেছে তারা জানে সেই মন্থর অথচ দ্রুত চালের মুভমেণ্ট। প্রতি পদে সেই ইলাস্টিক ষ্টেপ্। দেখেই মনে হবে যেন বিরাট গাড়ী, বিরাট বাড়ী সবই আছে—সমাজে সংসারে যেন সুউচ্চ প্রতিষ্ঠায় অধিষ্ঠিত। শুধু স্বাস্থ্যের খাতিরে একটু পদচারণা করতে বেরিয়েছেন।

একমাস পরেই হতাশার সুর বেজে উঠলো—

—নারে মিলি, যা দেখলুম তোরা পাটনায় কী সুখেই আছিস—এত-দিনের মধ্যে একটা ভদ্দরলোক নজরে পড়লো না—

পেস্ট্রির ডিশ্‌টা বাবার দিকে এগিয়ে দিয়ে চা ঢালতে ঢালতে মিলি বললে—কেন বাবা—ওই তো ইঁয়েরা রয়েছেন, হরসিংপুরের জমিদার জনকবাবুরা রয়েছেন, সব ভাই কটা বি-এ পাশ, তারপর মুন্সেফ রঘুবীরপ্রসাদ বিলেত ফেরত—তারপর নিউ-পাটনায় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের এজেণ্ট বাবুল মিত্তির এম-এ, চার্টার্ড একাউন্‌টেণ্ট রণধীর চৌহান······

—আরে ছি ছি—ওদের তুই বলিস ভদ্দরলোক,······

চায়ের কাপটা ঠোঁটে তুলতে গিয়ে একটা 'শ্রাগ্' করলেন রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি—

—কেউ ইংরিজীর 'ই' জানে না, হোয়াইটম্যান পড়ে না—আবার পলিটিক্‌স্ নিয়ে তর্ক করতে আসে, ইংরিজী জানা লোক গোটা ভারতবর্ষেই তো আছে মাত্র আড়াইটে, একটা তোদের গান্ধী, একটা টেগোর আর আধখানা······

আধখানা যে কে তা' আর বলা হলো না।

হঠাৎ যেন স্বগতোক্তির সুরেই রায়সাহেব বললেন—ইংরিজীটা কি অত সহজ রে······তা' যদি হতো···এই দেখ্‌না আজকের হোয়াইটম্যানেই তো চারটে ইংরিজীর ভুল ধরেছি······

ইংরিজী ভাষাটাই জানতেন রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি। তিনি নিজেই বলেছেন—কেমন করে শিখলেন বিদ্যেটা। ওটা বড় অদ্ভুত ভাষা নাকি। ভাবতে হয়, পড়তে হয়, লিখতে হয়, স্বপ্ন দেখতে হয়—অনেকের আবার তাতেও হয় না। ওটা অনেকটা কবি হওয়ার মতো। সবাই কি চেষ্টা করলেই কবি হতে পারে? তেমনি সবাই চেষ্টা করলেও ইংরিজী শিখতে পারে না। ওটা একটা ভগবান-দত্ত ক্ষমতা। না হলে তো রামা-শ্যামা-টম্-ডিক-হ্যারি সবাই শিখে ফেলে বসে থাকতো। ইংরিজীটা কি অত সহজ রে—

কথাগুলো অনেকটা ধমকের মত। না জেনে মিলি তার বাবাকে অন্য সকলের সঙ্গে সমান পর্যায়ে নামিয়ে ফেলেছে। কিন্তু বড় শিশুর মত সরল মন রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জির। কিছু মনে রাখেন না। বোধ হয় প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ পরের দিন মিলি নিজে বাজারে গিয়ে বাবার পছন্দ করা চুরুট আর এক বাক্স আনিয়ে দিলে।

কিন্তু হোয়াইটম্যানের কুড়ি বছরের চাকরীটা যাওয়ার পেছনেও একটা ইতিহাস আছে।

যাঁর ধ্যান জ্ঞান স্বপ্নই হলো ইংরিজী, ইংরিজীর ভুল তিনি সইবেন কেমন করে। ভুল দেখলে সইতে পারতেন না, তা' সে স্বয়ং এডিটরেরই হোক, আর নিজেরই হোক। একবার নিজেরই একটা ভুল ধরা পড়লো। উঃ সে কি আত্মগ্লানি। ছাপার অক্ষরেও বেরিয়ে গেল সেটা। সাধারণ পাঠকরা কেউই ধরতে পারলে না, এডিটরও পারেনি। কিন্তু যে-টা ভুল সেটা তো ভুলই। কেউ ধরতে পারুক আর না পারুক। নিজেকে তিনি ক্ষমা করবেন কী করে? নিজের কাছে কী কৈফিয়ৎ দেবেন তিনি?

গল্প হচ্ছিল ডিনার খেতে খেতে।

জ্যোটি, লোটি, রুবি আর মিলি। আর ওদিকে মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যা৺ পাটনা সেক্রেটারিয়েটের স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় বললেন—তারপর ?

মিলিও চচ্চড়ির ডাঁটা চিবোন থামিয়ে বললে—তারপর কী করলে বাবা ?

স্থপের চাম্‌চেটা মুখ থেকে নামিয়ে ন্যাপ্‌কিন দিয়ে দু'টো ঠোঁট মুছে নিলেন। তারপর আধখাওয়া চুরুটটা মুখে দিয়ে আবার ধোঁয়া ছাড়লেন লম্বা করে—

বললেন—ঠিক করলাম আত্মহত্যা করবো, আত্মহত্যাই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত! বোঝ আমরা সে-যুগে কতখানি জীবন দিয়ে ভালবাসতুম ইংরিজী ভাষাকে—যাক্‌গে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করা হলো না—

চম্‌কে উঠেছে মিলি। মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় নিজের মনে নিঃশব্দে খেতে লাগলেন।

ছোট মেয়ে রুবি আর চাপতে পারলে না কৌতূহল। বললে—কেন বাবা—ধরা পড়ে গেলে বুঝি ?

চুরুটটা টানতে টানতে থেমে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—এই চুরুটই আমায় বাঁচিয়ে দিলে, লর্ড স্যালিস্‌বারীর কথা মনে পড়লো—কোনও চুরুট-খোর আত্মহত্যা করেছে ইতিহাসে এমন ঘটনা পাওয়া যায় না—

রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি এক স্লাইস রুটি ছুরি দিয়ে কাটতে লাগলেন—

—তারপর এল ডান্‌কান্‌ সাহেব। স্কচের বাচ্ছা। জাঁদরেল লোক। কিন্তু ইংরিজী ভুল। ধরলাম একদিন। অতি সাধারণ ভুল। সাহেবের হাতে অমন ভুল বড় একটা দেখা যায় না। তর্ক হোল। এডিটর বলে ঠিক—য়্যাসিস্‌ট্যাণ্ট বলে ভুল।······

রায়সাহেব রুটি কামড়ালেন। তারপর বাঁ হাতের কাঁটা দিয়ে মাংস তুলে মুখে পুরলেন—

—দিলাম চাকরী ছেড়ে—

মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় তখনও রায়সাহেব হন্‌নি। বললেন—এই সামান্য কারণে চাকরী ছেড়ে দিলেন ?

—একে তুমি সামান্য বলছ ?

যেটা সত্যি কথা সেটা ডান্‌কান্‌ সাহেব জানুক। আর কারুর জানবার দরকার নেই। সেই সামান্য কারণে রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি সাতশো টাকার চাকরী ছেড়ে, কলকাতা ছেড়ে, জ্যোটি, লোটি আর রুবিকে নিয়ে এখানে চলে এলেন। মিলির বাড়ীতে। নাই বা থাকলো টাকা, সাতশো টাকার মাইনের চাকরী। মিলি আছে, মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়—পাটনা সেক্রেটারিয়েটের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আছে। জ্যোটি, লোটি, রুবির বিয়ে মিলিই দেবে। তাঁ'র ডিনার, কেক, পেস্ট্রি, চুরুট, চা, স্যুটের খরচ মিলিই দেবে।

এ সবই চৌদ্দ বছর আগেকার ঘটনা।

সেই সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় বাসি মুখে বেড্‌-টি খাওয়া। তারপর ড্রেসিং গাউনটা গায়ে চড়িয়ে চুরুট ধরানো। 'হোয়াটনট্' থেকে হোয়াইটম্যান নিয়ে পড়া। পায়জামা-পরা পা দু'টো 'হোয়াটনট্'-এর গায়ে লাগিয়ে দেওয়া আর কাগজ পড়া। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে পড়া। হাতের ফাউন্‌টেন পেন দিয়ে মার্জিনে দাগ দেওয়া। কোথাও ছাপার ভুল থাকলে তা' দাগিয়ে দেওয়া। এই কাজেই লাগে দু'ঘণ্টা। এ-সময়ে রায়সাহেবকে পৃথিবী ভুলে যেতে হয়। এই দু'ঘণ্টা তিনি সমস্ত মনোযোগ দিয়ে ছোট ছোট অক্ষরের সমুদ্রে ডুবে যান।

তারপর পড়া, ভাবা, দাগ দেওয়া যখন শেষ হয় তখন লেটার প্যাড নিয়ে লেখবার টেবিলে গিয়ে বসেন। চিঠি লিখতে বসেন। লম্বা শুদ্ধ ইংরিজীর চিঠি। হোয়াইটম্যানের সম্পাদকের নামে। কুড়ি বছর হোয়াইটম্যানের চাকরী করে এসেছেন, লেখার প্রুফ দেখেছেন। এ-কাজে তিনি অভ্যস্ত। সিদ্ধহস্ত বলা চলে। সেই অভিজ্ঞ কলম নিয়ে লিখে চলেন। চিঠির আকা[illegible]র

জানিয়ে দেন সম্পাদককে কোথায় সেদিনকার কাগজের সম্পাদক। ছাপার ভুল, নয়তো ইংরিজীর ক্রটি। বিস্তারিত সমস্ত আলোচনা। মন্তবাদ নিয়ে, কাগজের পৃষ্ঠা-সংখ্যা নিয়ে, বিজ্ঞাপন নিয়ে, কাগজের প্রচার নিয়ে। কাগজের একজন শুভাকাঙ্ক্ষীব মত ডাক-খরচা দিয়ে চৌদ্দ বছর ধরে দিনের পর দিন এমনি সমালোচনা—মৌখিক নয় লিখিত—এ যেমন বিস্ময়কর তেমনি কৌতুকজনক।

তারপর সেই চিঠি ডাকে দিয়ে আসা। যে-সে গেলে চলবে না। মহারাজকে নিজের রান্না ফেলে চিঠি ফেলে আসতে হবে। একমাত্র বিশ্বাসী লোক সে-ই।

চীৎকার করে ডাকবেন—মহারাজ—

রায়সাহেবের মেজাজী গলার আওয়াজে সমস্ত বাড়ীর ঘরগুলো গম্ গম্ করে ওঠে।

মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় তখন অফিসে যাবেন। ঠাকুর চাকর সবাই ব্যস্ত। মিলিও ব্যস্ত স্বামীর তদারকে। হাতের কাছে গুছিয়ে দিতে হবে জামা, কাপড়, গেঞ্জী, রুমাল, চাবি, সমস্ত। সেই ব্যস্ত আবহাওয়ায় মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ও ডাকলেন—মহারাজ—

মিলি বললে—মহারাজ নেই—

—কোথায় যায় অফিসে যাবার সময় ?

মিলি বলে—বাবা পাঠিয়েছেন ডাকের চিঠি ফেলতে—

রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি নিজে পাঠিয়েছেন। সুতরাং মহারাজের কোনও দোষ নেই। কিন্তু এখন তিনি অফিসে যাচ্ছেন, তিনি এ-বাড়ীর মনিব, তিনি অফিসে চলে যাবার পরই চিঠি ফেলতে পাঠালে হোত! কিছু বললেন না মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, কিন্তু যেন কেমন বিরক্ত হলেন, অন্ততঃ স্বামীর মুখ দেখে মিলির তাই মনে হলো।

আর একদিনের ঘটনা। রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি ড্রেসিং গাউন

রে বারান্দায় পায়চারী করছিলেন চুরুট মুখে। যেমন সচরাচর করে থাকেন।

একটা চাকর এধার থেকে ওধারে যাচ্ছিল ঘর ঝাঁট দিতে। ডাকলেন তাকে।

—এই শোন্—

চাকরটা সামনে এল বেকুবের মত।

বললেন—গায়ে জামা দিস্ না কেন?

মিলিকে ডেকে আনালেন। বললেন—তোদের এ কী সিস্টেম? চাকর-বাকর উর্দি না পরুক, খালি গায়ে থাকে কেন? একটা গেঞ্জি জোটে না—

সেই সময়ে একদিন পয়লা জানুয়ারী তারিখে খবর বেরুল মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় রায়সাহেব হয়েছেন। শ্বশুর রায়সাহেবই ছিলেন, এবার জামাইও রায়সাহেব হলেন। বাড়ীর গেট্-এ আর একটা ট্যাব্লেট্ ঝোলবার কথা। কিন্তু কেন জানি না মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় রাজি হলেন না।

সেদিন সকালেও রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি কাগজের উপাধির তালিকাটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়লেন। দেখলেন কা'র কা'র প্রমোশন হলো।। নতুন কে কে জাতে উঠলো।

খাবার টেবিলে বসে বললেন—এ কী রকম হলো মৃত্যুঞ্জয়······আমার সময় মনে আছে, টেলিগ্রাম এসেছিল দেড় শো, আর চিঠি বোধ হয় শ' তিনেক······কয়েকটা কাগজে ফোটোও বেরিয়েছিল—চাকরীটা রেগে ছেড়ে না দিলে রায়বাহাদুরও হয়ে যেতাম······কিন্তু তোমার বেলায় এ কী রকম হলো মৃত্যুঞ্জয়······আজকালকার লোক গুণের কদর করতে কি ভুলে

মিলিকে বললেন—তোকে বলেছিলুম মিলি তোদের এখেনে একটা

ভদ্দরলোক নেই—দেখলি তো, মৃত্যুঞ্জয়কে একটা পার্টি পর্যন্ত কেউ দিলে না……আমার মনে আছে মেজর উইন্স্‌ফোর্থ……

এ সবই চৌদ্দ বছর আগেকার ঘটনা।

তারপর চৌদ্দ বছরের প্রাত্যহিকতায় দৃশ্যপটের কতই না পরিবর্তন হয়ে গেল। মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় বরাবর কম কথার মানুষ ছিলেন, কথা কওয়া আরো কমিয়ে দিয়েছেন।

শ্বশুর জামাইবাড়ীতে বেড়াতে এসেই থাকে, কিন্তু এমন বরাবরের মত বে-আক্কেলে হয়ে যে থেকে যাবেন একথা কে জানতো।

একে একে জ্যোটি, লোটি এবং শেষ পর্যন্ত রুবির বিয়েটাও দিলেন জামাই। প্রত্যেকটা বিয়েতে মোটা রকমের খরচ করতে হলো। নইলে পাটনার সমাজে মান থাকে না। সকলের বিয়ে দিলেন জাঁক্‌জমক করে। আর তা' ছাড়া টাকা খরচের প্রশ্নটাই তো বড় নয়, মেহনত্‌ কী কম!

রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়কে কিছু দেনা করতে হলো।

মিলির গায়ের গয়না কিছু ভাঙতে হলো।

টাউনের বাইরে কিছু খোলা জমি কেনা ছিল মিলির নামে। সেটা সস্তা দরে ছেড়ে দিতে হলো।

উপ্‌রি উপ্‌রি তিনটি মেয়ের বিয়ে দেওয়া সামান্য কথা নয়। তবু রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় সেই অসাধ্যই সাধন করলেন।

একটিমাত্র ছেলে ছোটবেলা থেকে দেরাদুনে থেকে পড়তো। সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ করার পর কলেজে পড়ছে সেখানে, সুতরাং খরচ পাঠানোও বেড়েছে।

এত কাণ্ড ঘটছে, এত দৃশ্যপট বদ্‌লাচ্ছে, কিন্তু রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি তাঁর সেই উঁচু চুড়ো থেকে এক চুল নড়েন নি। সংসারের দৈনন্দিন সচ্ছলতা অসচ্ছলতার কথা যেন তাঁর জানবার কথা নয়। তিনি যে একজন ব্যয়বহুল

গলগ্রহ সেকথা ভাববার বা বোঝবার তাঁর অবসরই নেই। জামাইকে মেয়ে দিয়েছেন বলে শ্বশুরকে ভরণ-পোষণ করাও যেন জামাইয়েরই অন্যতম কর্তব্য। আর তাছাড়া তিনি তো এ-সংসারের একজন গর্বের ও গৌরবের পাত্র। রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি তিনি, চালচলনে বলনে নামধাম-পরিচয়ে যে কোনও জামাই-ই গৌরবান্বিত বোধ করবে। নিয়ে আসুক না মৃত্যুঞ্জয় দশটা নাইট, বিশটা রায়বাহাদুরকে এ-বাড়ীতে, দেখাই যাক না তারা মোহিত বিগলিত হয় কি না রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জির আদবকায়দায় কেতা-দুরস্ত ব্যবহারে, ঈর্ষান্বিত হয় কি না মৃত্যুঞ্জয়ের শ্বশুর-সৌভাগ্যে! বিলেতে তিনি যাননি সত্যি, কিন্তু অন্ততঃ দু'শো লোক তো তাঁর কাছে বিলেত যাবার আগে আদবকায়দা শিখে নিতে এসেছে। কাঁটা চামচ থেকে শুরু করে ডিনার, ড্রয়িংরুম, বাথ্, বো, স্যুট্, হাই সোসাইটির সমস্ত রকম খুঁটিনাটি।

সেদিন চা মুখে দিয়ে কাপ নামিয়ে নিলেন—

—মিলি, ছি ছি, তোদের টেস্ট দিন্‌কে-দিন কা যে হচ্ছে—

মিলি কিছু উত্তর করলে না। মিলি ভাল করেই জানে এ-চা বাবা মুখে তুলবেন না, তবু চুপ করে রইলো সে। একটু কম দাম। একটু ফ্লেভার কম। কিন্তু সব দিক ভেবেই তো চলা উচিত। উনি বলেছেন—এত দামী চা কি না হলেই চলে না? তোমার বাবাকে তো পয়সা আয় করতে হয় না, যাকে করতে হয় সে বোঝে।

কথাগুলো তো একেবারে মিথ্যেও নয়।

মিলি দেখলে বাবা চা ছুঁলেন না।

বললেন—এ নিশ্চয়ই মহাবাজের ভুল হয়েছে রে, কিংবা ওকে ঠকিয়ে দিয়েছে—তুই একটা স্লিপ লিখে পাঠা এখুনি—পাঠা তুই···প্রমাণ হয়ে যাক্—পয়সা দিয়ে কেন খারাপ জিনিস খাবো—

বাবাকে চিনতো মিলি।

শেষ পর্যন্ত লিখতে হলো স্লিপ।

স্লিপ লিখে মহারাজের হাতে দিতে যাচ্ছিল—

রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি বললেন—আর ওই সঙ্গে আমার নাম্বার. ওয়ান্ ব্র্যাণ্ড চুরোটও লিখে দে না, এমাসে হঠাৎ ওই খারাপ চুরুটটা যে কেন ানালি—জানিস্ তো আমি চল্লিশ বছর ধরে ওই এক ব্র্যাণ্ড খেয়ে াসছি······

মহারাজকে দিয়ে ভাল চা আর চুরুটের ফরমাস দিতেই হলো। কিন্তু ার বার কাল রাত্রের কথা মনে পড়তে লাগলো মিলির। স্বামী শেষ পর্যন্ত ধৈর্য হয়েই বলেছিলেন—তোমার বাবা বিড়ি খেতে পারেন না—যাঁর এক য়সার মুরোদ নেই—তাঁর আবার অত সখ কেন শুনি······?

রাত্রে শোবার ঘরের মধ্যে মিলিকে অনেক সহ্য করতে হয় বাবার জন্যে। াজকাল রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের কী যে হয়েছে—বাড়ীতে তিনি াকেন কম। অফিসের আগে আর অফিসের পরে যতক্ষণ তাঁর বাড়ীতে াকার কথা, সে-সময়টা কাটে তাঁর বাগানে। রাত্রে হারিকেন আর টর্চ নিয়ে চলে গাছের তদ্বির তদারক। কোনও বন্ধু এলে দেখা করেন বাগানে। মিলি সারাদিন সংসারের খুঁটিনাটি নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আর ওদিকে ায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি? যখন রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় অফিসে বরিয়ে যান, তখন নেমে আসেন তিনি ওপর থেকে।

চীৎকার শোনা যায় দূর থেকে—মহারাজ—

অর্থাৎ আর একবার তাঁর চা চাই।

সেই তখন থেকে যতক্ষণ না রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় অফিস থেকে াসেন, ততক্ষণ ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাঁর চা চাই। আর সেই দামী চা। সংসার ভেসে যাক্, কারু পেট ভরুক আর না ভরুক, রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জির রুট, চা চাই! তা' ছাড়া সকাল বেলা চাই তাঁর নিজস্ব একখানা হায়াইটম্যান, লেখবার প্যাড্, কলম, কালি আর স্ট্যাম্প। চাই নিজস্ব

পেস্ট, টুথব্রাশ, স্নো, পাউডার আর মাসকাবারি হাতখরচ কুড়িটি টাকা।

প্রতি মাসের পয়লা তারিখে মিলি দু'খানা দশ টাকার নোট বাবার হাতে গিয়ে দিয়ে আসে।

মিলির নজরে পড়ে। বিকেল থেকে বাবার সেদিন সুরু হয় উদ্যোগ-আয়োজন। রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি আবার যেন তার পুরনো ফেলে আসা দিনগুলো ফিরে পান। আলমারী থেকে বেরোয় সেই সব চৌদ্দ বছরের পুরনো স্যুট্। কোনোটা শরীরের সঙ্গে এখন ফিট্ করে না। জুতোর গোড়ালি থেকে প্যাণ্টটা দু'ইঞ্চি ওপরে উঠে পড়েছে। জায়গায় জায়গায় পোকায় এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিয়েছে। য়্যাশ কাঠের সৌখীন ছড়িটা বেরোয়। বেরোয় ফেল্ট হ্যাট্। মাথায় ঈষৎ বেঁকিয়ে বসিয়ে দেন। হাফসোল দিয়ে দিয়ে পেটেণ্ট লেদারের সু-জোড়ার সে গৌরব আজ অস্তমিত। তবু মাস্টার-টেলারের তৈরী সেই পোষাকে হঠাৎ রায়সাহেবের দেহটা কেমন ঋজু হয়ে ওঠে। যেমন হোত চৌদ্দ বছর আগে সাহেবী হোটেলে ডিনার খেতে যাবার সময়। চুরুটটা দাঁতে কামড়ে যখন বাড়ী থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়েন তখন আর ধরতে পারার কথা নয়। খাঁটি বনেদি চাল। হোন্ নিঃস্ব, জামাই-এর গলগ্রহ—একদিন আধদিন নয় চৌদ্দ বছর ধরে—তবু চালচলন দেখে বোঝা যায় ইজ্জত্‌দার মানুষ—খান্‌দানি আদবকায়দার মানুষ। সম্ভ্রমে মাথা নিচু হয়ে আসতে বাধ্য।

তারপর যেমন ভঙ্গীতে সে-যুগে হোটেলে গিয়ে ঢুকতেন, তেমনি ভাবে গিয়ে ঢোকেন পাটনার বড় একটা হোটেলে। কলকাতার হোটেলের কাছে এ হয়ত কিছু নয়। কিন্তু রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি ভুলে যেতে চেষ্টা করেন যে, এটা পাটনার হোটেল। তাঁর মানসচক্ষে ভেসে ওঠে পাম্ গ্রোভ্, জ্যাজ্ ওয়ালজ্ আর স্যুট্‌পরা স্ত্রী-পুরুষের ভীড়।

একটা চেয়ারে গিয়ে মধ্যেখানে বসেন—সকলের দৃষ্টির সামনে। তারপর

যারা তাঁকে সেই অবস্থায় সেখানে ডিনার খেতে দেখেছে, তারা জানে পাকা বনেদিয়ানা কাকে বলে। তাঁর সেই ন্যাপকিন নেওয়া থেকে সুরু করে নিখুঁত সব মুভমেণ্ট লক্ষ্য করবার মত। অন্ততঃ পাটনার ওই হোটেলে এর আগে আর কাউকে অমন ভাবে দেখা যায়নি ডিনার খেতে।

কিন্তু মাত্র তো কুড়িটি টাকা। প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহটাই শুধু চলে —আর বাকি সমস্তটা মাস আবার বসে থাকতে হয় পরের মাসের পয়লা তারিখটির দিকে চেয়ে। কারণ খাওয়াই কি শুধু? বকৃশিশ দিতেও যে মোটা বেরিয়ে যায়, আর ওটা না দিলে তো খাতিরও থাকে না।

একবার মেয়েকে বলেছিলেন—

মিলি, আমার স্যুটগুলো সব তো গেছে, আর অন্ততঃ হাফ্ ডজন না করালে তো আর চলছে না—তোর কি ভুলো মন, তিনমাস থেকে তো কেবল করাবি বলছিস্—

রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের সেটা ইন্সিওরেন্স-এর প্রিমিয়াম দেবার মাস। সে মাসে হয় না। স্মৃতরাং মিলি চুপ করে থাকে। পরের মাসে ছেলের পরীক্ষার ফিস্ দিতে হলো অনেক টাকা। তার পরের মাসে মিলির বিয়ের মাস, জামাই একটা নেকলেস কিনে দিলে স্ত্রীকে, তার পরের মাসেও একটা-না-একটা কি খরচ হয়ে গেল। স্মৃতরাং রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জির সামান্য হাফ্ ডজন স্যুট তা-ও হয়ে উঠলো না বহুদিন।

ড্রেসিং গাউনটা ছিঁড়ে যেতে বসেছে। ওই একখানাই এখন সম্বল। কোন্‌দিন পিঠের দিকটায় টান পড়লেই ফ্যাস্ করে যাবে। তবু সকাল বেলা ওইটে পরেই 'হোয়াট্নট'-এর ওপর থেকে হোয়াইটম্যান খানা নিয়ে চায়ে চুমুক দিতে দিতে কাগজ পড়তে থাকেন। সেটা ছোট চা।

তারপর বড় চা হবে আটটা থেকে ন'টার মধ্যে। আগে কিছু পেস্ট্রি বা বিস্কুট বা টোস্ট্ থাকতো সঙ্গে। আজকাল আবার পরোটায় নেমেছে। তবু সেই পরোটাই ছুরি কাঁটা দিয়ে চিবোতে চিবোতে চা খাওয়া।

আজকাল রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় এই বড় চা'তে থাকেন না। তিনি তখন থাকেন বাগানে। রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি একাই গল্প করে যান।

—জানিস মিলি, এবারকার শীতে লণ্ডনের মে-ফেয়ার-এ চৌদ্দ ইঞ্চি বরফ পড়েছিল……

মিলি একমাত্র নীরব শ্রোতা। শুধু বললে—তাই নাকি ?

রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি বললেন—এতেই তুই অবাক হচ্ছিস, কিন্তু যেবার বার্লিনে কলের জল জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল, নাইনটিন টোয়েনটিতে —তিনশো তেতাল্লিশ জন লোকের নাক যে একেবারে খসে গিয়েছিল—

চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি লণ্ডন, বার্লিন আর নিউ ইয়র্কের গল্প করে চলেন। তারপর এক সময় দেখেন মিলি কখন অজান্তে উঠে চলে গেছে, তখন আস্তে আস্তে ওপরে উঠে যান। ওপরে উঠে গিয়ে লেখবার টেবিলে চিঠি নিয়ে বসেন। চিঠির তাড়া। ম্যান্‌চেস্টার থেকে মিস্টার ব্রফোর্ড চিঠির জবাব দিয়েছেন। ফ্লীট স্ট্রীট থেকে জবাব এসেছে কোন এক কাগজের মালিক লর্ড ফেয়ারওয়েদারের। চিঠির জবাব পড়া এবং জবাবের জবাব লেখার মধ্যে হঠাৎ দেশলাই-এর কাঠি ফুরিয়ে গেল।

চীৎকার করে ডাকেন—মহারাজ—

মহারাজ এল না। সাড়াও দিলে না। কী হলো সব! কিছু বুঝতে পারলেন না রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি। অথচ চুরুট নিভে গেছে।

আবার ডাকেন—মহারাজ—

এবার মহারাজ এল। রায় সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি বললেন—একটা দেশলাই আনো তো মহারাজ—দেশলাই একটা—

কিন্তু সোজা হুকুম তামিল না করে মহারাজ বললে,—জামাইবাবু এখন অফিসে যাচ্ছেন। তিনি অফিসে বেরিয়ে গেলে দেশলাই কিনে আনবো—

সাহেবী মেজাজ হঠাৎ যেন গরম হয়ে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু চুরুটখোররা সহজে রাগে না বলেই তিনি কিছু না বলে চুপ করে রইলেন।

কিন্তু খাবার টেবিলে রিপোর্ট না করে পারলেন না। বললেন—আদর দিয়ে দিয়ে তুই চাকরদের একেবারে মাথায় তুলে ছেড়েছিস মিলি, কী বুদ্ধি ছাখ্—আমার চুরুটটা তখন নিভে গেছে, আমার দেশলাই-এর চেয়ে জামাইবাবুর অফিসে যাওয়াটাই বড় হলো—

এখন, ঠিক এই সময়ে, এক পয়লা জানুয়ারীর সকাল বেলায় কাগজ পড়তে পড়তে রায় সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি থমকে গেলেন। রায় সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় প্রমোশন পেয়ে রায় বাহাদুর হয়েছেন!

সেই অবস্থাতেই নেমে এলেন। সেই ড্রেসিং গাউন, বাঁ হাতে চায়ের কাপ, আঙুলের ফাঁকে চুরুট।

—মিলি মিলি—

মিলি রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিল। রায় সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি বললেন—মৃত্যুঞ্জয় কোথায় রে—

মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় বাগানে ছিলেন। যথারীতি চা খেয়েই বাগানে গিয়েছেন।

রায় সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি হাত বাড়িয়ে দিলেন—কন্‌গ্রাচুলেশন্‌স্—

ভীড় হয়ে গেল সকাল থেকেই। লোকের আসা যাওয়া। স্যার জীবনপ্রসাদ এলেন বুইক হাঁকিয়ে। চার্টার্ড একাউন্‌টেণ্ট রণধীর চৌহান সাহেব। হরসিংপুরের জমিদার জনকবাবুরা। বিলেত-ফেরত মুন্সেফ রঘুবীর প্রসাদ। ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বাবুল মিত্তির এম-এ।

ছুপুর বারোটা নাগাদ ছু' তিনখানা টেলিগ্রামও এসে গেল।

তারপর বিকেলবেলা আর এক দফা। চা, হাসি, কথা, নমস্তের ধাক্কা একদিনেই শেষ হলো না। ছু' তিনদিন ধরেই চললো। ডাকে চিঠি আসতে

লাগলো। জ্যোটি, লোটি, রুবিরা আর তাদের বরেরা লিখেছে। দেরাদুন থেকে ছেলে লিখেছে। চেতলা থেকে মাসিমারা। দিল্লী থেকে লিখেছে পরেশবাবুর স্ত্রী। ভাগলপুর থেকে মামাবাবু লিখেছেন। বেরিলী থেকে জ্যাঠতুতো ভাই লিখেছে। অনেক অনেক চিঠি। সকলকে উত্তর দিতে দিতে মিলি বিব্রত হয়ে পড়লো।

প্রথমে রায় সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি সত্যিই খবরটা দেখে প্রীতই হয়েছিলেন। কিন্তু এই বাড়াবাড়ি তাঁর ভালো লাগলো না। ডান্‌কান্‌ সাহেব তো কথাই দিয়েছিলেন। ওখানে চাকরিতে থাকলে এতদিনে রায় বাহাদুরীটা পেতে অন্ততঃ দেরী হোত না। তা এত বড় রায় বাহাদুরের তালিকা তো আর কখনও বেরোয়নি। এমন বছর বছর গাদা গাদা রায় বাহাদুর যদি বেরোতে থাকে তা'হলে কাকে ছেড়ে কাকে দেখবেন।

কিন্তু এতেও বোধ হয় বিচলিত হবার মত কিছু ছিল না। সবই চাপা পড়ে যেত একদিন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেক্রেটারিয়েট-এর অফিসাররা একটা বিরাট পার্টি দেবার বন্দোবস্ত করে বসলো রায় বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চট্টো-পাধ্যায়কে। হাসি পেল রায় সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জির। এমন হাস্যকর ব্যাপার শুধু পাটনা বলেই সম্ভব বুঝি।

তা' হোক, পৃথিবী কারো হাসি-ঠাট্টা, সুখ-দুঃখের ভাল লাগা না লাগার তোয়াক্কা করে না।

দিনক্ষণ স্থির হয়ে গেছে। আগামী রবিবার। হাতে আর মাত্র চারদিন। ছাপানো কার্ড বিলি হলো সকলের নামে। পাটনার রথী-মহারথীরা কেউ বাদ পড়লেন না। রায় সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জির নামেও আলাদা চিঠি এল একটা।

রবিবার পার্টি। আর শনিবার দুপুর পর্যন্ত কেউ জানতো না।

শনিবার সন্ধ্যাবেলা বললেন মিলিকে। বললেন—কাল তো আমি থাকতে পারছি না মিলি—আমাকে যে কলকাতায় যেতে হচ্ছে—

—কেন বাবা, হঠাৎ ?……মিলির চম্‌কে উঠবারই তো কথা।

রায় বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয়ও কম চম্‌কে উঠলেন না। বললেন—কেন ?

রায় সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি বললেন—তোমার পার্টিতে থাকতে পারবো না, মৃত্যুঞ্জয়, কিছু মনে করো না—ডান্‌কান্ সাহেব জরুরী চিঠি লিখেছে গিয়ে দেখা করবার জন্যে—এতদিন পরে বোধ হয় ওদের ভুল ওরা বুঝতে পেরেছে……

—তোমাকে কি আবার ওরা চাকরি দেবে নাকি বাবা ?……মিলি প্রশ্ন করলে।

—কে জানে—

—কবে যাবে ?

—কালই সকালে, জরুরী চিঠি লিখেছে, দেরী করা উচিত নয়।

—তা' তো বটেই—রায় বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় বললেন।

গুছিয়ে দিলে মিলি। রাত পোহালেই সকাল। সময় বড় কম। রায় সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি চলে যাবেন পাটনা ছেড়ে। চাকরি পেলে আর ফিরবেন না। আর একটা দিন পরে গেলেই তো ভালো হতো। কিন্তু উপায় নেই। নইলে জামাইয়ের সম্মানে যে পার্টি দেওয়া হচ্ছে, তাতেই কিনা তিনি থাকতে পারবেন না!

যত কিছু জিনিসপত্র নিজের বলতে ছিল রায় সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জির, সব গুছিয়ে বাঁধাছাঁদা হলো। মিলি স্লিপ পাঠিয়ে দু' কেস চুরুটও আনালো।

সকালবেলা উঠেই মিলি এসেছে বাবার ঘরে। হঠাৎ রায় সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। চৌদ্দ বছর আগে যেদিন তিনি এ বাড়ীতে এসেছিলেন সেদিন যেন এমনি করে মিলি কাছে এসেছিল। এমনি করে তাঁর তদারক করতো। মিলি এরই মধ্যে এক ডজন রেডি-মেড শার্ট আনিয়েছে। আনিয়েছে এক ডজন টাই। রুমাল ছ'টা। এক টিন বিস্কুট, রাস্তার খাবার।

আজই সন্ধ্যাবেলা রায় বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের পার্টি। সহরের সমস্ত গণ্যমান্য লোকের নেমন্তন্ন। কথাটা মনে পড়তেই রায় সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি লম্বা করে চুরুটের ধোঁয়া ছাড়লেন।

মিলি শেষ সময়ে বললে—বাবা, হপ্তায় হপ্তায় একটা করে চিঠি বরাবর দিয়ে যেও—তুমি চলে গেলে, বাড়ীও একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল—

রায় সাহেব অন্যমনস্ক হয়ে বললেন—ত্মাখ মিলি, জানিস রায় বাহাদুর আমিও হতুম····· সব বন্দোবস্ত ঠিক—এমন সময় ডান্‌কান্ সাহেব এসে সব গোলমাল করে দিলে—

কী কথার উত্তরে কী কথা শুনে মিলি যেন অবাক হয়ে গেল, বললে—তা হোক্‌গে বাবা, সেই ডান্‌কান্ সাহেবই তো ডেকেছে—সেই ডান্‌কান্ সাহেবই তো আবার তোমায় চাকরি দিচ্ছে—লোকটা ভালোই বলতে হবে—

একটা খামের মধ্যে কিছু টাকা দিয়ে বাবার জামার বুক পকেটে রেখে দিয়ে বললে—এই পকেটে দু'শো টাকা রেখে দিলাম বাবা, মনে থাকে যেন—

আজ আর রায় বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের নয়, আজ যেন রায় সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জির হুকুম তামিল করতে ছুটেছে চাকর-বাকরেরা।

ট্রেণ ছাড়লো। মিলির চোখ দু'টো করুণ হয়ে উঠেছিল। রায় বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় হাত উঁচু করলেন। হাতের চুরুটটা দাঁতে চেপে রায় সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জিও হাত উঁচু করে আঙুল নাড়তে লাগলেন। ইঞ্জিনের ধোঁয়ার সঙ্গে তাঁরও একটা স্বস্তির সুদীর্ঘশ্বাস পড়লো। পাটনায় থাকলে রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের পার্টিতে তাঁকে যেতেই তো হতো!

সাতদিন পরে মিলি তখন চায়ের আয়োজন করছে।

বাইরে থেকে হঠাৎ চীৎকার এল—মহারাজ—

মিলি বেরিয়ে এসে দেখলে—ট্যাক্সি থেকে নামছেন বাবা।

মিলিকে দেখে বললেন—এই ট্যাক্সি ভাড়া ...ীব মানুষ।

ঘরে ঢুকে বলেন—রাজী হলাম না, বুঝলি ... ক্লা-
বললে—সাতশো টাকা দেব, কর তুমি চাকরি আবার।
চাকরি আমি করবো না সাহেব। তখন বললে—হাজার টা...ছিলাম।
তখন আমিও বললাম— দু'হাজার টাকা দিলেও করবো না—

মিলি বললে—তারপর ?

—তারপর আর কি—চলে এলাম, চাকরি করবো কোন্ দুঃখে বল্—তোরা থাকতে বুড়ো বাপ চাকরি করবে—এটা কি ভালো দেখায়—লোকেই বা কী বলবে—

অফিস থেকে এসে রায় বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ও শুনলেন। শ্বশুরের হাজার টাকা মাইনের চাকরি না-নেওয়ার কাহিনী।

রায় সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি প্রশ্ন করলেন—ভাল করিনি—তুমি কী বল মৃত্যুঞ্জয় ?

রায় বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ও মিলির মত কোনও মতামত দিলেন না। চুপ করে রইলেন।

রায় সাহেব নিজের মনেই বলতে লাগলেন—হাজার হোক্, বেটারা তো আমাদের মত নয়—গুণের কদর বোঝে—খাঁটি স্কচের বাচ্ছা—বললে, রায় সাহেব তোমাকে আমি রায়বাহাদুর করিয়ে দেব, তুমি এসো আমার এখানে—তোমার মতন লোক এখনও রায় বাহাদুর হয়নি! এটা খুব লজ্জার কথা—কিন্তু......

কিন্তু হঠাৎ কথা বলতে বলতে রায় সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জির নজরে পড়লো তাঁর কথা কেউ শুনছে না। না মৃত্যুঞ্জয়, না মিলি। তারা কখন টেবিল থেকে উঠে গেছে তিনি টের পাননি। তিনি একলা।

তারপর একলা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে নিজের ঘরে উঠতে উঠতে হঠাৎ তাঁর মনে হলো এ-বাড়ীর সিঁড়িগুলো আজ যেন বড় উঁচু ঠেকছে।

পুতুল দিদি

আজই সন্ধ্যাবেলা রায়

সমস্ত গণ্যমান্য লোকে

ব্যানার্জি লম্বা

মি

দি

বংশধর

আপনারা যদি কখনো মেচাদা লোকালে চড়েন তো একটা জিনিস সম্বন্ধে আপনাদের সাবধান করে দেওয়া দরকার।

ধরুন, সকাল সাতটা পঁচিশে ট্রেণটা ছাড়ে হাওড়া স্টেশনের ছ' নম্বর প্লাটফরম থেকে। অন্য দিনের চেয়ে একটু বেশী সকালেই আপনাকে সেদিন ঘুম থেকে উঠতে হবে। আপনি থাকেন টালিগঞ্জে। সেখান থেকে বাসে হোক, ট্রামে হোক, অনেকখানি পথ—অন্তত পুরো এক ঘণ্টার রাস্তা। ঘুম থেকে উঠে দাড়ি কামিয়ে, কাপড়-জামা বদলে হাতে হয়ত সময় থাকবে না বেশী।

ভেবে নিলেন, হাওড়া স্টেশনে গিয়ে কিছু খেয়ে নেবেন। কিন্তু ট্রাম যখন পৌঁছুল স্টেশনের সামনে, তখন মাথার উপর ঘড়িটার দিকে চেয়ে আপনার খাবার ইচ্ছে মাথায় উঠেছে। উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে ট্রেণ তো ধরলেন। জায়গাও হয়ত পেলেন থার্ড ক্লাস গাড়ির এক কোণে। তখন? তখন ট্রেণের দোলানি আর ভিড়ের গরমে আপনার হয়ত চায়ের তেষ্টা পাবে। তা চা আপনি পাবেন। ভাঁড়ে করে পবিত্র চা এক আনা দিয়ে কিনতে পারেন। লজেঞ্চও কিনতে পারেন। উলুবেড়িয়া, কোলা-ঘাট এলে ঠাণ্ডা ডাব পাবেন। আন্দুলে পান্তুয়া পাবেন। সাঁকরেলে 'গরম গরম' সিঙাড়া। মৌরিগ্রামে তেলে ভাজা। ও-সব জিনিস কিনতে পাবেন, কিন্তু একটি জিনিস পেলেও কিনবেন না। কিনে আমি ঠকেছি।

সেইটি বলি। ৗব মানুষ।

মেচাদা লোকালে আমি দু'বার চড়েছি। কলা-

প্রথম বার তেমন বিশেষ কিছুই ঘটেনি।

গাড়িতে খুব ভিড় ছিল। একটা খবরের কাগজ নিয়ে পড়ছিলাম। চারদিকের ভিড়ে সামনের বেঞ্চিতে পা তুলে আরাম করবার পর্যন্ত জায়গা নেই।

ট্রেণ সাঁত্রাগাছি ছাড়তেই ক্যানভাসারের দল একের পর এক বক্তৃতা দিতে লাগলো।

অদ্ভুত সব জিনিসের বেসাতি। বারো আনার হাফপ্যাণ্ট থেকে সুরু করে সংসারের দরকারী-অদরকারী নানান জিনিসের বিজ্ঞাপন আর প্রচার। প্রচারের জন্যে অতি অল্পমূল্যে সে সব জিনিসের বিতরণ। সাধু-প্রদত্ত হাঁপানির ওষুধ, মানুষের কল্যাণের জন্যে এ-ওষুধ বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে, কিন্তু তামার মাদুলীর দাম বাবত মাত্র সওয়া পাঁচ আনা নগদ-মূল্য দিতে হয়। বাজারে যে হাফপ্যাণ্ট পৌনে দু'টাকার কমে পাওয়া যায় না, 'কালীমাতা টেলারিং কোম্পানী' নামমাত্র বারো আনায় দেশে বস্ত্র-সমস্যার সমাধান করতে ক্যানভাসার পাঠিয়েছেন মেচাদা লোক একটু যাত্রীদের কাছে। তারপর আছে দাস কোম্পানীর দাদের মলম ...য়ে হঠাৎ বটে দাদের মলম, কিন্তু চর্মরোগের যম। একবার লাগালেই ...চনা-চেনা! কাপড়ে এ মলমের দাগ লাগে না। পারা-বর্জ্জিত মলম, যঁদখি, পিছনের ব্যবহার করেছেন, তাঁরা আত্মীয়-স্বজনের উপকারের জন্যে আ

কিনতে পারেন। আরো আছে হাসির হর্‌রা—গোপাল ভাঁড়েহ হলো, রায়-কাহিনী। নিরানন্দ মনে হাসির বন্যা ছোটাতে, শোক, ভোলাতে ভব-সংসারে একমাত্র কাণ্ডারী। বাপ, মা, মে একসঙ্গে পড়বার মত পুস্তক। দাম মাত্র তিন আনা। ...ঘা, পোড়া-চটি বই, কিন্তু আরব্য-উপন্যাসের চেয়ে উপাদেয়, গোপাল ...ড়ি-কাশি

আ-কাহিনী। তারপর আছে অন্ধ ভিখারীর মাটির হাঁড়ি বাজিয়ে স-ণ গান—'অন্ধ হয়ে ভাই কত কষ্ট পাই—'। তারপর আছে তিলোত্তমা কেমিক্যালের 'বঙ্গলক্ষ্মী সিঁদুর।' আজ থেকে দাম কমলো এ-সিঁদুরের। কাল দাম বাড়তেও পারে। কিনে ঘরে রেখে দিন। হিন্দুর ঘরে এ জিনিস অপরিহার্য। পাঁচ প্যাকেট এক সঙ্গে কিনলে তিন আনা পয়সা কমিশন দেওয়া হয়। এমন সুযোগ হারাবেন না। আরো আছে নিমের টুথ-পাউডার। এ টুথ-পাউডারের দাম মাত্র দু'পয়সা। কিন্তু যাঁরা দাঁতের ব্যাধিতে ভুগছেন, যাঁরা দাঁতের ব্যাধির জন্যে ডেন্টিস্টকে হাজার হাজার টাকা দিয়েও উপকার পাননি, তাঁরা এই দু'পয়সার নিম টুথ-পাউডার কিনে পরীক্ষা করতে পারেন। বিশ্বাস করে কিনে নিয়ে যান। দুটো পয়সা কতদিকে কতভাবেই বাজে খরচ হয়ে যায়। তারপর আছে ...

কিন্তু আরো যা আছে, তত জিনিসের নাম মনে রাখা কি সম্ভব!

এ-সব ছাড়াও প্লাটফরমের উপর ঠেলাগাড়িতে বালুসাই, মিহিদানা আছে, ভাঁড়ে বা কাচের গ্লাসে পবিত্র চিনির চা আছে, কচি ডাব আছে, হয়তো-লেভাজা আছে, বাঙলা বা মিঠে পান আছে, সিগারেট আছে—বিড়ি ভো, এককথায় কী নেই?

ট্রাম যখন-রে ধীরে মেচাদা লোকাল এগিয়ে চলেছে। ডাইনে বাঁয়ে ছোট চেয়ে আপন-স্টেশন। মৌরিগ্রাম, আন্দুল, সাঁকরেল, আবাদা, নলপুর, বাউরিয়া··· ধরলেন। জায়-স্টেশনে ট্রেণ থামলেই ক্যানভাসাররা এক গাড়ি থেকে নেমে তখন ট্রেণের সিঁড়িতে ওঠে। তারপর পরের স্টেশনে আবার আর এক গাড়ি। পাবে। তা এবার ফুলেশ্বর আসতেই অতি বৃদ্ধ একজন লোক এল। মাথায় দিয়ে কিনতে প পাকা চুল সামান্য। গায়ে বোতামহীন খাকি শার্ট। চোখে ঘাট এলে ঠাণ্ডর চশমা। হাতে একটা ছেঁড়া স্যুটকেস।

'গরম গরম' জি-রায়ের অবাক-জলপান নেবেন কেউ?—জি-জি-রায়ের পাবেন, কি-জলপান?

এত আস্তে কথা বলে, যেন শোনাই যায় না কানে। গম্ভীর মানুষ। এতগুলো ক্যানভাসারের সঙ্গে যেন কোন মিল নেই। বক্তৃতার কলা-কৌশল এখনও আয়ত্ত হয় নি। আর, তা ছাড়া, চলতি গাড়িতে ওঠা-নামা করবার বয়সও নয় ঠিক।

আমার পাশের বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি মুখ তুললেন এবার। তারপর একবার অবাক-জলপানের মুখখানার দিকে চেয়ে কি ভাবলেন কে জানে! বললেন: দেখি একটা—

নগদ দু'পয়সা দিয়ে কিনলেন অবাক-জলপান। তারপর প্যাকেটটা খুলে ফেললেন। উপরে খবরের কাগজ, তলায় শালপাতার তৈরী বড় পানের খিলির মত প্যাকেট। ভিতরে কয়েকটি চিনেবাদাম, ডালভাজা, কাঠিভাজা—মশলা দিয়ে মাখা। তারপর প্যাকেটটা আবার মুড়ে পকেটে রেখে দিলেন। আমি চেয়ে দেখছিলাম। তিনি আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে যেন স্বগতোক্তিই করলেন—বাড়ির ছেলেদের জন্যে নিলাম—

ততক্ষণে উলুবেড়িয়া এসে গিয়েছিল। আধ মিনিট থামবে এখানে।

অবাক-জলপান নামতে নামতে গাড়ি ছেড়ে দিলে। আর একটু অসাবধান হলেই বুঝি পড়ে যেত। অবাক-জলপানের দিকে চেয়ে হঠাৎ পিছন দিকটা দেখে যেন চমকে উঠলাম। মুখখানা যেন চেনা-চেনা! ভালো করে দেখবার জন্যে জানালায় মুখ বাড়িয়েছি। চেয়ে দেখি, পিছনের আর একখানা গাড়িতে তখন উঠে পড়েছে সে।

আবার নিজের সীটে এসে বসলাম। কেমন যেন সন্দেহ হলো, রায়-মশাই না!

কিন্তু আমাদের গাড়িতেও তখন আর এক কাণ্ড—

—বীরবলের অদ্ভুত মলম—বীরবলের অদ্ভুত মলম—কাটা-ঘা, পোড়া-ঘা, নালি-ঘা, প্যাঁচড়া, দাদ, চুলকানি, খোস, হাজা, সর্দিকাশি, ঘুঙড়ি-কাশি

হাঁপ-কাশি, মাথা-ধরা, পেট-ফাঁপা, আমাশা, বদ্‌হজম, যাবতীয় রোগে অব্যর্থ···

এর বছর পাঁচেক পরে আর একবার মেচাদা লোকালে চড়েছি।

সেইবারেই কাণ্ডটা ঘটলো।

গোপাল ভাঁড়ের কৌতুক-কাহিনী, পবিত্র চিনির চা, হাফপ্যাণ্ট—সমস্ত অত্যাচার এড়িয়ে কোনো রকমে মেচাদা লোকাল থেকে নামতে পেরেছিলাম। কাজ সেরে ফিরবো সন্ধ্যার গাড়িতে। কিন্তু স্টেশন যখন এক মাইল দূরে, তখন ডিস্ট্যাণ্ট-সিগ্‌ন্যালের কাছ দিয়ে ডাউন ট্রেণটা বেরিয়ে গেল। বেশ সন্ধ্যে হয়ে গেছে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে চারদিকে। একা-একা স্টেশনের প্লাটফরমের উপর পায়চারি করছি। কাছাকাছি বোধ হয় আর গাড়ি নেই কোনো। জনহীন প্লাটফরম। দূরান্তবর্তী কয়েকটা সিগ্‌ন্যাল পোস্টের মাথায় কয়েকটি লালের বিন্দু অদৃশ্য প্রহরীর মত স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে। সামনে পিছনে অনন্ত অন্ধকারের রহস্য। অল্প-অল্প কুয়াশার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। চুপ করে দাঁড়িয়ে কান পাতলে যেন এই নিস্তব্ধতারও এক অপরূপ শব্দ শোনা যাবে।

হঠাৎ কানে এল—জি-জি-রায়ের অবাক-জলপান নেবেন কেউ? অবাক-জলপান···

প্রথমে মনে হলো, ও-শব্দ বুঝি আমার অন্তরাত্মার অব্যক্ত গুঞ্জন। তারপরে প্রখর দৃষ্টি দিয়ে একবার চারদিক দেখবার চেষ্টা করলাম। উল্টো দিকের প্লাটফরমে কোনো জন-মানবের সাড়াশব্দ নেই, এই নির্জন প্লাটফরমে কে এমন ঘুরে ঘুরে কাদের কাছে অবাক-জলপান বেচবে! নিজের দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করলাম তাকে। ছায়ামূর্তি ওভারব্রিজ্ পেরিয়ে এ-পাশের প্লাটফরমে আসছে। তখনও অনর্গল বলে চলেছে: জি-জি-রায়ের

অবাক-জলপান নেবেন কেউ ? অবাক-জলপান ?···অবাক-জলপান নেবেন কেউ ?··· অবাক-জলপান ?···

জপমন্ত্র-উচ্চারণের মত অবাক-জলপান হাঁকতে হাঁকতে এ-দিকেই আসছে। তারপর সে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো। নেমে নির্জন প্লাটফরমের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে যেন এ-দিকেই আসছে। আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। যেন অশরীরী একটা মূর্তি অনন্তকালের ক্যানভাসারের রূপ নিয়ে অনন্তকালের যাত্রীদের কাছে তার অসামান্য বেসাতি বেচতে চলেছে। কেমন যেন ভয় করতে লাগলো।

কিন্তু এবার একটা লাইট পোস্টের তলায় এসে আমাকে দেখতে পেয়েই অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে চলতে লাগলো লোকটা।

আলোর সামনে ভালো করে দেখলাম তাকে আবার। সেই সেবারের দেখা মূর্তি। বৃদ্ধ মানুষ। মোটা চশমা। মাথার চুলও পেকে গেছে। একটু টাকও আছে বুঝি। মুখে যেন নিঃশব্দে কি বিড়বিড় করে বকছেন। এবার চিনতে পারলাম স্পষ্ট। সেই রায়মশাই। পুরন্দর খাঁর বংশধর। কোনো ভুল নেই!

কিন্তু আমাকে যেন চিনতে পারলেন না!

সামনে এগিয়ে গিয়ে বললাম : অবাক-জলপান আছে ?

একটি মুহূর্ত। কিন্তু একমুহূর্তের মধ্যে যেন পৃথিবী-পরিক্রমা করে এলাম।

মনে আছে, প্রথম যেদিন চাকরিতে ঢুকলাম, চারদিকে চেয়ে মনে হয়েছিল, যেন এক বিচিত্র জগৎ। সুধীরবাবু আমার হাতে একঠোঙা খাবার দিয়ে বলেছিলেন—নিন, ধরুন···

জিজ্ঞেস করেছিলাম—কিসের খাবার ?

সুধীরবাবু বলেছিলেন—পুরন্দর খাঁর বংশধর ম্যাট্রিক পাশ করেছে।

তখনও কিছু বুঝিনি। পাশের হরিশবাবু বললেন—নতুন ঢুকেছেন আপনি, অনেক কিছু দেখতে পাবেন এখানে, এখানে বিখ্যাত-বিখ্যাত সব লোক আছেন। ওই দেখুন, ওই যে ছেঁড়া শার্ট গায়ে দিয়ে গেলাসে চা খাচ্ছেন, উনি হচ্ছেন বিখ্যাত ডাক্তার, বাড়িতে ডাকলে চার টাকা ভিজিট নেন। আর ওই যে দেখছেন, চাঁদনির স্যুট্-পরা লোকটি, ও-হচ্ছে এক বিলেত-ফেরতের ভাই, আর রেকর্ড-সেক্শানে গেলে আপনাকে পুরন্দর খাঁর বংশধরকে দেখিয়ে দেব।

রায়মশাইকে সেদিন প্রথম দেখলাম।

রেকর্ড-সেক্শানে একটা চিঠির খোঁজে গিয়েছিলাম। মোটা চশমা-পরা। হাঁটুর উপর কাপড় তুলেছেন। জামার সব-ক'টা বোতাম খোলা। ভেতরে বুকের ছাতির ওপর কাঁচা-পাকা চুল দেখা যাচ্ছে। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই মুখটা তুললেন। বললেন—তোমাকে আগে দেখিনি তো! নতুন ঢুকেছ? কার লোক? দাস সাহেবের?

বললাম—না।

—তবে বিনয়বাবুর?

এবারও বললাম—না।

—তবে কি ম্যাক্লীন সাহেবের?

এ অফিসে কারো-না-কারোর লোক না হলে ঢোকা অসম্ভব জানতাম। তবু যখন শুনলেন, আমি কারোর লোকই নই, তখন বললেন—উন্নতি করা শক্ত হবে ভাই, ওই জারনাল্-সেক্শানেই পচতে হবে সারা জীবন, এই আমার ব্যাপারই দেখ না···

বলতে গিয়ে একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার নামটা··· ?

নাম শুনে বললেন—মিত্তির? নয়নজোড়ের মিত্তিরদের কেউ হও নাকি?

বললাম—না···

এবারও ছাড়লেন না। বললেন—তবে রাজা কৈলাস মিত্তিরের ফ্যামিলির কেউ ?

আমার উত্তর শুনে একটু কৃপা-পরবশ হয়েই যেন বললেন—রাজা কৈলাস মিত্তিরের নাম শোননি ? সে কি হে ! খবরের কাগজ পড়ো না নাকি ? সেকালে মা'র শ্রাদ্ধে বারো লক্ষ টাকা খরচ করে সমস্ত কলকাতাকে চমকে দিয়েছিলেন, সোনার হুঁকোয় রূপোর কলকে চড়িয়ে তামাক খেতেন। নামই শোননি তাঁর ? ওঁর দৌহিত্রের সঙ্গে আমার পিসীমার দেওরের যে···

পাশ দিয়ে ভূধরবাবু যাচ্ছিলেন। আমাকে ঠেলা দিয়ে বললেন—কা'র সঙ্গে কথা বলছেন ? পুরন্দর খাঁর নাম শুনেছেন ?

বললাম—তা শুনেছি বৈকি···

রায়মশাই বাধা দিলেন—ওদের কথা তুমি ছেড়ে দাও ভাই—পুরন্দর খাঁর বংশধর হলে কি আর এই তেষট্টি টাকা বারো আনার চাকরিতে পচে মরি !

পরে অবশ্য বুঝেছিলাম যে, তেষট্টি টাকা বারো আনার গল্পটা নেহাৎই বিনয়ের ব্যাপার ! আরো বুঝলাম, পুরন্দর খাঁর বংশধরের কাহিনীটা কিন্তু সবাই জানে। তেষট্টি টাকা বারো আনা—যা' হাতে নেন, সেটা নিতান্তই দায়ে পড়ে। সওয়া ছ' লক্ষ টাকার সম্পত্তির মালিক গঙ্গাগোবিন্দ রায় আজ সরিকদের ষড়যন্ত্রে বিপাকে পড়ে রেলে চাকরি করতে এসেছেন। আর এই যে ছেঁড়া পাঞ্জাবী, খাটো ধুতি, চার-পাঁচ দিন ক্রমান্বয়ে দাড়ি কামান না, আর ভবানীপুর থেকে এতদূর হেঁটে অফিসে যাতায়াত করেন, কিংবা দুপুরবেলা আধ গেলাস চা খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন,—এ-সবই নাকি উদ্দেশ্যমূলক।

জার্ণাল-সেক্‌শানের সাব-হেড্ পঞ্চাননবাবুর বেয়াই জামাইকে শীতের তত্ত্ব করেছিলেন। তার থেকে চারটি ফজ্‌লি আম এনে সেদিন অফিসের তিরিশটি লোককে খাওয়ালেন।

রেকর্ড-সেক্‌শানে টিফিনের সময় গিয়ে রায়মশাইকে বললাম—আপনি আম খেলেন না যে রায়মশাই? বলাবলি করছিল ওরা···

রায়মশাই হাতের চিঠিপত্রের উপর একটা পাথর চাপা দিয়ে রেখে গলা নিচু করে বললেন—তোমাকে আমার বলতে দোষ নেই ভাই, তুমি যেন আবার ওদের বোলো না···

সামান্য ব্যাপারে এত গোপনীয়তা কেন, বুঝলাম না। বললাম—না বলব না, বলুন···

—তবে শোন, ও-রকম এক টুক্‌রো আম আমাদের খাওয়ার অভ্যেস নেই ভাই, তোমাকে সত্যি কথাই বলি। এমন দিন গেছে, যেদিন একসঙ্গে অমন চল্লিশটা আম আমি নিজে সাব্‌ড়েছি, আর সে-আম, আর এ-আম? এক-একটা গাছ-পাকা আম বেছে বেছে জাল-আঁক্‌শি দিয়ে পাড়া। আমার দেশে যদি কখনও যাও দেখাবো, আর গাছ কি এক-একটা? আমার ভাগে শুধু আম গাছই একশো তিনটে, সব কলমের। সাতটা লিচু গাছ, কাঁঠাল গাছ পঁচাশিটে, আর সে কাঁঠাল কী! গাছে ফল ফললে তলার মাটিতে গর্ত করতে হয়, নইলে মাটিতে ঠেকে যায়। আমরা জীবনে কখনও আমের টুক্‌রো খাইনি ভাই···

বললাম—সে-সব এখন কে খাচ্ছে?

রায়মশাই আবার কাজে মন দিলেন। বললেন—সে অনেক কথা, সব বলতে গেলে আঠারপর্ব মহাভারত হয়ে যাবে, কেউ বিশ্বাসও করবে না, আমি নিজে কাউকে বলেও বেড়াই না যে, আমি পুরন্দর খাঁর বংশধর। আমাকে দেখে তা কে বিশ্বাস করবে বলো না? ও না-বলাই ভালো। যারা নির্বোধ, তারাই বলে বেড়ায় সবাইকে, আমার সে-স্বভাব নয় ভাই, যারা জানে আমাদের বংশের ইতিহাস, যারা রেখেছে আমাদের খবর, তারা এখনও খাতির করে।···সে-সব গল্প কাউকে করিও না, সে অভ্যেসও আমার নেই। বাবা-মশাইয়ের পাল্কীটা এখনও চণ্ডীমণ্ডপের ধারে ভেঙে-

চুরে পড়ে আছে, আটজন বেহারায় বইতো সেটা, তারই একখানা পাল্লা ভেঙে নিয়ে সরিকেরা ছেলে-ঘুমপাড়ানোর দোলনা করলে, আর রাজা-বাহাদুরের পেতলের কামানটা এখনও টিউবওয়েলের পাশে কাত হয়ে পড়ে রয়েছে, এখন গেলে দেখবে তার ওপর বউ-ঝিরা সাবান কাচছে···

আমি চলে আসছিলাম। ডাকলেন আবার—আর একটা কথা শুনে যাও ভাই···

ফিরে এসে বললাম—কি ?

—তোমার কোনো ভাল উকিল টুকিলের সঙ্গে জানাশোনা আছে ?

আমার নিজের দাদাই আলিপুরের উকিল শুনে বললেন—কোন্ কোর্টের উকিল—দেওয়ানী না ফৌজদারী ?

বললাম—দেওয়ানী।

রায়মশাই হঠাৎ যেন উল্লসিত হয়ে উঠলেন। হাতের কাজ সরিয়ে রেখে বললেন—তোমাকে একটা উপকার করতে হবে ভাই, আমার···

তারপর হাত দুটো ধরে আবার বললেন—আমি শুধু আমার কাগজ-পত্তরগুলো একবার দেখাতে চাই তাঁকে, আমি ব্যারিস্টার কে. বোসকে আমার দলিল-দস্তাবেজ দেখিয়েছিলাম একবার, তিনি দেখলেন সব, পাট্টা-কবুলিয়ত, খাজনার দাখ্‌লে-পত্তর, লর্ড ক্লাইভের আমলের সনদ—সব নকল করিয়েছি কি না। তিনি বললেন, কাগজ-পত্তর পরিষ্কার আছে, কোথায়ও দাগ নেই—আদালতে একবার পেশ করতে পারলে ডিক্রী নিশ্চয়ই হবে, এই তোমায় বলে রাখলুম। কিন্তু···

—কিন্তু কী ?—জিজ্ঞেস করলাম।

—কিন্তু খরচা। খরচা কে ভায় ? এতো আর ফৌজদারী মামলা নয় ?—এ যে দু' তিন বছরের ধাক্কা। দু' তিন বছর ধরে আদালত-ঘর, আর উকিল-মুহুরীর খরচা। চাট্টিখানি কথা তো নয়, সওয়া ছ' লক্ষ টাকার সম্পত্তি! বাঘও যত বড়, ফাঁদও তত বড় হওয়া চাই তো! আর এ

হলো গিয়ে বাঘের বাবা, যার নাম আদালত—অত টাকা কোথায়? এখন এই মাসে মাসে দু'-চার টাকা করে জমাচ্ছি, কিন্তু তেমন যদি একজন উকিল পাই…

ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসতেই সুধীরবাবু বললেন—তোমাকে ওর বাড়ি যেতে বলেছে নাকি? খবরদার, খবরদার, যেও না কখনও বলছি।

বললাম—কেন?

—জ্বালিয়ে খাবে। সেই ট্রাঙ্ক-ভর্তি দলিল দেখাবে, খাওয়াবে, তারপর যত রাতই হোক, সব পড়িয়ে শোনাবে। দলিলের হাতের লেখা পড়তে হবে, নক্সা দেখতে হবে, বংশ-তালিকা দেখতে হবে—তবে ছাড়বে। আমাকে গরম লুচি আর আলু-ভাজা খাইয়েছিল।

জিজ্ঞেস করলাম—আপনাকেও দেখিয়েছে নাকি?

শুধু কি আমাকে? জিজ্ঞেস করে দেখো, অফিসের কেউ আর বাদ পড়েনি। ওই জীবনবাবু, হরিশবাবু, সনাতনবাবু—এমন কি দ্বিজপদ চাপরাশিকে পর্যন্ত বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পড়িয়ে শুনিয়েছেন, ও তো পড়তে পারে না…

অফিস থেকে বেরুবার পর দেখতে পাই, সবাই বাস্-এর জন্যে যখন অপেক্ষা করছি, রায়মশাই তখন হাঁটা সুরু করেছেন। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, লাঠিটা নিয়ে সোজা বাড়ি যাবেন। বাড়ি ভবানীপুরে। সারাটা রাস্তা হেঁটে আসা-যাওয়া।

সুধীরবাবু বললেন—এত কষ্ট বুড়ো কেন করে জানো? সব ওর ভাইয়ের জন্যে। এই না-খেয়ে, না-পরে, ভাইকে মানুষ করে তুলছে, আর সে-ও তেমনি অমানুষ হয়ে উঠছে। দু'-দু'বার ফেল করে সেবার ম্যাট্রিকটা থার্ড ডিভিসনে পাশ করেছে, এবার আই-এ পাশ করবে ক'বারে দেখা যাক। কিন্তু রায়মশাই বলে রেখেছেন, বসন্ত আই-এ পাশ করলে তোমাদের মাংস খাওয়াবো…

রায়মশাইও বলতেন—কাউকে বলো না, তোমাকেই বলছি গোপনে, বসন্তকে, ইচ্ছে আছে, বি-এ পাশ করিয়ে ওকালতি পড়াবো। বুঝলে না, বাড়ির উকিল—নিজে দেখে শুনে মামলা করবে। সওয়া ছ' লক্ষ টাকার সম্পত্তি, তিন বছর লাগে, চার বছর লাগে, যতদিন ইচ্ছে—মামলা করুক, আমি তো এদিকে চাকরি করতে রইলুম। তারপর একবার মামলার ডিক্রী হয়ে গেলে আমায় আর পায় কে! বসন্তকেও আর ওকালতি করে খেতে হবে না, যা আছে তাই ভাঙিয়ে খেলেই সাত-পুরুষ বসে খেতে পারবে। আমিও তখন তেষট্টি টাকা বারো আনার চাকরির মাথায় লাথি মেরে···

রায়মশাই কখনও বেশী কথা বলতেন না। কিন্তু একটু অন্তরঙ্গ হলেই মনের আর বাধা-বন্ধ থাকতো না।

একদিন বললেন—কাউকে বলো না, ভাই, এই যে লাঠিটা দেখছো, এটা রাজা রুদ্ররামের নিজের হাতের লাঠি, শৌখিন লোক ছিলেন কি না! মাথাটা সোনা-বাঁধানো ছিল আগে, চার পুরুষের লাঠি, কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে, এর সঙ্গে! এই লাঠির ওঠা নামাতে একদিন বর্ধমান জেলার ভাগ্য-নির্ণয় হয়েছে—আর এখন রেলের কেরাণীর হাতে মানাবে কেন? তাই দশ ভরি সোনা খুলে রেখেছি, বসন্তর বিয়েতে আমাকেও তো কিছু খরচ করতে হবে? ভেবেছি, পয়সা হলে একটা মুকুট গড়িয়ে রাখবো। বুঝলে না, রাজবংশের পুত্রবধূকে গিনি দিয়ে তো আর আশির্ব্বাদ করা যায় না?

তা রায়মশাই সত্যিই অফিসের সবাইকে মাংস খাওয়ালেন একদিন। অফিসের তিরিশজন লোক চেটে-পুটে মাংস খেলে। একবারের চেষ্টায় আই-এ পাশ করেছে বসন্তবল্লভ রায়।

রায়মশাই বলেন—কুমার আমরা নামের আগে লিখতে পারি, আইনে বাধে না, কিন্তু লিখিনে। তেষট্টি টাকা বারো আনার কেরাণী, তার আবার···যদি তেমন সুদিন কখনও আসে···

বসন্ত ম্যাট্রিক পাশ করেছে, আই-এ পাশ করেছে, বি-এ পড়বার জন্যে

ভর্তি করে' দেওয়া হ'লো, বসন্তর কবে শরীর খারাপ হলো, বসন্ত কী খেতে ভালবাসে, বসন্ত কখন ঘুম থেকে ওঠে, কী-রকম দেখতে তাকে,—সব সংবাদ আমাকে বলেন রায়মশাই।

একদিন এসে বললেন—কাউকে বলো না ভাই, আজ বসন্ত খুব রেগে গেছলো···

বললাম—কেন ?

—এমনি! আমাদের রায়বংশের ওটা একটা বিশেষত্ব বলতে পারো। রাজা রুদ্ররাম রাত্রে একদিন ব্যাঙের ডাকে ঘুমের ব্যাঘাত হয়েছিল বলে পুকুরই বুজিয়ে ফেলেছিলেন রেগে গিয়ে। রাজা দিগম্বরপ্রসাদ একবার রাগের চোটে চল্লিশখানা গাঁ পুড়িয়ে দিয়েছিলেন, আর রাজা নীলাম্বরপ্রসাদ একবার···

একদিন এসে বললেন—কাল বসন্ত সারা রাত ঘুমোয়নি, জানো ভাই ?···

বললাম—কেন ?

রায়মশাই বললেন—তাস খেলেছে বন্ধুবান্ধব নিয়ে।

বললাম—সে কি! পরীক্ষার সামনে এইরকমভাবে সময় নষ্ট করা ···আপনি কিছু বললেন না!··

—প্রথমে ভেবেছিলাম বলি, কিন্তু চুপ করে গেলাম, খেয়ালী বংশ তো!···তেষট্টি টাকা বারো আনার কেরাণীই না হয় হয়েছি, কিন্তু রাজ-রক্ত কোথায় যাবে ? নিজেকেও তো চিনি! রাজা সর্বেশ্বর খামখেয়ালি করে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন, ইতিহাসের বইতেই তো দেখতে পাবে, তারপর আমার ঠাকুরবাবা রাজা কৈলাসচন্দ্র তাঁর একমাত্র মেয়ে পটেশ্বরীকে অর্থাৎ আমার পিসিমাকে বিয়ে দিয়েছিলেন ঘুঁটে-কুড়ুনীর ছেলের সঙ্গে···সে-বেচারি রাজকন্যাও পেলে, অর্ধেক রাজত্বও পেলে!

বললাম—সে কি! বংশ, কুলমর্যাদা···

—তা' না হলে আর খামখেয়ালী কা'কে বলে ? তা' তাদের সঙ্গেই তো

এই মামলা। বাবা মারা গেলেন, আমরা তখন নাবালক দু'ভাই, আমার অভিভাবক হয়ে বসলেন পিসেমশাই মাথার ওপর—তারপর সব বেনামী করে করে···তুমি তো একদিন গেলে না বাড়ীতে, সম্রাট আওরঙ্গজেবের সীলমোহর দেওয়া সনদ পর্যন্ত দেখিয়ে দেব, সব বাক্স ভরে রেখেছি। বসন্ত একবার ওকালতিটা পাশ করে নিক, তখন···কিন্তু কাউকে যেন এ-সব বলো না ভাই···

ভূধরবাবু একদিন বললেন—আপনার সঙ্গে তো খুব ভাব দেখছি রায়মশা'য়ের, রাজা রুদ্ররামের রাগের গল্প শোনেন নি?

বললাম—শুনেছি।

—সোনা-বাঁধানো লাঠির গল্প শোনেন নি?

—শুনেছি।

—আওরঙ্গজেবের সীলমোহর-করা সনদের গল্প?

বললাম—তাও শুনেছি।

—একবার হাতীর পিঠে চড়ে ইছামতী পেরোতে গিয়ে কুমীর-শিকারের গল্প বলেন নি? আর রাজা নীলাম্বরপ্রসাদের সোনার ছিপে মাছ ধরা···

বললাম—না, এ-সব শুনিনি তো···

—শুনবেন, আরো কিছুদিন যাক্। সবাই শুনেছে আর আপনি শুনবেন না, তা কি হতে পারে? সকলকেই বলবেন,—কাউকে বোলো না, কিন্তু বলবেন সবাইকেই···

তা সত্যিই, ভূধরবাবু মিথ্যে কথা বলেন নি। সে-গল্পও শুনলাম একদিন রায়মশা'য়ের বাড়ি গিয়ে। রায়মশাই তাঁর বাড়ি যেতে বহুদিন থেকে পীড়াপীড়ি করছিলেন। সেদিন গেলাম।

কিন্তু গিয়ে মনে হলো, না গেলেই যেন ভালো করতাম।

নামে ভবানীপুর। কিন্তু এ-গলির বাড়ীগুলোর ভবানীপুরত্ব নেই যেন কোথাও।

রায়মশাই একটা গামছা পরে বোধহয় নর্দমা পরিষ্কার করছিলেন। সেই অবস্থাতেই আমাকে টেনে একেবারে ঘরের ভিতরে নিয়ে গেলেন।

বললেন—আসছি কাপড়টা পরে, বোস ভাই।

কিন্তু ততক্ষণে আমি নির্বাক হয়ে ঘরের মেঝেতে দেখছি আর এক দৃশ্য। একথালা ভাত-তরকারি সারাঘরময় ছড়ানো। কে যেন একটু আগে সবেমাত্র এখানে ভাত খেতে বসেছিল। তারপর কি কারণে যেন ভাত না খেয়েই থালায় লাথি মেরে উঠে চলে গেছে!

বড় লজ্জায় পড়লুম। মনে হলো, রায়মশা'য়ের লজ্জা প্রকাশিত হয়ে গিয়ে আমাকেই যেন পরোক্ষভাবে লজ্জিত করছে।

কাপড় পরে ফিরে এসেই রায়মশাই বললেন—বড় আনন্দ হলো, তুমি এসেছ। কিন্তু…

তারপর আমার কুণ্ঠিত ভঙ্গী দেখে আর আমার চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে বললেন—আরে ও তুমি কিছু ভেবো না, ছোট বাহাদুরের কাণ্ড। তুমি আরাম করে খাটের ওপর পা তুলে ব'সো দিকিনি ভাই আগে।

আমি তবু জিজ্ঞেস করলাম—ছোট বাহাদুর কে?

—ওই বসন্ত, আমার ছোট ভাই, ভাত দিতে একটু দেরি হয়েছিল কিনা, কোথায় মাছ ধরতে যাবে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে, ট্রেণের টাইম…তা যাক্‌গে, ও-সব নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এখন কোন্‌টা আগে দেখবে বলো, দলিল-পত্তর, না সনদের নকল?

আমি যেন ঘরের চারিদিকের দারিদ্র্যের এই নগ্নরূপ দেখে কুণ্ঠিত হয়েছিলাম। আমি রায়মশা'য়ের কথার কোনও জবাব দিতে পারলাম না।

রায়মশাই হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। বললেন—কী ভাবছ, বলো তো?

আমি হঠাৎ অপ্রস্তুতভাব সামলে নিয়ে বললাম—না কিছু না, বলুন আপনি…

রায়মশা'য়ের দ্বিধা কাটলো না। বললেন—না, নিশ্চয় কিছু ভাবছো, আমার এই ময়লা কাপড় দেখে কিছু ভাবচো, না ?

বললাম—না, না—আপনি বলুন, কিছুই ভাবছিনে আমি···

—না বললে শুনবো কেন ভাই ? নিশ্চয় ভাবছো। উডবার্ণ সাহেব নিজেই আমাকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল, তা তুমি তো তুমি···

—কোন্ উডবার্ণ সাহেব ?

—উডবার্ণ সাহেব আলীপুরের দেওয়ানী আদালতের জজ। আদালতের ব্যাপার জানো তো ?—কেউ-ই জানতে চায় না কাউকে, তা সে রাজাই হও, আর উজীরই হও। উডবার্ণ সাহেবের কাছেই আমার দরখাস্ত গিয়েছিল কিনা। হেঁটে হেঁটে পায়ের গোড়ালি ক্ষইয়ে ফেলেছি তখন। আর দান-পত্তর করছি টাকার। পঁচাশি টাকা জমা দিয়েছি, সনদের নকলটা করিয়ে নেব মোক্তারকে দিয়ে। তা উডবার্ণ সাহেব আমার দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেছে। বললে, তুমিই রুদ্ররামের নাতি ? যার মৃত্যুতে কেল্লায় তোপ পড়েছিল ?

আমি করজোড়ে বললাম—হ্যাঁ হুজুর···

তারপর সাহেবও জিজ্ঞেস করেছিল—কিন্তু তোমার এ-দশা কেন ? কর কী তুমি ?

মনে আছে, সেদিন সেই বহুকাল আগে রায়মশাই, পুরন্দর খাঁর বংশধর গঙ্গাগোবিন্দ রায়, বি-এন-আর অফিসের তেষট্টি টাকা বারো আনার চাকরি-করা রেকর্ড-সেক্শানের কেরাণী, নগদ এক টাকা তিন আনার খাবার কিনে এনে খাইয়েছিলেন আমাকে ! আমি রসগোল্লা, পানতুয়া, দরবেশ, ছানার গজা—প্রত্যেকটির দাম কষে কষে হিসেব করে খতিয়ে দেখেছিলাম, এক টাকা তিন আনার কম নয় তার দাম ! হয়ত তাঁর দু'দিনের বাজার-খরচ, যিনি নিজে বাস্-ট্রামের ভাড়ার পয়সা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে ছোট বাহাদুরকে উকিল করে তুলছেন, দেওয়ানী মামলার খরচ সংগ্রহ করছেন। খেতে গিয়ে আমার গলা

দিয়ে যেন কিছু নামছিল না। মনে হচ্ছিল, যেন অন্যায় করছি! চুরি করছি!

সেদিন ঘরের কোণে একটা লোহার সিন্দুক খুলে কত কাগজপত্র, কত পুঁথির পাতা, কত ঘটককারিকা-কুলকারিকা যে দেখিয়েছিলেন, তার আর ইয়ত্তা নেই। মনে আছে, তাঁরও খেতে দেরি হয়েছিল সেদিন, আমারও হয়েছিল বোধ হয়, ঘড়িতে যখন তিনটে বেজেছিল, তখন উঠতে পারি।

এর পর বেরুলো বাদশা আওরঙ্গজেবের সনদ।...

আমি একবার বললাম—আমি আজ উঠি রায়মশাই......

—না, না, আর একটু, আর একটু, সব তোমায় দেখান্ হলো না।

এক-একটি জিনিস কত যত্নে কত আগ্রহে লোহার সিন্দুকে রেখেছেন, দেখলে করুণা হয়। প্রত্যেকটি দলিলের কাগজ অতি সাবধানে হাত দিয়ে স্পর্শ করতেন। যেন কত মহামূল্য সামগ্রী!

পরের রবিবার রায়মশাইকে নিয়ে আসতে হলো দাদার কাছে। কথা-বার্তার সময় আমি উপস্থিত ছিলাম না। প্রায় পঁচিশ সের ওজনের কাগজপত্র-ভর্তি একটা পুঁটুলি নিয়ে এলেন আমাদের বাড়ি। ভালো করে অয়েলক্লথ দিয়ে বাঁধা। পোঁটলার ভারে একেবারে কুঁজো হয়ে পড়েছেন রায়মশাই। খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে তবে যেন আবার চাঙ্গা হলেন। বললেন—এগুলো দেখতে ছেঁড়া কাগজ, কিন্তু হেঁ হেঁ, এরই দাম সওয়া ছ'লক্ষ টাকা!...

পর দিন অফিসে দেখা হতেই আমাকে ডেকে একটু আড়ালে নিয়ে গেলেন। বললেন—কাউকে বলো না ভাই, সব ঠিক হয়ে গেল...

আমিও বিস্মিত হয়ে গেলাম। যাক্, এতদিনে বুঝি সব ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু এত সহজে কেমন করে হলো?

রায়মশাই বললেন—আরে তোমরা যে নয়নজোড়ের মিত্তির, তা' তো বলো নি?

—কী জানি! কোথায় নয়নজোড়! সে-নামও কখনও শুনিনি।

—আরে অতবড় বংশের ছেলে তোমরা! তুমি কেন এলে ভাই এই রেলের চাকরিতে! তোমার দাদাকেও তাই বললুম, ভারী পণ্ডিত ব্যক্তি, আইন একেবারে গুলে খেয়েছেন, নইলে কি আর শুধু শুধু পাঁচশো-এক টাকা ফী হয়? উকীল বটে, তা উনিও ওই কথাই বললেন, ব্যারিষ্টার কে. বোস যা বলেছিল···

—কী হলো শেষ পর্যন্ত?

—উনিও বললেন, কাগজ-পত্তর, দলিল-দস্তাবেজ পরিষ্কার—কোথাও দাগ নেই একছিটে, মামলা আমার পক্ষে, রাজা রুদ্ররামের নিজের হস্তাক্ষর রয়েছে—আমার পৌত্রদ্বয় শ্রীমান গঙ্গাগোবিন্দ রায় ও শ্রীমান বসন্তবল্লভ রায় যতদিন নাবালক থাকিবেক, ততদিন অভিভাবকরূপে রাজ্যের পরিদর্শনকার্য নির্বাহ করিতে শ্রীযুক্ত······, তা ঠিক হলো—মামলার ফল বেরিয়ে গেলে আধাআধি বখরা হবে দু'জনের—তোমার দাদার অর্ধেক, আর আমার অর্ধেক, অর্থাৎ আমাদের দু'ভাইয়ের ভাগে পড়লো তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকার মতন আর কি, কিন্তু একটা কথা···

বললাম—কী কথা?

—উনি বললেন, মামলা আমি জিতিয়ে দেবই। হাইকোর্ট থেকেও জিতিয়ে আনব, কিন্তু তিন-চার বচ্ছর ধরে মামলা চলবে, সে-জন্য ও-চাকরি আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে রায়মশাই, নইলে পেরে উঠবেন না। এতো আর ফৌজদারী নয়, দেওয়ানী মামলা! বাঘ নয়, হেঁ হেঁ, একেবারে বাঘেরও বাবা···

বললাম—তা' হলে কি করবেন, ঠিক করলেন? চাকরি ছেড়ে দেবেন?

রায়মশাই বললেন—এই মুহূর্তে, এই মুহূর্তে চাকরির মাথায় লাথি মেরে বেরিয়ে যেতে পারলে বাঁচি। আজকে হাতের কাজগুলো সেরে নিই, কালই

দরখাস্ত করে দিচ্ছি, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে হাজার চারেক টাকা জমেছে, তিন-চারটে বছর ওই টাকাতে সংসার-খরচটা চালিয়ে দেব। তারপর তো···কিন্তু কাউকে যেন এখন বোলো না ভাই, তোমাকে বলেই বলছি···

কিন্তু কেমন করে জানি না, সেইদিনই সমস্ত সেক্‌শানের লোকের কানে গেল খবরটা !

সুধীরবাবু এসে বললেন—খবরটা সত্যি নাকি রায়মশাই ?

ভূধরবাবুও জিজ্ঞেস করলেন—তা হলে সত্যিই চাকরির মায়া কাটালেন রায়মশাই ?

সনাতনবাবু, অবিনাশবাবু, বিলেত-ফেরতের ভাই, ডাক্তারবাবু—সবাই কৌতূহলী। সবাই রায়মশাইয়ের কথাতে না হোক, আমার সমর্থন পেয়ে যেন বিমর্ষ হয়ে গেল। ব্যাপারটা এমনি হলো, যেন আমাদের জানাশোনা একজন হঠাৎ লটারিতে তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা পেয়ে গেছে ! রায়মশাই রাতারাতি সকলকে অতিক্রম করে সকলের ঊর্ধ্বে উঠে গেছেন ! সবাই ঈর্ষার চোখে—শ্রদ্ধার চোখে দেখতে লাগলো আজ রায়মশাইকে।

পরের দিন কিন্তু দরখাস্ত করা হলো না।

জিজ্ঞাসা করলাম—আজকেই দরখাস্তটা করছেন তা হলে ?

রায়মশাই বললেন—না, আজ আর হলো কই ? ছোট বাহাদুরকে একবার জিজ্ঞেস না করে কী করে করি ? তারও তো মত নেওয়া চাই,—সে-ও তো বিষয়ের অর্ধেক হিস্সের মালিক ?

এর কিছুদিন পরেই চাকরিতে বদলি হয়ে বিলাসপুরে চলে গেলাম আমি।

রায়মশাই বললেন—তোমার কাছে যে কী রকম কৃতজ্ঞ হয়ে রইলুম, বলতে পারবো না ভাই। এ সব তোমার জন্যেই হলো নইলে কোনোদিন যে আবার বিষয় ফিরে পাবো, এ তো কল্পনা করতে পারিনি ! তা' খবর তুমি

পাবে—সব তোমার দাদার কাছ থেকে। আমিও চিঠি লিখবো, মনে করো না, বড়লোক হয়ে ভুলে যাবো অফিসের বন্ধুদের। রাজাই হই, আর যা-ই হই, একসঙ্গে এত বছর কাটালুম···

তারপর কয়েকবছর বাদে অফিসের কাজে একবার হেড অফিসে এসেছি। এসে দেখেছি, রায়মশাই সেই রেকর্ড-সেক্‌শানে, সেই চেয়ারে সেই-ভাবেই কাজ করছেন। বললাম—কী হলো আপনার? চাকরি এখনও ছাড়েন নি?

রায়মশাই বললেন—ছেড়েই দিয়েছি, একরকম বলতে পারো, বসন্তও মত দিয়েছে, দরখাস্তটাও লিখে টাইপ করে রেখে দিয়েছি, পেশ করার যা দেরি—আর তোমার বৌদিও বললেন ··

—বৌদি আবার কী বললেন?

—তিনি বিচক্ষণ লোক, বিচক্ষণ লোকের মতই পরামর্শ দিয়েছেন, আমিও ভেবে দেখলাম, বসন্ত ওকালতিটা পাশ করে নিক আমি চাকরিতে থাকতে থাকতে। কী বলো, ভালো বুদ্ধি নয়? আরো একজন এডভোকেটকে দলিল-দস্তাবেজ দেখিয়েছি—তিনিও ওই এক কথাই বললেন, কাগজপত্তর পরিষ্কার—দাগ নেই···

এর আরো কয়েক বছর পরে এসেছি হেড অফিসে। এসে দেখেছি, রায়মশাই সেই রেকর্ড সেক্‌শানে, সেই চেয়ারে সেই-ভাবেই কাজ করছেন। আরো বুড়ো হয়ে গেছেন। ভূধরবাবু প্রমোশন পেয়েছেন। অবিনাশবাবু বদ্‌লি হয়ে গেছেন। সুধীরবাবু রিটায়ার করেছেন। অফিসের অনেক কিছুরই পরিবর্তন হয়ে গেছে। কিন্তু রায়মশাই···

এবারও জিজ্ঞেস করলাম—কী হলো, চাকরি এখনও ছাড়েন নি?

রায়মশাই বললেন—এই যে, এইবার সব ঠিক করে ফেলেছি, বসন্তর বিয়েটাও দিয়ে দিয়েছি, ভারী সুলক্ষণা মেয়ে, মুলোজোড়ের বিখ্যাত দত্তবংশের নাম শুনেছ তো? সেই বংশের মেয়ে এনেছি ঘরে। এইবার এক চান্সে আইনটাও পাশ করে ফেলেছে বসন্ত—এই দরখাস্তটা এনেছি আজ,

বিকেলবেলা দাস সাহেবকে নিজের হাতে দিয়ে আসবো,—আজ দিনটাও ভালো, পাঁজি দেখে নিয়েছি। এইবার চাকরির মাথায় লাথি মেরে···

ভুধরবাবু আমাকে বললেন—আবে আপনিও যেমন, একবার এ-খাঁচায় ঢুকলে আর কারো বেরুবার সাধ্যি আছে? তা তিনি রাজাই হোন, আর নফরই হোন···

এর বছর তিনেক পরে এসে শুনলাম, একদিন আগেও নয়, একদিন পরেও নয়, ঠিক পঞ্চান্ন বছর পুরিয়ে রায়মশাই রিটায়ার করে গেছেন। এক বছরের একস্‌টেন্‌শনের দরখাস্তও করেছিলেন, মঞ্জুর হয়নি। তাও প্রায় সাত মাস হয়ে গেল আজ। চেয়ে দেখলাম, সেই জায়গায় আর একটি ছোকরা বসে কাজ করছে। পুরনো লোকেব মধ্যে এখন কেবল ভুধরবাবু আছেন। বললেন—রাজা গঙ্গাগোবিন্দ রায়ের খবর শুনেছেন?

ব্যাকুলভাবে বললাম না—তো! কী খবর?

—তিনি রিটায়ার করে গেছেন শুনেছেন? একস্‌টেন্‌শন চেয়েছিলেন, কিন্তু মঞ্জুব হয়নি। শুনেছেন?

—তা শুনেছি, এখানে এসে শুনলাম।

—আর কিছু শুনেছেন?

বললাম—না।

—তবে কিছুই শোনেন নি। ছোট রাজা-বাহাদুর বসন্তবল্লভ রায় বিখ্যাত মূলোজোড়ের দত্তবংশের বউ নিয়ে আলাদা হয়ে গেছেন, শুনেছেন?

—সে কি!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ভবানীপুরে সে বাড়ি ভাড়া নিয়েছে, ওকালতি করে আলিপুর কোর্টে, রায়মশায়ের প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের সাড়ে 'ছ' হাজার টাকা পর্যন্ত মেরে দিয়ে, দাদা-বৌদিকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সেদিন সুধীরবাবুর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলো। তিনি বললেন, রায়মশায়ের নাকি ভারী দুরবস্থা! তাঁরা ছেলেপুলে নিয়ে হাওড়া জেলার কোন্ একটা গ্রামে আছেন

—খেতে না-পাবার মতন একেবারে নিঃসম্বল অবস্থা! একটা পয়সা নেই, সাবালক ছেলে নেই, দু'টো অবিবাহিতা মেয়ে ঘাড়ের ওপর···

দীর্ঘকালের এত সব ঘটনার পর আজ মেচাদা লোকাল থেকে নেমে নির্জন প্লাটফরমে হঠাৎ রায়মশা'য়ের সঙ্গে প্রথম মুখোমুখি হ'লাম। কিন্তু আমার কথা যেন তাঁর কানে গেল না। আমি আবার বললাম—অবাক-জলপান আছে?

রায়মশাই এবার যেন শুনতে পেলেন। বললেন—আছে।

বলে ছেঁড়া সুটকেস্‌টা খুলে একটা প্যাকেট আমাকে দিলেন। আমিও দু'টো পয়সা দিলাম তাঁর হাতে।

আমি হঠাৎ বলে ফেললাম—আমাকে চিনতে পারেন, রায়মশাই?

রায়মশা'য়ের চোখ দু'টো নির্বিকার নিষ্পলক। আমিও ভাল করে দেখতে লাগলাম তাঁকে। নিস্তব্ধ প্লাটফরমের পরিপ্রেক্ষিতে কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ মনে হলো তাঁকে। মুখে বিড়-বিড় করে কী বলে চলেছেন। চোখের দৃষ্টিও উদ্‌ভ্রান্ত, লক্ষ্যহীন!

হঠাৎ রায়মশাই অন্য দিকে চোখ রেখেই বলে উঠলেন—ভালো উকিল-টুকিল জানা-শোনা আছে আপনার? ভালো উকিল?

বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করে উল্টো-দিকে চলে যাচ্ছিলেন, এমন সময় এক কাণ্ড ঘটলো।

হ্যারিকেন লণ্ঠন আর লাঠি নিয়ে জন-কতক লোক এসে হাজির হলো।

একজন বললে—এই যে, মামাবাবু এখানেই···

আর একজন বললে—বারবার করে বলেছি তোমাদের, পায়ে লোহার চেন্‌ দিয়ে বেঁধে রাখবে, তা' তো শুনবে না···

কলকাতার ট্রেণে উঠে পকেট থেকে অবাক-জলপানের প্যাকেটটা বার

করলাম। এতক্ষণে মনে পড়লো। ওপরে খবরের কাগজের মোড়ক। তলায় শালপাতা নেই। কিন্তু সমস্তটা খুলে হতবাক্ হয়ে গেছি। চিনে-বাদাম, ডালভাজা, কাঠিভাজা—কিছুই নেই। শুধু খানিকটা ধূলো-বালি আর কাঁকর···

অবাক্-জলপানই বটে!

সেগুলোর দিকে চেয়ে মনে হলো, ওগুলো ধূলো-বালি আর কাঁকর নয় শুধু ও যেন রায়মশা'য়েরই জীবনের অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ!

রামায়ণের যুগে ধরণী একবার দ্বিধা হয়েছিলো। সে-রামও নেই, সে-অযোধ্যাও নেই। কিন্তু কলিযুগে যদি দ্বিধা হোত ধরণী, তো আর কারো সুবিধে হোক আর না হোক—ভারি সুবিধে হোত রমাপতির।

সত্যি, অমন অহেতুক লজ্জাও বুঝি কোনও পুরুষমানুষের হয় না।

মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে সবাই গল্প করছি।

হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো ননীলাল। বললে—ঐ আসছে রে—

কিন্তু ওই পর্যন্ত! আমরা সবাই চেয়ে দেখলাম—রমাপতি আমাদের দেখেই আবার নিজের বাড়ির মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। সবাই বুঝলাম—রমাপতির যত জরুরী কাজই থাক, এখনকার মত এ-রাস্তা মাড়ানো ওর বন্ধ। বাড়িতে ফিরে গিয়ে হয়ত চুপ করে বসে থাকবে খানিকক্ষণ। তারপর হয়ত চাকরকে পাঠাবে দেখতে। চাকর যদি ফিরে গিয়ে বলে যে রাস্তা পরিষ্কার, তখন আবার বেরুতে পারবে!

বললাম—চল আমরা সরে যাই, ওর অসুবিধা করে লাভ কি?

ননীলাল বললে—কেন সরতে যাবো? এ-রাস্তা কি ওর? লেখাপড়া শিখে এমন,মেয়েছেলের বেহদ্দ—আমরা কি ওকে খেয়ে ফেলবো?

এমনই রমাপতি! রাস্তা দিয়ে চলতে গেলে পাছে কেউ জিজ্ঞেস করে বসে—কেমন আছো? তখন যে কথা বলতে হবে। মুখ তুলতে হবে! চোখে চোখ রাখতে হবে!

সম-বয়সী বৌদিরা হাসে। বলে—ছোট ঠাকুরপো বিয়ে হলে কি করবে—

মেজ বৌদি বলে—আমাদের সামনেই মুখ তুলে কথা বলতে পারে না তো বউ-এর সঙ্গে কি করে রাত কাটাবে ভাই—

বাড়িতে অনেকগুলো বৌদি। কেউ কেউ কমবয়সী আবার। তারা নিজের নিজের স্বামীর কথাটা কল্পনা করে নেয়। যত কল্পনা করে তত হাসে। অন্য সব ভাইরা সহজ স্বাভাবিক মানুষ। ব্যতিক্রম শুধু রমাপতি।

শুনতে পাই বাড়িতেও রমাপতি নিজের নির্দিষ্ট ঘরটার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। ঘরের মধ্যে বসে কী করে কারো জানবার কথা নয়। খাবার ডাক পড়লে একবার খেয়ে আসে। তরকারিতে নুন না-হলেও বলবে না মুখে। জলের গ্লাস দিতে ভুল হলেও চেয়ে নেবে না। পৃথিবীকে এড়িয়ে চলতে পারলেই যেন ভালো।

এক-একদিন হঠাৎ বাড়ি আসার পথে দূর থেকে দেখতে পাই হয়ত রমাপতি হেঁটে আসছে। সোজা ট্রামরাস্তার দিকেই আসছে। তারপর আমাকে দেখতে পেয়েই পাশের গলির ভেতর ঢুকে পড়লো। পাঁচ মিনিটের রাস্তাটা ত্যাগ করে পনেরো মিনিটের গলিপথ দিয়েই উঠবে ট্রামরাস্তায়।

কিন্তু তবু অতর্কিতেও তো দেখা হওয়া সম্ভব!

গলির বাঁকেই যদি দেখা হয়ে যায় কোনও চেনা লোকের সঙ্গে। হয়ত মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন পাড়ার প্রবীণতম লোক। জিজ্ঞেস করে বসলেন—এই যে রমাপতি, তোমার বাবা বাড়ী আছেন নাকি?

নির্দোষ নির্বিরোধ প্রশ্ন। আততায়ী নয় যে ভয়ে আঁৎকে উঠতে হবে। পাওনাদার নয় যে মিথ্যে বলার প্রয়োজন হবে। একটা 'হাঁ' । 'না'—তাও বলতে রমাপতির মাথা নীচু হয়ে আসে, কান লাল হয়ে ওঠে কপালে ঘাম ঝরে। সে এক মর্মান্তিক যন্ত্রণা যেন। তারপর সেখান থেকে এমন ভাবে সরে পড়ে, যেন মহা বিপদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে গেছে।

ছোটবেলায় রমাপতি একবার কেঁদে ফেলেছিল।

তা ননীলালেরই দোষ সেটা।

একা-একা রমাপতি চলেছিল কালীঘাট স্টেশনের দিকে। ও-দিকটা এমনিতেই নিরিবিলি। বিকেল বেলা ট্রেণ থাকে না। চারিদিকে যত দূর চাও কেবল ধূ ধূ ফাঁকা। বড় প্রিয় স্থান ছিল ওটা রমাপতির। আমরা জানতাম না তা।

দল বেঁধে আমরাও ওদিকে গেছি। ধূমপানের হাতেখড়ির পক্ষে জায়গাটা আদর্শ স্থানীয়। হঠাৎ নজরে পড়েছে সকলের আগে বিশ্বনাথের। বললে—আরে রমাপতি না—?

সকলে সত্যিই অবাক হয়ে দেখলাম—দূরে রেল-লাইনের পাশের রাস্তা ধরে একা একা চলেছে রমাপতি। আমাদের দিকে পেছন ফেরা। দেখতে পায়নি আমাদের।

দুষ্ট বুদ্ধি মাথায় চাপলো ননীলালের। বললে—দাঁড়া, এক কাজ করি—ওর কাছা খুলে দিয়ে আসি—

যে-কথা সেই কাজ। তখন কম বয়েস সকলের। একটা নিষিদ্ধ কাজ করতে পারার উল্লাসে সবাই উন্মত্ত। ননীলালের উপস্থিতি টের পায়নি রমাপতি। ননীলালের রসিকতার সিদ্ধিতে সবাই মাঠ কাঁপিয়ে হো হো করে হেসে উঠেছি।

কিন্তু রমাপতির কাছে গিয়ে মুখখানার দিকে চেয়ে ভারী মায়া হলো। রমাপতি হাউ হাউ করে কাঁদছে।

সে-গল্প বিয়ের পর প্রমীলার কাছেও করেছি।

প্রমীলা বলে—আহা বেচারা, তোমরাই ওকে ওমনি করে তুলেছ—

সেদিন প্রমীলা বললে—ওই বুঝি তোমাদের রমাপতি—এস—এস—দেখ—দেখে যাও—

বললাম—ওকে তুমি চিনলে কী করে?

প্রমীলা বললে—ও না হয়ে যায় না, আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি—একবার মুখ তুলে পর্যন্ত চাইলে না ওপর দিকে, ও-বয়েসে এমন দেখা যায় না তো—বারান্দার কাছে গিয়ে দেখি সত্যি ঠিকই চিনেছে। রমাপতিই বটে।

বললাম—সরে এসো, নইলে মূর্চ্ছা যাবে এখনি—

তা' অন্যায়ও কিছু বলিনি আমি।

ক্লাস সেভেন-এ গুড-কন্‌ডাক্ট-এর প্রাইজ পেয়েছিল রমাপতি। মোটা মোটা তিনখানা ইংরিজী ছবির বই। সে-ই প্রথম আমাদের স্কুলে ও-প্রাইজের প্রচলন হলো। স্কুলের হলে লোকারণ্য। আমরা স্কুলের ছাত্ররা সেজেগুজে গিয়ে একেবারে সামনের বেঞ্চিতে বসেছি। আমরা খারাপ ছেলের দল সবাই। কেউ প্রাইজ পাবো না। কমিশনার ম্যাকেয়ার সাহেব নিজের হাতে সবাইকে প্রাইজ দিচ্ছেন। এক-একজন করে বুক ফুলিয়ে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে আর প্রাইজ নিয়ে প্রণাম করে নিজের জায়গায় এসে বসছে।

তারপর ম্যাকেয়ার সাহেব ডাকলেন—মাস্টার রমাপটি সিনহা—কেউ হাজির হলো না।

সাহেব আবার ডাকলেন—মাস্টার রমাপটি সিনহা—

সেক্রেটারী পরিতোষবাবু এদিক ওদিক চাইতে লাগলেন। হেডমাস্টার কৈলাসবাবুও একবার চোখবুলিয়ে নিলেন আমাদের দিকে, তারপর নিচু গলায় কী বললেন সাহেবকে গিয়ে। তারপর থেকে গুড কন্‌ডাক্টের প্রাইজটা বরাবর রমাপতিই পেয়ে এসেছে। কিন্তু কখনও সভায় এসে উপস্থিত হয়নি। সে-সময়টা কালীঘাট স্টেশনের নিরিবিলি রেল-লাইনটার পাশের রাস্তা ধরে একা একা ঘুরে বেড়িয়েছে সে।

এর পর আমরা একে একে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কাজে ঢুকেছি। একা রমাপতি আই-এ পাশ করেছে, বি-এ পাশ করেছে। আমাদের সঙ্গে কচিৎ কদাচিৎ দেখা হয়। দেখা যদিইবা হয় তো সে একতরফা!

দেখা না হলেও কিন্তু রমাপতির খবর নানাসূত্রে পেয়ে থাকি। চুল ছাঁটতে ছাঁটতে কানাই নাপিত বলেছিল—ছোটবাবু, দাড়িটা এবার কামাতে সুরু করুন—আর ভালো দেখায় না—

আমরা তখন সবাই ক্ষুর ধরেছি। কিন্তু রমাপতি তখনও একমুখ দাড়ি গোঁফ নিয়ে দিব্যি মুখ ঢেকে বেড়ায়।

কানাই এবাড়ির পুরানো নাপিত। পৈতৃক নাপিতও বলা যায়। রমাপতিকে জন্মাতে দেখেছে।

বললে—নতুন ক্ষুরটা আপনাকে দিয়েই বউনি করি আজ—কী বলেন ছোটবাবু—রমাপতি মুখ নিচু করে খানিকক্ষণ ভেবে বলেছিল—না না ছিঃ—লোকে কী বলবে—

কানাই নাপিত বলেছিল—লোকের আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেইতো—আপনার দাড়ি নিয়ে যেন মাথা ঘামাচ্ছে সব—

—না, থাক রে, সামনে গরমের ছুটি আসছে সেই সময় কলেজ বন্ধ থাকবে—তখন দিস বরং কামিয়ে—

হঠাৎ যেদিন প্রথম দাড়ি গোঁফ কামানো চেহারা দেখলাম—সেদিন ঠিক চিনতে পারিনি। ছাতার আড়ালে মুখ ঢেকে চলেছে রমাপতি। আমাকে দেখে হঠাৎ গতিবেগ বাড়িয়ে দিলে। নতুন জুতো পরতে লজ্জা! নতুন জামা পরতে লজ্জা! ওর মনে হয় সবাই ওকে দেখছে যেন।

উমাপতিদার বিয়েতে বৌভাতের নিমন্ত্রণে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—সেজদা, রমাপতিকে দেখছি না যে—সে কোথায়—

সেজদা বললে—সে তো সকালবেলা খেয়ে দেয়ে বেরিয়েছে বাড়ি থেকে, সব লোকজন বিদেয় হলে রাত্তিরের দিকে বাড়ি ঢুকবে—

এ পাড়ায় মেয়েরা পরস্পরের বাড়ি বেড়াতে যাওয়ার অভ্যাসটা রেখেছে। যেদিন দুপুরবেলা কেউ এল বাড়িতে, রমাপতি বাইরের সিঁড়ি দিয়ে টিপি

টিপি পায় বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়। রাস্তায় বেরিয়ে কোনও রকমে ট্রামে বাসে উঠে পড়তে পারলেই আর ভয় নেই। সব অচেনা লোক। অচেনা লোকের কাছে বিশেষ লজ্জা নেই তার!

বড় যদুপতির শ্বশুর এ বাড়িতে কাজে কর্মে ছাড়া বড় একটা আসেন না। মেজ উষাপতির শ্বশুর মশাই মারা গেছেন বিয়ের আগে। সেজ ভাই উমাপতিদার শ্বশুর নতুন। রবিবার রবিবার মেয়ে এখানে থাকলে দেখতে আসেন। তিনি আবার একটু কথা বলেন বেশি।

বাড়ির সকলকে ডাকা চাই। সকলের সঙ্গে কথা কওয়া চাই। সকলের খোঁজ খবর নেওয়া চাই। মেয়েকে বলেন—হ্যাঁরে, তোর ছোট দেওরকে তো কখনও দেখতে পাইনা—এতদিন ধরে আসছি—

মেয়ে বলে—ছোট ঠাকুরপোর কথা বোল না বাবা, তুমি রবিবারে আসবে শুনে সকালবেলাই সেই যে বেরিয়ে গেছে বাইরে—আর আসবে সেই দুপুরবেলা বারোটার সময়, তা-ও, বাড়ির বাইরে থেকে যদি বুঝতে পারে তুমি চলে গেছ—তবে ঢুকবে, নইলে এক ঘণ্টা পরে আবার আসবে—

উমাপতিদার শ্বশুর হাসেন। বলেন—কেনরে, আমি কী করলাম তার!

মেয়ে বলে—তুমি তো তুমি, বাড়ির লোকের সঙ্গেই কখনও কথা বলতে শুনিনি—ছোট ঠাকুরপো বাড়িতে থাকলেই টের পাওয়া যায় না ঘরে আছে কি নেই—

উমাপতির শ্বশুর কী ভাবেন কে জানে! কিন্তু এ বাড়ির লোকের কাছে এ ব্যাপার গা-সওয়া।

মা বলেন—তোমরা কিছু ভেবো না বৌমা, রমা আমার ওই রকম—আমার সঙ্গেই লজ্জায় বলে কথা বলে না—

কথাটা অবিশ্বাস্য হলেও একেবারে মিথ্যে নয়।

স্বর্ণময়ীর সেবার ভীষণ অসুখ হয়েছিল। ছেলেরা রাতের পর রাত জেগে মায়ের সেবা করতে লাগলো। বউদেরও বিশ্রাম নেই। ডাক্তারের পর ডাক্তার আসে। ইন্‌জেকসন্, ওষুধ, বরফ—অনেক কিছু!

একটু সেরে উঠে স্বর্ণময়ী চারদিকে চেয়ে দেখলেন। বললেন—রমা কোথায়?

রমাপতি তখন ঘরে বসে বই পড়ছিল দরজা ভেজিয়ে দিয়ে।

বড়দা একেবারে ঘরে ঢুকে বললেন—মা'র এতবড় একটা অসুখ গেল আর তুমি একবার দেখতে গেলে না—

দাদার কথায় রমাপতি অবশ্য গেল দেখতে মা'কে। রোগীর ঘরে তখন বাড়ির লোক, আত্মীয়-স্বজনে পরিপূর্ণ। রমাপতি কিন্তু কিছুই করলো না। কিছু কথাও বেরুল না তার মুখ দিয়ে। চুপচাপ গিয়ে খানিকক্ষণ সকলের পেছনে দাঁড়ালো সসঙ্কোচে। তারপর কেউ দেখে ফেলবার আগেই পালিয়ে এসেছে আবার নিজের ঘরে।

স্বর্ণময়ীর সে কথা এখনও মনে আছে। বলেন—তোমরা ভাবো ওর বুঝি মায়া-দয়া কিছু নেই—আছে বৌমা, সেদিন নিজের চোখে দেখলাম যে—দোতলার বারান্দায় মেজ বৌমার ছেলে ঘুমোচ্ছিল, কেউ কোথাও নেই, রমু আমার দেখি ছেলের গাল টিপে দিচ্ছে—মুখময় চুমু খাচ্ছে, সে যে কী আদর কী বলবো তোমাদের, রমু যে আমার ছেলে-পিলেদের অমন আদর করতে পারে আমি তো দেখে অবাক, ...তারপর হঠাৎ আমায় দেখে ফেলতেই আস্তে আস্তে নিজের ঘরে চলে গেল—

প্রতিবেশীরা বেড়াতে এসে বলে—তোমার ছোট ছেলের বিয়ে দেবে না দিদি—?

স্বর্ণময়ী বলেন—রমুর বিয়ের কথা ভাবলেই হাসি পায় মা, ও—ও আবার সংসার করবে, ছেলে পিলে হবে। যা'র কাছা খুলে যায় দিনে দশবার,

তরকারীতে নুন না হলে বলবেনা মুখ ফুটে, এক গেলাস জল পর্যন্ত চেয়ে খাবে না, একবারের বদলে দু'বার ভাত চেয়ে নেবে না······

তা' এই হলো রমাপতি। রমাপতি সিংহ। একে নিয়েই আমাদের গল্প।

আমার এক আত্মীয় একদিন টেলিফোনে ডেকে পাঠালেন বাড়িতে।

বললেন—তোমাদের পাড়ায় রমাপতি সিংহ বলে কোনও ছেলেকে চেন?

বললাম—চিনি, কিন্তু কেন?

তিনি বললেন—ছেলেটি কেমন? আমার রেবার সঙ্গে মানাবে?

রেবাকে চিনতাম। আই-এতে দশ টাকার স্কলারশিপ পেয়েছিল। থার্ড ইয়ারে পড়ছে। বেশ স্মার্ট মেয়ে। বাবার কাছে মোটর চালান শিখেছে। অটোগ্রাফের খাতা জওহরলাল নেহরু থেকে সুরু করে কোনও নেতার সই আর বাদ নেই। নিজে ক্যামেরায় ছবি তোলে। ভায়োলিন বাজিয়ে মেডেল পেয়েছে কলেজের মিউজিক কমপিটিশনে। মোটকথা যাকে বলে কালচার্ড!

আমি সেদিন সম্মতি দিলে বোধহয় বিয়েটা হয়েই যেত। পাত্র হিসেবে রমাপতি খারাপই বা কি! নিজে শিক্ষিত কলকাতায় নিজেদের তিনখানা বাড়ি। সংসারে ঝামেলা নেই কিছু। বোনদেরও সকলের বিয়ে হয়ে গেছে। চার ভাই-ই বেশ উপার্জনক্ষম! ভাইদের মধ্যে মিলও খুব।

রেবার মা বলেছিলেন—কিন্তু কেন যে তুমি আপত্তি করছো বাবা, বুঝতে পারছি না—

আমি বলেছিলাম—রেবাকেই জিজ্ঞেস করে দেখুন মাসীমা, এ-সব শুনেও যদি মত দেয় তো······

কিন্তু রেবাই নাকি শেষ পর্যন্ত মত দেয়নি।

আজ ভাবছি সেদিন সম্মতি দিলেই হয়ত ভালো করতাম। শেষ পর্যন্ত

রেবার বিয়ে হয়েছিল এক বিলেতফেরত অফিসারের সঙ্গে, তারপর সে ভদ্রলোক শেষকালে······কিন্তু সে-কথা এ-গল্পে অবান্তর।

এরপর ননীলাল এসে খবর দিয়েছিল—ওরে রমাপতির বিয়ে হচ্ছে যে—

আমরা সবাই অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলাম—সে কি? কোথায়?

ননীলাল বললে—খবর পেলাম এবার আর কলকাতায় সম্বন্ধ নয়—জব্বলপুরে—জব্বলপুরে কা'র মেয়ে, মেয়ে কী করে—সব খবর ননীলালই বার করলে।

শেষে একদিন বললে—ভাই, চোখের ওপর নারীহত্যা দেখতে পারবো না—আমি ভাংচি দেবো—সত্যি সত্যিই ননীলাল ঠিকানা জোগাড় করে বেনামী চিঠি দিলে একটা। আপনারা যা'কে পছন্দ করেছেন তার সম্বন্ধে কলকাতায় এসে পাড়ার লোকের কাছে ভালো করে সংবাদ নেবেন। নিজেদের মেয়েকে এমন করে গলায় ফাঁস লাগিয়ে দেবেন না—ইত্যাদি অনেক কটু কথা।

বিয়ে ভেঙে গেল।

শুধু সেইবারই প্রথম নয়। যতবারই ননীলাল বা আমরা কেউ সংবাদ পেয়েছি চিঠি লিখে বিয়ে ভেঙে দিয়েছি। আমাদের সত্যিই মনে হয়েছে রমাপতির সঙ্গে বিয়ে হলে সে মেয়ের জীবনে বিড়ম্বনার আর অবধি থাকবে না।

কিন্তু হঠাৎ একদিন বিনা-ঘোষণায় রমাপতির বিয়ে হয়ে গেল।

কেউ কোনও সংবাদ পায়নি। মাত্র একদিন আগে আমার কানে এল খবরটা।

প্রমীলাও বহরমপুরের মেয়ে। বললাম—বহরমপুরের কমল মজুমদারকে চেন নাকি? খুব বড় উকিল? তাঁর মেয়ে প্রীতি মজুমদার?

প্রমীলা চমকে উঠলো।

—প্রীতি? আমরা তাকে ডাকতাম বেবি বলে। —বহরমপুরের বেবি মজুমদারকে কে না চেনে—একটা চোদ্দ বছরের ছেলে থেকে সুরু করে ষাট বছরের বুড়ো সবাই চিনবে তাকে, বেবি টেনিসে তিনবার চ্যাম্পিয়ন, ওকে চিনবো না—

কিন্তু তখন আর উপায় নেই। চিঠি লিখে জানালেও একদিন পরে খবর পাবে। ননীলাল শুনে কেমন বিমর্ষ হয়ে গেল।

তবু যেন কেমন সন্দেহ হলো। তারা শেষকালে আর পাত্র পেলে না খুঁজে! শেষে এই আকাট ছেলেটার হাতে পড়বে! আর কোনও প্রীতি মজুমদার আছে নাকি বহরমপুরে!

প্রমীলা বললে—মজুমদার অবিশ্যি আরো আছে ওখানে—কিন্তু খবর নাও দিকিনি ওর নাম বেবি কিনা—

তখন আর খবর নেবারই বা সময় কোথায়।

প্রমীলাও কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে গেল। বললে—বেবির সঙ্গে বিয়ে হবে শেষকালে তোমাদের রমাপতির—সে যে ভারি খুঁতখুঁতে মেয়ে—গোঁফওয়ালা ছেলেদের মোটে দেখতে পারতো না, ওর প্রাইভেট টিউটার ছিল বষ্ঠিনাথবাবু, তাকেই ছাড়িয়ে দিলে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম—তোর মাষ্টারকে ছাড়ালি কেন? ও বলেছিল—বড্ড বড় বড় গোঁফ বষ্ঠিনাথবাবুর, ওই গোঁফ দেখলে আমার ভয় পায়—তা' তুমিও তাকে দেখেছ তো—

বললাম—কোথায়?

—কেন, সেই যে বাসর ঘরে?

বাসর ঘরে কত মেয়েই এসেছিল, সকলকে মনে থাকবার কথা নয় আজ। তবু মনে করতে চেষ্টা করলাম।

প্রমীলা আবার মনে করিয়ে দিতে চেষ্টা করলে—মনে পড়ছেনা তোমার?

সেই যে কালো জমির ওপর জরির কাজ করা শিফন সাড়ি পরে এসেছিল, লংক্লিভের সাদা লিনেনের ব্লাউজ পরা—খুব কথা বলছিল ঠেস দিয়ে দিয়ে—মনে নেই ?

তবুও মনে পড়লো না !

প্রমীলা আবার বলতে লাগলো—বিয়েব পরদিন মা জিজ্ঞেস করেছিল—কেমন জামাই দেখলে বেবি ! বেবি বলেছিল—ভালো। কিন্তু আমাকে বলেছিল—তোর বর ভালই হয়েছে মিলি কিন্তু আর একটু লম্বা হলে ভাল হতো—

যে-মেয়ে এত খুঁতখুঁতে তার সঙ্গে রমাপতির কিছুতেই বিয়ে হতে পরে না।

প্রমীলাও সন্দেহ প্রকাশ করলো। না না—সে মেয়ে হতেই পারে না—অন্য কোনও প্রীতি মজুমদার হবে দেখো—

কখন বিয়ে করতে গেল রমাপতি—কেউ জানতে পারলো না। ভোরের ট্রেণ। রাত থাকতে থাকতে উঠে একজন পুরোহিত আর দু'চারজন আত্মীয়-স্বজনকে নিয়ে দলবল বেরিয়ে গেছে। বউ যখন এল তখনও বেশ রাত হয়েছে। অনেকেই তখন খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়বার ব্যবস্থা করছে। শাঁখের আওয়াজ পেয়ে প্রমীলা উঠে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো একবার। আমিও উঠে গেলাম।

বাড়ির লোকজনের ভিড়ের ভেতর ঘোমটা-টানা বউটিকে দেখতে পেলাম না ভালো করে। আর রমাপতিও যেন টোপরের আড়ালে নিজেকে গোপন করে ফেলতে চেষ্টা করছে। মনে হলো—লজ্জায় চোখদুটো সে বুজে ফেলেছে। কোনও রকমে এতদূর এসেছে সে বর বেশে, কিন্তু পাড়ার চেনা লোকের ভিড়ের মধ্যে সে যেন মর্মান্তিক যন্ত্রণা অনুভব করছে।

আমাদের বাড়ি থেকে একা আমারই নিমন্ত্রণ ছিল।

অনেক রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বাড়ি ফিরতেই প্রমীলা ধরলে—কেমন বউ দেখলে—আমাদের বেবী নাকি ?

বললাম—কী জানি চিনতে পারলাম না—কিন্তু যা'র বিয়ে তারই দেখা পেলাম না—

—সে কি ?

—সে যে কোথায় লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে—অনেক চেষ্টা করলাম দেখতে, কিছুতেই দেখা পেলাম না।

পরদিন সেই কথাই আলোচনা হলো।

ননীলালকে জিজ্ঞেস করলাম—বউ দেখলি রমাপতির ?

ননীলাল যেন কেমন গম্ভীর-গম্ভীর। বললে—বউটার কপালে অনেক দুঃখু আছে ভাই—বেচারী ওর হাতে পড়ে মারা যাবে দেখিস্—

জিজ্ঞেস করলাম—রমাপতিকে দেখলি কাল ?

কেউ দেখতে পায় নি। সমস্ত লোকজন আত্মীয়-স্বজনের দৃষ্টি থেকে সরে গিয়ে কোথায় যে লুকিয়ে রইল রমাপতি, সে-ই এক সমস্যা। বিশ্বনাথ বললে—সে-ও দেখেনি।

কিন্তু কনক বললে—আমি দেখেছি।

—কোথায় ?

—দেখলাম, মিষ্টির ভাড়ারে গেঞ্জী গায়ে ওর পিসীর কাছে তক্তপোষের ওপর বসে রয়েছে—জানলার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম, আমাকে দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিলে—কানাই নাপিতকে চেপে ধরলাম। সে বরের সঙ্গে গিয়েছিল।

সে তো হেসে বাঁচে না। বলে—ছোটবাবুর কাণ্ড দেখে সবাই অবাক সেখানে—

—সে কী রে—

—আজ্ঞে, সবাই বলে বর বোবা নাকি ? কনের বাড়ির মেয়েছেলেরা খুব নাকাল করেছেন ছোটবাবুকে সারারাত, মাঝ রাতে বাসরঘর থেকে বেরিয়ে এসে ছোটবাবু আমার কাছে হাজির। আমি ছাতের এক কোণে ঘুমোচ্ছিলাম, ছোটবাবু চৌপর রাত সেই ছাতে বসে কাটাবে আমার কাছে —কিন্তু মেয়েছেলেরা শুনবেন কেন ? তাঁরা আমোদ-আহ্লাদ করতে এসেছেন······

কিন্তু পরদিন প্রমীলার কাছে যা শুনলাম তাতে আমার বাক্‌রোধ হয়ে এল। প্রমীলা ভোর বেলা উঠেই ওদের বাড়ি গিয়েছিল। আর ফিরে এল বেলা দশটার সময়।

বললাম—এত দেরি হলো ? দেখা হয়েছে ?

প্রমীলা বললে—গেছি বউ দেখতে, আর না দেখে ফিরে আসবো ? গিয়ে বললাম—মাসীমা, তোমার বউ দেখতে এলাম—কাল শরীর খারাপ ছিল·আসতে পারি নি—

মাসীমা বললে—ছেলে-বউ তো এখনও ঘুমোচ্ছে—তা বোস মা একটু—

তা দরজা খুললো বেলা ন'টার সময়। তোমার বন্ধু তো আমাকে দেখেই পালিয়ে গেল কোথায়। বেবি কিন্তু ঠিক চিনতে পেরেছে। আমাকে দেখেই বললে—মিলি তুই—

তারপরে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো আমায়। দেখলাম—সমস্ত বিছানাটা একেবারে ওলোট-পালোট। নতুন খাট-বিছানা, নয়ন-সুখের চাদর বালিশের ওয়াড়। পাশাপাশি দু'টো বালিশ একেবারে সিঁদুরে মাখামাখি। বেবীর মুখে গালেও সিঁদুরের দাগ।···বিছানায় শুকনো ফুল ছড়ানো—

আমি হাসছিলাম দেখে বেবী জিজ্ঞেস করলে—হাসছিস যে—

বললাম—সারারাত ঘুমোস নি মনে হচ্ছে—

বেবী বললে—ঘুমোতে দিলে তো—বলে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলো।

আমিও স্তম্ভিত। বললাম—বললে ওই কথা?

—তারপর শোনই তো—

প্রমীলা আবার বলতে লাগলো—তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম—তোর বর কেমন হলো? তা'শুনে কী উত্তর দিলে জানো?

বললাম—কী?

প্রমীলা বললে—প্রথমে বেবী কিছু বললে না, মুখ টিপে হাসতে লাগলো, তারপর আমার কানের কাছে মুখ এনে হাসতে হাসতে বললে—বড় নির্লজ্জ ভাই—

জেনানা সংবাদ

বিলাসপুরের ডি-এল-এস্ অফিসের ক্লার্ক কৃষ্ণমূর্তি মারা গেল। মারা গেল যত হঠাৎ, তত হঠাৎ কিন্তু মৃত্যুর প্রসঙ্গ চাপা পড়লো না। কৃষ্ণমূর্তি যতখানি ছিল বাঙালী-বিদ্বেষী ঠিক ততখানি ছিল মাদ্রাজী-বিদ্বেষী। অর্থাৎ কৃষ্ণমূর্তির বউ ছিল বাঙালী মেয়ে।

কথা উঠলো—দায়িত্বটা নেবে কে। এমন ক্ষেত্রে না 'বেঙ্গলী এসোসিয়েশন' না 'সাউথ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' কারোরই মাথাব্যথা হবার কথা নয়। কারণ কৃষ্ণমূর্তি না-বাঙালী না-মাদ্রাজী। তার আট-দশটা নাবালক ছেলেমেয়ে আর বিধবা বাঙালী বউএর ভারটা নেবে তা'হলে কে? প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের কয়েকশো টাকা ছাড়া বেচারার নির্ভর করবার আর কিছু নেই। বিগতপ্রাণ কৃষ্ণমূর্তি আর তার বিগতশ্রী পরিবারের প্রসঙ্গটা ঘটনাক্রমে রটনায় পর্যবসিত হলো।

রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের করিডরে বসে অফিসারদের মধ্যে তাই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল।

আজাইব্ সিং বললেন—বাঙালী মেয়েরা কিন্তু স্ত্রী হিসেবে আইডিয়াল—

টি-আই বুড়ো এণ্টনী বললে—আমি তা'হলে সত্যি কথাই বলি—তেমন বাঙালী মেয়ে যদি পেতাম তা'হলে আমাকে আর আজীবন আইবুড়ো থাকতে হতো না—

মুদেলিয়ার স্টেশন মাস্টার বললেন—কিন্তু যাই বলো—বাঙালী মেয়েরা 'বড়-ঘর-কুনো, ওই স্বামীটি আর নিজের সংসারটিই কেবল চেনে তারা—

সোনপার সাহেব সিন্ধি। প্রথম পক্ষের স্ত্রী ছিল বাঙালী। গান জানতো। শান্তিনিকেতনে পড়া। বললেন—আপনার কথায় আমার আপত্তি আছে মুদেলিয়ার গারু, ক্যালিফোর্নিয়ার কোনও অজ পাড়াগাঁয়েও যদি কোন ভারতীয় মহিলাকে দেখতে পান, জানবেন সে বাঙালী মেয়ে—

মুদেলিয়ার দমবার পাত্র নন্। দু'পাশে মাথা হেলাতে লাগলেন। বললেন—তা'হলে বলুন না কেন মাহেঞ্জোদারোতে যে নাচওয়ালীর কঙ্কাল পাওয়া গেছে, সে-ও বাঙালী মেয়ের কঙ্কাল—

পাশের 'হলে' বিলিয়ার্ড খেলার গোলমাল শোনা যায়। আর করিডরের খোলা জানালা দিয়ে বাইরে নজরে পড়ে ইনস্টিটিউটের বিরাট লন। অন্ধকার হয়ে এসেছে অনেকক্ষণ। তীব্র আলো জ্বালিয়ে লন্-এর ওপর দু'দলের ব্যাড্‌মিণ্টন্ খেলা চলছে। আর দিল্লী স্টেশনের উর্দু ঠুংরি গান চলেছে রেডিওতে। এতক্ষণে বোধ হয় ওয়ান্ ডাউন এল, আজ বুঝি বম্বে মেল লেট। পিচের রাস্তার ওপর দিয়ে টিম্‌টিমে ল্যাম্প জেলে সার সার টাঙাগুলো শনিচরী বাজারের দিকে ছুটে চলেছে।

সোনপার সাহেব বললেন—আপনি কিছু বলছেন না মেটা সাহেব—

গুরুবচন মেটা এতক্ষণ চুপ-করে বসেছিলেন। এখানকার পি-ডব্লিউ-আই, রেল-লাইনের তদারক করা কাজ তাঁর। আজীবন ব্যাচিলর। শেয়ালকোটের কোন্ গ্রাম থেকে কবে সি-পিতে এসে বসবাস করতে শুরু করেছেন কেউ জানে না। তবু রসিকপুরুষ হিসেবে বন্ধুমহলে তাঁর সুখ্যাতি আছে।

স্টেশন মাস্টার মুদেলিয়ার বললেন—আপনি কিছু মতামত দিন মেটা সাহেব—

জুন মাসের মাঝামাঝি। এবার এখনও মনসুন্ আরম্ভ হলো না। গুরুবচন মেটা আকাশের দিকে চেয়ে সকলের গল্প শুনছিলেন।

বললেন—আমি ব্যাচিলর মানুষ, তরুণী মেয়েদের সম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞতা থাকা অপরাধ—তা' ছাড়া বেঙ্গলে কখনও যাইনি—কলকাতা সম্বন্ধে আমার ধারণা কিছুই নেই—বাঙালী মেয়ে বলতে দেখেছি শুধু সরোজিনী নাইডুকে—জব্বলপুরে যেবার কংগ্রেসের মিটিং-এ এসেছিলেন—

টি-আই বুড়ো এণ্টনী বললে—সরোজিনী নাইডু? হার এক্সেলেন্সী···

গুরুবচন মেটা বললেন—তবে অনেক বছর আগে একজন বাঙালী মেয়ের সঙ্গে আমার একবার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল—জব্বলপুরে—

সবাই বললেন—বলুন, বলুন—

গুরুবচন মেটা বলতে শুরু করলেন—আপনারা যদি মনে করে থাকেন যে, সমস্ত বাঙালী মেয়ের সম্বন্ধে আমার একটা অভিজ্ঞতা আছে তো ভুল করবেন। মেয়েদের সম্বন্ধেই আমার অভিজ্ঞতা কম, তার ওপর বাঙালী মেয়েদের সম্বন্ধে আরও কম! কারণ প্রথমতঃ আমি বাঙালী নই, বাংলাদেশে কখনও যাইনি—তারপর আমার অভিজ্ঞতা শুধু একটিমাত্র বাঙালী মেয়েতেই সীমাবদ্ধ।

টি-আই বুড়ো এণ্টনী বললে—তা হোক—বলুন মিঃ মেটা—ভেরি ইণ্টারেস্টিং—

মেটা বললেন—আমার মতে আপনাদের কথা যদি সত্যি হয় যে, সব প্রদেশবাসীরাই বাঙালী মেয়েদের বউ করে পেতে চায় তো তার প্রধান কারণ হলো বাঙালী মেয়েদের রান্না। অমন সুস্বাদু রান্না করতে আর কোনও জাতের মেয়েরা পারে না—

—সো ভেরি ইণ্টারেস্টিং—তারপর—বুড়ো এণ্টনি বললে।

—তবে একটা কন্‌ডিশন্, গল্পটা আমি যেখানে শেষ করবো তারপরে আমাকে আর কেউ কোন প্রশ্ন করতে পারবেন না—আপনারা জানেন বোধহয় যে, গল্প যেখানে শেষ হয় জীবন সেখানে শেষ হয় না, জীবন বিস্তীর্ণ, ব্যাপক—কিন্তু গল্প জীবনকে ভিত্তি করে গড়ে উঠলেও এক-

জায়গায় তার ক্লাইম্যাক্স আছে—সেখানে এসে গল্পে দাঁড়ি টানতে হয়—তা'তে আপনারা রাজী?—গুরুবচন মেটা সকলের দিকে সপ্রশ্ন চোখে চাইলেন।

সোনপার সাহেব সকলের দিকে চেয়ে নিয়ে বললেন—রাজী আমরা—আপনি বলুন—

রেডিওতে বুঝি এবার ইংরিজী প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে। রেকর্ডে জ্যাজ অর্কেস্ট্রা। সামনের লন্-এ ব্যাড্‌মিণ্টন্ খেলা বন্ধ হলো। কাট্‌নী ব্রাঞ্চের শেষ গাড়ীটা অনেকক্ষণ ছেড়ে গেছে। এতক্ষণে সেখানা বোধহয় পেণ্ড্রারোডের পথে অমরকণ্টকের রেঞ্জ-এর গা দিয়ে টানেল পার হচ্ছে। পূবদিকে প্লাটফরমের উপর গোস্ রুটি আর চায় গরমের হল্লা নেই। প্লাটফরমের তালগাছপ্রমাণ লাইটপোস্টটার আগাপাস্তলা শুধু পোকায় পোকা।

গুরুবচন মেটা বলতে আরম্ভ করলেন—আজ থেকে পঁচিশ বছর আগের ঘটনা—আমি তখন থাকি আমাদের জব্বলপুরের বাড়ীতে। আমার বড় বোনের তখন বিয়ে হয়ে গেছে, সে সবে লায়ালপুরে চলে গেছে—আমি থাকি সারা বাড়ীটাতে একলা—মাঝে মাঝে বাবার দালালি ব্যবসাটা নিয়ে বাইরে ঘুরতে হয়—কখনও নাইনপুর, গণ্ডিয়া, ছিন্দোয়াড়া, আর বালাঘাট—ন্যারো গেজের সমস্ত সেকশনগুলো—আবার কখনও ভুসাওয়াল, ইগ্‌তপুর, বীণা, এলাহাবাদ-কাটনি—সাতদিন আটদিন পরে হয়ত একদিন বাড়ী এলাম—আবার একদিন ব্যাগ আর ব্যাগেজ নিয়ে বেরিয়ে পড়ি টুপ্ করে—

কাজের মধ্যে কাজ ওই দালালি ব্যবসা আর ফুর্তি বলুন আর যাই বলুন একমাত্র রিক্রিয়েশন্ শিকার করা···

তা' বাবারও ছিল শিকারের শখ, আমারও তাই। বাবার দুটো ডবল ব্যারেল বন্দুক পেয়েছিলাম আমি, একটা বারো বোরের আর একটা ষোল বোরের···আর আমি নিজে কিনেছিলাম একটা রাইফেল—ফোর ফিফ্‌টি—

যখনি 'টুরে' যেতাম—ওটা থাকতো সঙ্গে। কখনও কখনও তেমন জায়গায় গিয়ে পড়লে হাতিয়ার-অভাবে যেন বেকুব না হই। একবার অনুপপুর থেকে নেবে মাইল তিনেক দূরে এক নদীর ধারে মাচা বাঁধা হলো বাঘ মারবার জন্যে—উত্তর আর পশ্চিম দিক থেকে নর্মদা আর শোন্ সেখানে এসে মিশেছে—জায়গাটা বাঘশিকারের পক্ষে আইডিয়াল···বিকেল-বেলা উঠলাম গিয়ে মাচার ওপর আমি আর পেণ্ড্রারোডের ঠাকুর সাহেবের ছেলে নর্মদাপ্রসাদ—সে-ও ভালো শিকারী—আর আমাদের 'কিল্'টা রাখা হলো ঠিক···

কিন্তু যাগ্‌গে, আমার গল্পে ও-সব অবান্তর প্রসঙ্গ। আমার এ-গল্প তো শিকার-কাহিনী নয়, এ-গল্প মেয়েমানুষ নিয়ে—সুতরাং সেই প্রসঙ্গেই ফিরে আসি—

আপনারা হাওবাগ্ স্টেশন দেখেছেন? স্টেশনে নেবে সোজা পূব দিকে যে-রাস্তাটা চলে গেছে—ডাইনে বাঁয়ে ছোটবড় অনেক রাস্তাই গেছে—কিন্তু যে-রাস্তাটা বি-এন্-আর-এর মস্ত প্রকাণ্ড মাঠটা ঘুরে বেঁকে সোজা গেছে দক্ষিণ মুখো, আমি সেই রাস্তাটার কথা বলছি···এখন অবশ্য অনেক বাড়ী হয়েছে ওখানে, রেফিউজীরা ভীড করেছে, আশে পাশের জলাজমিগুলোও ভরাট হয়ে গেছে, কিন্তু ও-তল্লাট অমন ছিল না—ওই রাস্তায় ঢোবার মুখে ডানদিকে ছিল শুধু 'সানি-ভিলা', কতকগুলো এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান থাকতো ওই বাড়ীটাতে, আর তারপর ঝোপ-জঙ্গল, কয়েকটা কবর আর সামনে বি-এন-আর-এর জমিতে বিরাট বিরাট আম গাছ—আর তারই বাঁকে পশ্চিমমুখো "শিয়ালকোট্ লজ্"—আমার বাড়ী। সামনে ধরুন বাগান এককালে ছিল, কিন্তু তখন তত কিছু বাহার ছিল না, শুধু গোটাকতক আগাছা ছড়িয়ে আছে এদিক-ওদিক। তবু দোতলার বারান্দায় দাঁড়ালে সামনের রাস্তা আর আশেপাশের সব কিছুই দেখা যায়।

একদিন আমার একতলাটায় একটা ভাড়াটে এল।

এ-পাড়ার দিকে ভাড়াটে বড় একটা আসে না। কারণ এখান থেকে কাস্টরী অনেক দূর। তারপর জি-আই-পি স্টেশন থেকে এখানে আসতে গেলে রিক্সা করতে হবে। বাজার হাট সব দূর। বিশেষ করে ফ্যামিলি নিয়ে বাস করতে গেলে তখনকার দিনে আরো অসুবিধে।

কিন্তু তবু একটা ফ্যামিলি এল। বাঙালী ফ্যামিলি।

কুড়ি টাকা ভাড়া। একমাসের ভাড়া এ্যাডভান্সও দিয়ে দিলে। রসিদটার নীচে সই দিয়েছে মিসেস স্বামীনাথন নিজে। বাড়ী ভাড়া হয়েছে স্ত্রীর নামে—

আজাইব্ সিং বললে—স্বামীনাথন! বাঙালী 'সারনেম' তো অমন শুনিনি কখনও ব্রাদার—

সোনপার সাহেব বললে—হয়—হয়—মেটা ইজ রাইট—আমার ফার্স্ট ওয়াইফের কাছে শুনেছি···বাঙালী জাতটা যেমন পিকিউলিয়র, ওদের সারনেমগুলোও তেমনি পিকিউলিয়র—আমি জানি আমার ওয়াইফের একজন কাজিন্ ছিল তার সারনেম 'গোস'—

মুদেলিয়ার স্টেশন মাস্টার, বললেন—তা' কেন—স্বামীনাথন কখনও কোনও বাঙালীর সারনেম হতে পারে না—ওটা আমাদেরই একচেটে—

সোনপার বাধা দিতে যাচ্ছিলেন। টি-আই বুড়ো এণ্টনী বললে—ওটা একটা মাইনর পয়েণ্ট—আপনার সেই বেঙ্গলী গার্লের গল্পটা বলুন মিস্টার মেটা—

গুরুবচন মেটা বললেন—সেই বেঙ্গলী গার্লের গল্পই তো বলছি, স্বামীনাথন হলো তার হাসব্যাণ্ডের সারনেম—মিসেস স্বামীনাথন একজন বাঙালী মেয়ে, বিয়ে করেছিল হ্যারি স্বামীনাথনকে—ম্যাড্রাসী ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চিয়ান—

টি-আই বুড়ো এণ্টনী বললে—সো ভেরি ইণ্টারেস্টিং···আমাদের ডি-এল-এস্ অফিসের ক্লার্ক কৃষ্ণমূর্তির মতো—তারপর—তারপর—

গুরুবচন মেটা বললেন—কিন্তু তার আসল নাম হলো—

বলতে গিয়ে গুরুবচন মেটা নিজেই হঠাৎ থেমে গেলেন। বললেন—আসল নামটা আপনাদের আগে বলে দিয়ে আর একটু হলে ভুল করছিলাম—কারণ আসল নামটা কি আমারই জানবার কথা। একদিন কি দু'দিন মাত্র দেখেছি ওদের—তা-ও দু'এক সেকেণ্ডের জন্যে—সুতরাং নাম জানা দূরে থাক চেহারাটাও ভালো করে দেখা হয়নি। আর আমি বাড়ীতেই বা থাকি কতক্ষণ—মাসের মধ্যে যে-দশ-বারো দিন বাড়ী থাকি তা-ও ওই শিকার নিয়ে কাটে—তবে এক একদিন শুনতাম বটে—যেদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ী থাকতাম—বাঙালী স্ত্রী ক্রিশ্চিয়ান ম্যাড্রাসী স্বামীকে গান শেখাচ্ছে—বাঙলা গান—গানটার একটা লাইন আমার এখনও মনে আছে—পরে শুনেছিলাম পোয়েট টেগোরের গান—হে নাটারাজ—হে নাটারাজ—

সোনপার সাহেব বললেন—এ গানটা আমার ফার্স্ট ওয়াইফ্ গাইতো—বেঙ্গলীদের টিউন ভেরি পিকিউলিয়র—

—তারপর শুনুন—গুরুবচন মেটা আবার বলতে সুরু করলেন—

—একদিন সাইকেল নিয়ে 'চৌকে' গেছি কী কিনতে, দেখা হলো সুবেদার কেদার সিং-এর সঙ্গে। কেদার আমায় জিজ্ঞেস করলে—তোমার বাড়ীতে একতলায় নতুন এক ভাড়াটে এসেছে দেখলাম—নতুন জেনানা—

আমি বললাম—হ্যাঁ—এক ম্যাড্রাসী ফ্যামিলি—

—ম্যাড্রাসী নয়—আমি চিনি ওকে—চাইবাসায় থাকতো ওর বাবা, ফরেস্ট অফিসার, ওর নাম মিস্ সুজাতা দাশ, ওর বাবা ছিলেন মিস্টার দাশ, রেইস্ আদমী—খানদানী বংশের লোক—কিন্তু সঙ্গের ও লোফারটা কে—

আমি বললাম—ও ওর হাসব্যাণ্ড—হ্যারি স্বামীনাথন—

সুবেদার কেদার সিং বললে—শেষকালে কিনা ওর সঙ্গে বিয়ে হলো—

ওর সঙ্গে বিয়ে হওয়াটা যেন সুবেদার সাহেবের মনঃপূত নয়। সুবেদার সাহেবের কাছেই শুনলাম—মেয়েটি নাকি ভারি খুবসুরৎ ছিল আগে। ভারি বলিয়ে, কইয়ে, নাচিয়ে, গাইয়ে। চাইবাসার সব লোকই নাকি ভালবাসতো সুজাতাকে। বড়লোক বাপ। ঘোড়া ছিল, মোটর ছিল, আবার মাঝে মাঝে সাইকেলও চড়তো ও। কখনও পরতো শাড়ী, কখনও সেরোয়ানী, কখনও সালোয়ার, কখনও পরতো চোদ্দ হাত মাদ্রাজী শাড়ী কাছা কোচা দিয়ে, আবার কখনও পরতো স্রেফ ব্রিচেস আর নেকটাই এর সঙ্গে ট্রাউজার সার্ট।

আমারও দেখে মনে হল ভারী মজবুত গড়নের মেয়ে। ভইষের দুধ, ঘি আর মাঠা না খেলে অমন চেহারা হয় না। তার ওপর আছে তাকত্ আর মেহন্নত। মটর চালানো, ঘোড়ায় চড়া আর সাইকেল পেটা—

সেদিন প্রথম আলাপ হলো।

সন্ধ্যে তখনও হয়নি। হরিশঙ্কর রোডে গিয়েছিলাম বিল্ কালেক্‌শনে, মহাসামুন্দের পি-ডব্লিউ-আই শুক্লাজী ছাড়লো না। একটা বুল্-ডিযার মেরে নিজের ট্রলী করে রায়পুর পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল। তারপর সেটা নিয়ে গণ্ডিয়া জাংসানে ন্যারোগেজ ট্রেন ধরে সন্ধ্যের কিছু আগে আমার "শিয়ালকোট-লজে" এসে পৌঁছুলাম। এবার বাড়ীতে প্রায় দিন কুড়ি গর-হাজির ছিলাম—

আমার চাকর আমার আগেআগে বুল্-ডিযারটা নিয়ে ঘরে গেছে। আমি ধীরে সুস্থে আস্তে আস্তে আসছি। কদিনের ঘোরাঘুরিতে বেশ পরেশান হয়েছিলাম—দিনদয়ালকে বলে দিয়েছিলাম—মাঠা যেন তৈরী রাখে—গিয়েই একগ্লাশ খেয়ে নেবো—

কিন্তু গেট্ দিয়ে ঢুকতেই দেখি মিসেস স্বামীনাথন বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কাছাকাছি আসতেই দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে সেলাম করলে।

বললে—জয় রামজী কি—

তারপর সামনে এসে দাঁড়াতেই বললে—আপনি শিকারপ্রিয় লোক আমি জানতাম না—

আগাগোড়া ক্রেপ্ সিল্কের বুটিদার শাড়ী ব্লাউজ মিসেস স্বামীনাথনের পরনে। জরিদার এক জোড়া পা-ঢাকা চটি—দু'দিকের ব্লাউজের নীচে থেকে সমস্ত হাত দুটো মাস্‌ল্‌-ওয়ালা—মোদ্দা কথা আমাদের গুজরানওয়ালা লাহোরের মেয়েদের পর্যন্ত হারিয়ে দিতে পারে পাঞ্জায়—এমনি তাকত্‌-ওয়ালা জেনানা—দেখে তাজ্জব হয়ে গেলাম।

তারপরেই আমার হাত থেকে বন্দুকটা নিয়ে রীতিমত বাগিয়ে ধরলে—

বললে—ষোল বোরের বন্দুক ব্যাভার করেন আপনি—

বললাম—তিন রকমই আছে যখন যেটা সুবিধে, সেইটে নিই—

মিসেস স্বামীনাথন বললে—আমার আর আপনার দেখছি একই—হল্যাণ্ড এণ্ড হল্যাণ্ড—আপনি কী কার্ট্রিজ কেনেন—

—তার কিছু ঠিক নেই, আজকের বুল-ওয়ারাটা মেরেছি বাক্‌শটে—যখন যেটা সুবিধে হয়, কখনও এল-জি, কখনও এস-জি—

—এ্যাল্‌ফা ম্যাক্স—?

—তারও কোনও ঠিক নেই—তবে এ্যাল্‌ফা ম্যাক্সই আমি পছন্দ করি—

মিসেস স্বামীনাথন বন্দুকটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, ট্রিগার টিপছে, কাঁধের ওপর রেখে 'এইম্' করছে—হঠাৎ লক্ষ্য করলাম বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলটা যেন জখম হয়ে আছে। আঙ্গুলটা কাটা।

দীনদয়ালকে দিয়ে দোস্ত-দোস্তালি সকলের কাছে কিছু কিছু মাংস পাঠিয়ে দিলাম। সুবেদার কেদার সিং-এর কাছে, এতোয়ারীতে মুন্সীজীর কাছে, আরো অনেকের কাছে, আর পাঠালাম একতলায় মিসেস স্বামীনাথনের কাছে।

সেইদিন থেকে ঘনিষ্ঠতা শুরু হলো। সকাল বেলায় সাইকেল চড়ে মিসেস স্বামীনাথন যখন বাজার করে ফেরে তখন বেশ দেখায়। পিঠে বেনী

ঝুলিয়ে দিয়েছে, সিল্কের ঢিলে পায়জামা, গায়ে একটা জুট সিল্কের ঢিলে পাঞ্জাবী আর সামনের বেতের বাস্কেটের মধ্যে আলু, ভিণ্ডি, পরবোল আর ভাজি—এইসব—

হঠাৎ সেদিন আমাকে নেমন্তন্ন করে বসলো মিসেস স্বামীনাথন—

গোয়াড়ীঘাট থেকে গ্রীন পিজিয়ন্ মেরে এনেছে দু'তিন ডজন্। নতুন বট্‌ফল পাকতে শুরু করেছে, বর্ষা শুরু হয়ে গেছে কিনা।

বললে—আজ সকাল-সকাল হ্যারি টাউনে বেরিয়ে গেছে—হাতে কাজ ছিল না, বেরিয়েছিলুম আমার বন্দুকটা নিয়ে, মতলব ছিল 'ডাক্' মারবার, কিন্তু···আজ সন্ধ্যে সাতটায় আসছেন তো, হ্যারিকে বলেছি সে-ও আসবে তার আগেই—

সেদিনকার নেমন্তন্নটা বিশেষ করে মনে আছে এই পঁচিশ বছর পরেও, কারণ অমন মাংসের রোস্ট জীবনে আর খেলুম না—আর খাবোও না। শুনেছিলাম মিসেস স্বামীনাথন নিজে রান্না করেছিল—

সন্ধ্যে সাতটার সময় নেমন্তন্ন। কিন্তু সেদিন মনে হয়েছিল পৃথিবীতে সাতটা বুঝি আর বাজে না। কারণ তখন দীনদয়ালের রান্না খেয়ে খেয়ে আমার অরুচি হয়ে গিয়েছে। আর তা'ছাড়া গ্রীন পিজিয়নটা বরাবরই আমার প্রিয় খাদ্য। তার কাছে কোথায় লাগে মাটন্ কোথায় লাগে ফাউল। যা' হোক ঘড়ির কাঁটায় সাতটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে আমি একতলায় গিয়ে হাজির হয়েছি। মিসেস স্বামীনাথন সেদিন পুরোপুরি বাঙালী সাজে সেজেছিল। একটা পিককের গায়ের রঙের মত ব্রাইট্ জর্জেট শাড়ী ফিগারটাকে লেপটে জড়ানো আর চিতা বাঘের মত ডোরা ডোরা ছিটের ব্লাউজ কাঁধ পর্যন্ত, তার নীচেয় বাচ্চা হরিণের মত নরম মোলায়েম দুটো হাত। বন্দুক হাতে যে-মিসেস স্বামীনাথনকে দেখেছি গুজরানওয়ালার মেয়েদের মত কর্কশ-কঠিন, কী জানি কেমন করে কেউটে সাপের ফণার মত হাতের মাস্‌ল্‌গুলোকে সেদিন সে লুকিয়ে ফেলেছে।

আমি যেতেই পর্দা সরিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলে। বললে—আসুন মেটাজী—

বললাম—মিষ্টার স্বামীনাথন কোথায়—

—হ্যারি এখনই এসে পড়বে, বোধহয় কোনও কাজে আটকে পড়েছে, সেলস্‌ম্যানের কাজ বড় বিশ্রী কাজ মেটাজী, প্রত্যেককে প্লীজ করতে করতে অস্থির—

টেবিলের সামনে মুখোমুখি বসলাম দুজনে।

বললাম—ওঁর ব্যবসা তো অনেক ভালো আর আমাদের দেখুন তো, মাসের মধ্যে পনেরো দিন বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়—শরীরের আর কিছু থাকে না—

মিসেস স্বামীনাথন বললে—তা' হোক, কিন্তু হ্যারি যে বাইরেই যেতে চায় না, বিয়ের আগে ওর ভালো একটা চাকরি ছিল, ছ'শো টাকা মাইনে পেতো—সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখন এই মটরের সেলস্‌ম্যানশিপ ধরেছে, এখন কত বলি একটু বাইরে ঘোরাঘুরি করো—তা' যাবে না—আমাকে ছেড়ে বাইরে গিয়ে একটা রাত কাটাতে পারে না ও—এমন ঘরকুনো—

হেসে বললাম—সে তো যে-কোনও স্ত্রীর পক্ষেই ঈর্ষার বিষয় মিসেস স্বামীনাথন—কিন্তু ছ'শো টাকার চাকরিটা ছাড়লেন কেন—আজকালকার বিজ্‌নেসের বাজার যে-রকম—

না ছেড়ে যে উপায় ছিল না মেটাজী, তখন এমন ব্যাপার হয়ে পড়েছিল, চাকরি তো চাকরি, হ্যারির জীবন নিয়ে টানাটানি, আমার রীতিমত ভয় হয়ে গিয়েছিল—

কেন ?

—হয়ত আত্মহত্যা করে বসবে। বলা তো যায় না—

—কেন আত্মহত্যা করবার কী হয়েছিল ?

মিসেস স্বামীনাথন বললে—হ্যারির পাগলামির কথা তো সব জানেন

না—পুরুষ মানুষ যে অমন সেন্টিমেণ্টাল হতে পারে তা হ্যারির সঙ্গে মেশবার আগে পর্যন্ত আমি জানতাম না—জানেন, তিনবার ও সুইসাইড করতে গিয়েছিল—

কেন? আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম আমি।

—আমার সঙ্গে বিয়ে হবে না বলে—হাসতে হাসতে মিসেস স্বামীনাথন বললে।

তারপর বললে—আমরা হলাম গোঁড়া হিন্দু বাঙালী—বাবা সাহেবী খানা খেলেও হিন্দুয়ানী আমাদের বংশের রক্তের মধ্যে শেকড় বসিয়েছে, আর তা'ছাড়া তখন আমার হাতে চা খেতে বি. সি. এস. থেকে শুরু করে আই. সি. এস. পর্যন্ত পাঁচ ছ'জন ক্যাণ্ডিডেট তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ মাইল দূর থেকে মটর ড্রাইভ করে রোজ সন্ধ্যেয় আমাদের বাড়ী আসছে···আর হ্যারি ভারি তো ছ'শো টাকা মাইনের মার্কেন্টাইল ফার্মের একাউটেণ্ট—আমাকে কিনা বিয়ে করবার সাধ তার—সেন্টিমেণ্টাল না তো কী বলব ওকে বলুন—

বেশ আগ্রহ হচ্ছিল গল্প শুনতে। মিসেস স্বামীনাথনের গল্প বলবার সময়ে ঠোঁটের যে অপূর্ব্ব ভঙ্গী হচ্ছিল তাতে সেন্টিমেণ্টাল হ্যারি কেন, যে-কোনও পুরুষের আত্মহত্যার ইচ্ছে হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

বললাম—তারপর—

খিল খিল করে হেসে উঠলো বাঙালী মেয়ে মিসেস স্বামীনাথন। বললে—তারপর তো দেখছেনই এখন মিসেস স্বামীনাথন হয়েছি—কিন্তু হ্যারি ওমনি ছাড়েনি আমাকে—অমন নাছোড়বান্দা পুরুষ মানুষও আমি আর দুটো দেখিনি মেটাজী—এই দেখুন না—বলে হাতের কাটা আঙুলটা দেখালে উঁচু করে—

বললে—সারা শরীরে আমার খুঁত নেই কোথাও—অন্তত আমার এ্যাডমায়াররা তাই বলতো—কিন্তু সারা জীবনের জন্যে এই খুঁতটি আমার করে দিয়েছে হ্যারি—

গল্প আরো জমে উঠেছে। বললাম—কেন ?

হঠাৎ হাত ঘড়িটার দিকে চাইলে মিসেস স্বামীনাথন।

বললে—রাত ন'টা বাজতে চল্‌লো এখনও তো হ্যারি আসছে না—/

বললাম—আমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না মিসেস স্বামীনাথন—

—তা হোক—কতক্ষণ আর অপেক্ষা করা যায়, আসুন আমরা আরম্ভ করে দিই—হ্যারি নিশ্চয়ই কোন কাজে আটকে গেছে—

তারপর শুরু হলো ডিনার। অপূর্ব রান্না, অপূর্ব তার টেস্ট। জীবনে সেই ডিনারের কথা আর কোনদিন ভুলবো না। খেতে খেতে আমাদের গল্প চল্‌তে লাগলো। বললাম—তারপর বলুন—

মিসেস স্বামীনাথন বললে—সেই দিনের ঘটনাটা বলি—মজুমদার আসবার কথা আছে, আসবার কথা আছে দীপেন, কুমার আর অলকের—কিন্তু বলা নেই কওয়া নেই হ্যারি তুপুর বেলা বাড়ীতে এসে হাজির ওর মটর বাইক নিয়ে—অফিস থেকে পালিয়ে এসেছে হ্যারি—

—যেতে হবে শিকারে। ঠিক ছিল ফিরে আসবো সন্ধ্যের আগে। কিন্তু হলোনা। নোয়ামুণ্ডির জঙ্গলে গোটাকতক তিতির মেরে ফিরে আসছি—হ্যারি বললে বড়বিল সাইডিং-এর ধারে একটু বিশ্রাম নিতে, বিশ্রাম আর নেব কী বলুন, নোয়ামুণ্ডি থেকে চাইবাসায় আসতে ইঞ্জিন চালাতেও হবে না—এমন ঢালু রাস্তা, শুধু চেপে বসলেই হলো এমন গড়ানে, তবু হ্যারি নাছোড়বান্দা, বললে—একটু বিশ্রাম করতেই হবে—সেইখানে বসেই হ্যারি কাণ্ডটা বাধালে—

বললাম—কোন্ কাণ্ড ?

মিসেস স্বামীনাথন আমার প্লেটের দিকে তাকিয়ে বললে—আপনি আর একটু দো-পেঁয়াজী নিন্ মেটাজী—আপনার হয়ত লজ্জা হচ্ছে—

খানিকপরে মিসেস স্বামীনাথন আবার বলতে শুরু করলে—সেইখানে বসে আমরা চা-পান শেষ করলাম, তারপর বোধহয় একটা ক্লান্তি এল

হ্যারির শরীরে—ও শুয়ে পড়লো আমার কোলে মাথা রেখে। তাতেও দোষ ছিল না, কারণ কোলটা আমার হলেও কেউ না কেউ শোবার জন্যেই তো হয়েছে ওটা—সুতরাং আমি আপত্তি করিনি—কিন্তু বিপদ ঘটলো তারপর। হ্যারি বললে—আমি যদি হ্যারিকে বিয়ে না করি তো ও আত্মহত্যা করবে। তা কি করে হয় বলুন, আমরা হলুম হিন্দু বাঙালী আর ও হলো মাদ্রাজী ক্রিশ্চিয়ান। আর তা' ছাড়া মজুমদারকে প্রায় একরকম কথা দেওয়াই হয়ে গেছে—কিন্তু হ্যারি বললে আমার কোলে শুয়েই সে আত্মহত্যা করবে, আমাকে না পেলে ওর নাকি মরাই ভালো। তা ভালো তো ভালোই, কি বলুন, কিন্তু আমার সামনে আর আমার কোলে শুয়েই বা আত্মহত্যা করা কেন—আড়ালে করলেই তো চুকে যায় ঝঞ্ঝাট···আপনাকে আর দু'স্লাইস রুটি দেব মেটাজী—

খানিক থেমে মিসেস স্বামীনাথন আবার আরম্ভ করলে—আমি বিরক্ত হয়ে কোল থেকে হ্যারির মাথাটা দিলাম সরিয়ে। ও-ও আপত্তি করলে না, কিন্তু উঠে দাঁড়িয়েই আমার বারো বোরের বন্দুকটায় এক মুহূর্তে একটা এল-জি পুরে নিয়ে নিজের বুক লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপলে—আর সঙ্গে সঙ্গে—আপনি আর একটু কারি নিন্ মেটাজী—কিছুই খেলেন না দেখছি···

বললাম—ওকথা থাক, আপনি বলুন তারপর কী হলো—

মিসেস স্বামীনাথন বললে—দশটা বাজতে চললো এখনও দেখছি হ্যারি আসছে না—নিশ্চয়ই কোন কাজে আটকে পড়েছে—কী বলেন—

বললাম—তারপর বলুন—

—তারপর আর কি—এই তো আমার মাঝখানের আঙুলটা দেখছেন, আধখানা উড়ে গেছে, এ ওই হ্যারিকে কেবল বাঁচাবার জন্যে—আমিও তাড়াতাড়ি বন্দুকটা ধরে বাধা দিতে গেছি, কিন্তু দেরী হয়ে গেল একটু—হ্যারি বাঁচলো একটুর জন্যে কিন্তু আমার আঙুলটা···বাইরে যেন সাইকেল রিকশর ঘণ্টা বাজলো, না মেটাজী—

মিসেস স্বামীনাথন টেবিল ছেড়ে উঠলো। বললে—এক্সকিউজ মি—এতক্ষণে বোধহয় হ্যারি এল—

সত্যিই হ্যারি সাইকেল রিকশয় এল। কিন্তু সেই সময়, ঠিক আমাদের গল্পের চৌমাথায় পৌছুবার আগেই হ্যারি না এলেই যেন ভালো করতো। পরে অনেকবার ভেবেছি, সেদিন আমার সামনে অমন অবস্থায় মিসেস স্বামীনাথনের স্বামী কেন এলো। কেন এল না আরো অনেক পরে যখন খাওয়া-দাওয়া সেরে আমি আমার ঘরে চলে আসতুম। তাহলে মিসেস স্বামীনাথনও অমন ভাবে ধরা পড়তো না।

সেই রাত্রে মিসেস স্বামীনাথনের যে-ব্যবহার দেখেছিলাম তা জীবনে ভুলবো না। আর সে ব্যবহার কিনা করল আমারই উপস্থিতিতে।

রিকশর ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে মিসেস স্বামীনাথন মাতাল হ্যারিকে পেছন থেকে ধরে নিয়ে এল ঘরের মধ্যে। হ্যারি তখন বেশ টলছে। দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই ভালো করে।

আমাকে চিনতে পেরে হ্যারি বললে—হ্যাল্লো বয়—

তারপর কী একটা বেয়াদবি করতেই মিসেস স্বামীনাথন এক কাণ্ড করে বসলো। দেখলাম মিসেস স্বামীনাথনের শরীরে আবার সেই কর্কশ-কাঠিন্য ফুটে উঠেছে। চীৎকার করে উঠল—স্কাউণ্ড্রেল—

তারপর হ্যারির চুলের মুঠি ধরে সে কী ঝাঁকুনি। অচৈতন্য হ্যারির চেতনা ফিরিয়ে আনবার অনেক চেষ্টা হলো। শেষে আমার দিকে একবার কাতর চাউনি দিয়ে হ্যারিকে বেডরুমে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে—

পাশের ঘরে যেতে যেতে হ্যারি আমার দিকে ফিরে বললে—চিয়ারিউ বয়—চিয়ারিউ—

তখনও বাকি ছিল পুডিং আর কফি। আমার ডিনার শেষ হলো না। মিসেস স্বামীনাথনকে সেই অপ্রস্তুত অবস্থা থেকে বাঁচাবার জন্যই আমি

নিঃশব্দে ওপরে আমার ঘরে চলে এলাম। মনে হলো—মিসেস স্বামীনাথনের অপমান যে-ই করুক—তা' দাঁড়িয়ে দেখাও যেন অপরাধ।

টি-আই বুড়ো এণ্টনী বললে—সো ভেরি ইণ্টারেস্টিং—তারপর মিস্টার মেটা—

মুদেলিয়ার বললেন—ড্রান্‌কার্ডস্‌ আর অলওয়েজ স্কাউণ্ড্রেলস্‌—ঠিকই হয়েছে—

সোনপার সাহেব বললেন—বাজে কথা, আমি তো বরাবরই ড্রিঙ্ক করি, তবে মডাবেট ডোজে—কিন্তু আমার ফার্স্ট ওয়াইফ কখনও আপত্তি করেনি—বরং—

মুদেলিয়ার বললেন—তা' তো করবেই না—আমি শুনেছি বেঙ্গলী গার্লরা কলকাতার হোটেলে পাবলিকলি স্মোক আর ড্রিঙ্ক করে—

সোনপার সাহেব বললেন—আই টেক সিরিয়স অবজেকসন টু ইট।

টি-আই এণ্টনী বললে—চুপ করুন আপনারা—তারপর বলুন মিস্টার মেটা—

গুরুবচন মেটা আবার বলতে শুরু করলেন। বিলাসপুর রেলওয়ে কলোনী এখন নিস্তব্ধ। রাস্তার আলোগুলো চুপচাপ প্রহরীর মত ঠায় দাঁড়িয়ে। শুধু বিলাসপুরের ইয়ার্ডে সান্টিং-এর শব্দ মাঝে মাঝে আকাশকে চমকে দেয়। আর এই ইনস্টিটিউটের ভেতরে বিলিয়ার্ড খেলা এখন বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু দিল্লী রেডিওতে এখন দরবারী কানাড়ায় খেয়াল ধরেছে কোন ওস্তাদজী।

মেটাজী বললেন—তার কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে গেল মিস্টার স্বামীনাথনের সঙ্গে বাড়ীর বাইরে। আমি ট্রেন থেকে নেবে 'কিংস-ওয়ে'তে খেতে গেছি—রাত্রের খাওয়াটা ওখানেই সেরে নেওয়ার মতলব—কারণ ট্রেন লেট ছিল, আর এত দেরীতে আবার দীনদয়াল কেন কষ্ট করবে

এই ভেবে। হঠাৎ দেখি, হ্যারি স্বামীনাথন দূরে একটা টেবিলে বসে আছে। সঙ্গে আর একটি মেয়ে—বাঙালী নয়, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান্—

আমাকে দেখতে পেয়েই হ্যারি নিজের বোতল আর গ্লাসটা হাতে নিয়ে উঠে এল। এসে আমার সামনের চেয়ারেই মুখোমুখি বসল। বললে—গুড্ ইভনিং বয়—

দেখলাম, নেশা বেশ হয়েছে। এবং ক্রমে আরো হবার আশা আছে—

আমার খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। বললাম—আমি উঠি—

—সে কি, একটু খাবেন না—

আমার আপত্তিতে হ্যারি আর বেশী পীড়াপীড়ি করলে না। বললে—ভালো কথা, একটা কথা আপনাকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করবো ভাবি—

—কী কথা—

—এই যে রাত্রে বাড়ীতে ফিরে সুজাতার সঙ্গে আমি প্রায়ই ঝগড়া করি, আপনি টের পান? কী যে ওর স্বভাব মশাই। সকলে সব জিনিসে রস পায় না, তা না পাক্, ধরুন আমার মদ খেতে ভালো লাগে, সুজাতার ভালো লাগে না। তোমার ভালো লাগে না তুমি খেও না, কিন্তু আমি যদি খাই তুমি বাধা দেবার কে—ঠিক কিনা বলুন—এখন এই নিয়ে রাত্রে মশাই রোজ আমাদের ঝগড়া হয়—

বললাম—এবার তা' হলে উঠি—

—কিন্তু আপনি বললেন না তো—

—কি কথা?

—ওই আপনি টের পান কি না—

—কেন বলুন তো, আমি টের পেলেই বা—

—সেই কথাটা সুজাতাকে একবার বোঝান্ দিকি, আমিও যত বলি মেটাজী টের পেলেই বা, সুজাতা বলে—তুমি শেমলেস্ হতে পারো কিন্তু

আমার লজ্জা করে। অর্থাৎ আমি যে মদ খাই এটা যেন দোষের নয়, দোষটা হলো আপনার টের পাওয়াতে—

বললাম—মিসেস স্বামীনাথন যখন চান্ না—তখন আপনি ওটা খান্ কেন?

—আপনি বুদ্ধিমান হয়ে এই কথা বলছেন—হ্যারি বোতল হাতে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর বললে—আপনি আমাদের হিস্ট্রি কিছু জানেন না, আমি ছ'শো টাকার চাকরি ছেড়েছি স্নজাতার জন্যে, জানেন—নইলে আজ আমি মটর গাড়ির পেটি সেল্স্ম্যান—তিনবার আমি স্নইসাইড করতে গেছি—তিনবার স্নজাতা আমাকে বাঁচিয়েছে—স্নজাতা কি আমায় কম ভালোবাসে ভেবেছেন! ওর সব ভালো, অমন সতী স্ত্রী পাওয়া কি কম সৌভাগ্যের কথা? এক রাত্তির আমি পাশে না শুলে ওর ঘুম আসে না—আমি যেমন ওর জন্যে আমার চাকরি, আমার সব ত্যাগ করেছি, ও-ও আমার জন্যে ওর বাবার প্রচুর সম্পত্তি স্যাক্রিফাইস্ করেছে—শেষে মজুমদারকে এড়াবার জন্যে আমার সঙ্গে পালিয়ে এসেছে—অমন একনিষ্ঠ ভালবাসার তুলনা হয় না মেটাজী—কিন্তু ওর ওই এক দোষ—আমার মদ খাওয়া মোটে পছন্দ করে না—কিন্তু ন্যান্সিকে দেখুন—ওই যে বসে আছে—

দূরের টেব্লে বসা এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েটিকে দেখালে হ্যারি।

বললে—ওই ন্যান্সিকে দেখুন—ওকে আমি যত খাওয়াবো তত খাবে—একবারো না বলবে না—ও এক পিপে মদ খাওয়ালে খেতে পারে—স্নজাতাকে কত বলেছি খেতে—কিছুতেই খাবে না, মাতাল দেখলে একশো হাত দূরে পালিয়ে যাবে—ওদের আর সব ভালো মশাই, বাঙালী মেয়েরা ওই এক ব্যাপারে ভারি কন্জারভেটিব্—

সেদিন অনেক কষ্টে মাতালের হাত ছাড়িয়ে বাড়ী আসতে পেরেছিলাম। দেখেছিলাম, আমি চলে আসতেই হ্যারি আবার ন্যান্সীর টেব্লে গিয়ে বস্লো।

কিন্তু বাড়ী এসে একটু সকাল সকাল শোবার ব্যবস্থা করছি। রাত তখন প্রায় এগারোটা হবে। হাওবাগের এ-দিকটা সন্ধ্যে থেকেই অবশ্য নিরিবিলি হয়ে যায়। তারপরে ক্লান্তও ছিলাম খুব। দীনদয়াল এসে খবর দিলে—একতলার মেমসাহেব সেলাম দিয়েছে—

অত রাত্রেই গেলাম নীচেয়। মিসেস স্বামীনাথন একলা আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। বললে—এবার আপনি অনেকদিন বাইরে ছিলেন মেটাজী—

বললাম—আমার ব্যব্সায় শুধু ওই ঘোরাই সার—লাভ বিশেষ কিছু নেই—কিন্তু মিস্টার স্বামীনাথন কোথায় ?

মিসেস স্বামীনাথনকে বেশ চিন্তিত দেখলাম। বললে—সেই জন্যেই তো আপনাকে ডেকেছি মেটাজী—

বললাম—হয়ত কোনও কাজে আটকে গেছেন—

—না, কিন্তু ক'দিন থেকেই বেশী রাত্রে ফিরছে হ্যারি—দিন দিন ওর যেন অত্যাচারটা বাড়ছে—দেখুন না, এখন এগারোটা বাজলো, এখনও এল না—আপনার সাইকেলটা একবার দিতে পারেন মেটাজী—আমারটা পাঙচার' হয়ে পড়ে আছে কাল থেকে—

—কিন্তু এত রাত্রে সাইকেল কী করবেন—জিজ্ঞেস করলাম আমি।

—আমি হ্যারিকে খুঁজতে যাবো—

—এত বড় শহরে কোথায় খুঁজবেন তাঁকে ?

—জব্বলপুরে যত মদের দোকান আছে—সব জায়গায় খুঁজবো—আজ একটা গাড়ি বিক্রী করবার কথা ছিল ওর—পাঁচ হাজার টাকার 'কার'—আজ কয়েক শো টাকা ওর হাতে আসবার কথা, সেই সকাল বেলা বেরিয়েছে, নাওয়া নেই খাওয়া নেই, তারপর এই এত রাত হলো···আপনি সাইকেলটা আনিয়ে দিন আমি ততক্ষণে কাপড়টা বদলে নিই—

বলে মিসেস স্বামীনাথন ভেতরে চলে গেল সেই মুহূর্তে। আমি দীন-দয়ালকে ডেকে সাইকেলটায় বাতি জ্বালিয়ে দিলাম। খানিক পরেই মিসেস

স্বামীনাথন বেরিয়ে এল অপূর্ব পোষাক পরে। সেই রাত সাড়ে এগারোটায় মিসেস স্বামীনাথনের যে অপরূপ রূপ দেখেছিলাম তা' জীবনে ভুলবো না। সালোয়ার আর সেরোয়ানী পরা পাঞ্জাবী মেয়ে হাজার হাজার দেখেছি। কিন্তু বাঙালী মেয়ে মিসেস স্বামীনাথনের সেই পোষাকে আমার ব্যাচিলর মনে সেই রাত্রে যে-মোহ বিস্তার করেছিল তা' অসহ্য। অত রাত্রে ওই জ্বালাধরা পোষাক পরে মাতাল স্বামীকে মদের দোকানে দোকানে ঘুরে খুঁজে বেড়ানো বড় রোমান্টিক মনে হয়েছিল আমার সেই তরুণ বয়েসে।

মিসেস স্বামীনাথন সাইকেলটা আমার হাত থেকে নিয়ে বললে—জেণ্টস্ সাইকেল বলেই এই পোষাকটা পরলাম—এতে অন্য কোনও উদ্দেশ্য কিন্তু নেই আমার মেটাজী—

আমি একবার বললাম—এত রাত্রে আর নাই বা বেরুলেন মিসেস স্বামীনাথন—

—ভয়? ভয়ের কথা বলছেন?

মিসেস স্বামীনাথন হেসে উঠলো। বললে—এর চেয়েও এ্যাড্‌ভেঞ্চারাস কত কাজ আমায় জীবনে করতে হয়েছে···আর তা ছাড়া আপনি মেয়েমানুষ হলে বুঝতেন মেটাজী—হাসব্যাণ্ড যদি মনের মত না হয় তা'র চেয়ে বড় অশান্তি মেয়েদের জীবনে আর কিছু নেই—

তারপর সাইকেলের প্যাডেলে একটা পা রেখে বললে—এ ছাড়াও আপনার তিন মাসের বাড়ীভাড়া বাকি পড়ে আছে, টাকার অভাবেই দিতে পারা যায়নি—কথা ছিল এই টাকাটা পেয়ে ওটা মিটিয়ে দেব—কিন্তু আজ যদি সবটাই উড়িয়ে দেয়, কী সর্বনাশ হবে বলুন্ তো মেটাজী—হয়ত আমি গিয়ে পড়লে কিছু টাকা অন্তত বাঁচলেও বাঁচতে পারে—

সাইকেলে উঠতে যাচ্ছিল মিসেস স্বামীনাথন।

আমি বললাম—কিন্তু এমনও তো হতে পারে, হ্যারি হয়ত মদের দোকানে নেই—অন্য কোথাও···

'কিংস্‌ওয়ে' হোটেলে হ্যারি স্বামীনাথনকে যে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে ন্যান্‌সীর সঙ্গে মদ খেতে দেখেছি সে-কথাটা বলতে গিয়েও বলতে পারলাম না আমি।

কিন্তু প্রখর-বুদ্ধি মিসেস স্বামীনাথন আমার কথার তাৎপর্য ধরে ফেলেছে এক নিমেষে। কথাটা শুনে যেন হঠাৎ তার মুখ দিয়ে কোনও উত্তর বেরুল না। যেন নিজেকে তার পরাজিত মনে হলো, কিন্তু তা' মুহূর্তের জন্যে। বললে—আপনি যা' ভাবছেন তা' হতে পারে না মেটাজী—হতে পারে না, কখনও হতে পারে না—ওই হ্যারি তিনবার স্থইসাইড্ করতে গিয়েছিল আমার জন্যে, ও জানে আমি ওর জন্যে কী-ই না স্যাক্রিফাইস্ করেছি···হ্যারি অমন আনফেথফুল হতে পারে না—এখনও যে রাত্রে আমি পাশে না শুলে ওর ঘুম আসে না···কিন্তু···

কথাটা বলে কিন্তু তখনও খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল মিসেস স্বামীনাথন। মনে হলো যেন হঠাৎ এক বিদ্যুৎ-ঘোষিত মৌসুমী ঝড় তার মনের আকাশে বইতে শুরু করেছে, তারপর কেউটে সাপের মত ফণাটা হঠাৎ বিস্তার করে বললে—আপনি ঠিক বলেছেন······সত্যিই তো কিছুই অসম্ভব নয়—সাইকেলটা একবার ধরুন তো মেটাজী—

মিসেস স্বামীনাথন হঠাৎ নিজের ঘর থেকে বারো বোরের বন্দুকটা বার করে নিয়ে এল। আমি তখন বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেছি। বন্দুকটা কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছে মিসেস স্বামীনাথন শরীরের বাঁ দিকে।

সেই অবস্থায় সাইকেলটা আমার হাত থেকে নিয়ে বললে—আমাকে একটা এল-জি ধার দিতে পারেন মেটাজী—

—কেন এল-জি কী করবেন।

—আগে দিন, তারপরে বলবো—একটু শীগ্‌গীর করুন মেটাজী—

দীনদয়ালকে বলে আমার বাক্স থেকে একটা এল-জি কার্ট্রিজ আনিয়ে দিলাম মিসেস স্বামীনাথনের হাতে।

এবার বলুন এল-জি কি করবেন ?—আবার জিজ্ঞেস করলাম আমি।

মিসেস স্বামীনাথন বললে—হ্যারির জন্যে আমারও সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি, কিন্তু গড্ ফরবিড্, আপনার কথা যদি সত্যিই হয় মেটাজী তখন আমি কী করবো ! হ্যারিকে গুলী করা ছাড়া আমার কী উপায় আছে বলুন—ওর মদ খাওয়া আমি তবু টলারেট করেছি কিন্তু মেয়েমানুষ জড়িত থাকলে আমি ওকে ক্ষমা করবো কী করে মেটাজী—ওকে আমি খুন করবো এই আপনাকে বলে রাখছি—ওর সঙ্গে যদি মেয়েমানুষ থাকে তো ওকে আমি খুন করবো—হাতিয়ার সঙ্গে রাখলুম—যাতে দেরী না হয়—

তারপর একটা কথাও না বলে সাইকেলে উঠে মিসেস স্বামীনাথন অন্ধকারে অন্তর্হিত হলো।

বুড়ো টি-আই এণ্টনী বললে—স্প্লেনডিড্ মিস্টার মেটা—স্প্লেনডিড্—তারপর—

মুদেলিয়ার স্টেশন মাস্টার বললেন—আমার ছোট ছেলের পড়ার বইতে পড়ছিলাম ট্রুথ ইজ্ স্ট্রেঞ্জর দ্যান ফিকসন—কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয় তা'হলে—

সোনপার সাহেব বললেন—জীবন সম্বন্ধে আর কতটুকু অভিজ্ঞতা আপনার মুদেলিয়ার গারু, চোদ্দ বছর বয়েসে রেলে ঢুকেছেন, খেয়েছেন চারুপানি আর ঘষতে ঘষতে আজ বিলাসপুরের স্টেশন মাস্টার—ভাবছেন চরম স্যালভেশন পেয়ে গেছেন—কিন্তু জীবনের জানলেন কী—একটু মদও খেলেন না—একদিন অফিস কামাইও করলেন না, কখনও বেনিয়মও করলেন না জীবনে—

গুরুবচন মেটা বললেন—অন্য কথা থাক, গল্পটা শেষ করেনি'—রাত অনেক হয়ে গেল।…

ইন্স্টিটিউটের সমস্ত ঘর অন্ধকার। পেণ্ড্রা রোডের দিক থেকে একটা মালগাড়ি ক্লান্ত গতিতে আসছে। দূরে লোকো-শেডের দেয়ালে ইঞ্জিন-গর্জনের প্রতিধ্বনি বার বার রেল-কলোনীর নিস্তব্ধতা ভেঙে দেয়। প্লাট-ফরমের চায়ের দোকানটি পর্যন্ত এখন বন্ধ হয়ে গেছে। জুন মাসের মাঝামাঝি হয়ে গেল কিন্তু মনসুন এখনও সুরু হলো না।

—তারপর সেই রাত্রে ওপরে নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে অনেকবার ভেবেছি। ভেবেছি—'কিংস্‌ওয়ে' হয়ত এতক্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে। হ্যারি সেখানে নেই। হয়ত ন্যান্‌সীর সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। কিন্তু বাঙালী মেয়ে মিসেস স্বামীনাথনের একী ভয়াবহ কাণ্ড। সারাদিন হ্যারির নাওয়া খাওয়া নেই তাই মিসেস স্বামীনাথনও উপোষ করেছে সারাদিন। তারপরে এই ক্লান্ত উত্তেজিত অবস্থায় এত রাত্রে বারো বোরের বন্দুক আর ধার করা এল-জি কার্ট্রিজ নিয়ে পরের সাইকেল চড়ে স্বামীর খোঁজে মদের দোকান দেখতে যাওয়া—এ-নিয়ে যদি কেউ গল্প লেখে তো মনে হবে গাঁজাখুরি, কিন্তু নিজের চোখেই তো দেখলাম। আমার মনে হলো—আর কোনও দেশের মেয়েরা এমন করে এমন অবস্থায় বেরুতে পারতো না এক বাঙালী মেয়েরা ছাড়া। আর আমার নিজের জাত শিয়ালকোট গুজরানওয়ালার মেয়েদের কথা জানি—তারা ওই দূর থেকেই যা'—

সে যা'হোক্—সে রাত্রে অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়ে শুয়েই জেগে থাকবার চেষ্টা করেছিলাম—ওদের ফেরার খবর পাব বলে। হ্যারি রাত্রে ফিরবেই এমন ধারণা আমার ছিলই। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে ন্যান্‌সী সঙ্গে থাকলেই শুধু বিপদ ঘটবে তাও জানতাম। আর এ-ও জানতাম হ্যারিকে খুন করতে পেছপাও হবার মত মেয়ে মিসেস স্বামীনাথন নয়। কারণ হ্যারিকে মিসেস স্বামীনাথন যেমন গভীর করে ভালবাসে তেমন করে ক'জন মেয়েমানুষ তা'দের স্বামীকে ভালবাসতে পারে?

কিন্তু কোথা দিয়ে কখন সে-রাত্রে চোখে ঘুম নেমে এল টের

'পাইনি। পরের দিনও আবার সকাল হবার আগেই জব্বলপুর ছেড়ে ভোরের ট্রেন ধরে ভুসাওয়াল যেতে হলো।

কয়েকদিন পরে যখন ফিরে এলাম 'শিয়ালকোট-লজ'-এ, তখন সে-প্রসঙ্গ বাসি হয়ে গেছে। সুজাতা স্বামীনাথনকে দেখি সাইকেল চড়ে বেতের বাস্কেটে করে বাজার করে আসে। তারপর হ্যারি স্যুট টাই পরে সাইকেল রিকশ'য় চড়ে কোথায় বেরিয়ে যায়। আবার ফেরে অনেক রাত্রে। একটা টিম্ টিম্ আলো জ্বালিয়ে সাইকেল রিকশ'য় চড়ে।

সেদিন সেই রাত্রে তবে কি হ্যারিকে 'কিংসওয়ে'তেই পাওয়া গিয়েছিল? ত্যান্সী কি ছিল না সঙ্গে? আমার ব্যাচিলর মনে এ-সব প্রশ্ন মাঝে মাঝে আলোড়ন করতো।

সেদিন সুজাতা স্বামীনাথন সোজা চলে এল ওপরে আমার এলাকায়।

বললে—একটা কথা আপনাকে বলতে এসেছিলাম—মেটাজী—

বললাম—বসুন, আমারও অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে—আপনার কথাটাই আগে বলুন—

সুজাতা বললে—তাই বলি, আপনার সেই এল-জি কার্ট্রিজটা আমার কাছেই রয়েছে—কাজে লাগেনি—ওটা এখনও কিছুদিন থাক আমার কাছে—দরকার না হলে ফিরিয়ে দেব আপনাকে—আপত্তি নেই তো—

বললাম—এবার আমার কথাটা বলি—সেদিন রাত্রে আপনাকে বন্দুক হাতে একলা ছেড়ে দিয়েছিলাম—পরে মনে হলো সঙ্গে গেলে হতো—ঝোঁকের মাথায় কী হয়ত করে বসবেন—দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে আমার এখনও ভালোজ্ঞা ন হলো না মিসেস স্বামীনাথন—

সুজাতা বললে—দেখুন, হ্যারিকে যদি আমি কোনওদিন খুন করি তো সে একা আমার দায়িত্বে—এ ব্যাপার সম্পূর্ণ আমার আর হ্যারির, এতে কোনও থার্ড পারসন নেই—

বললাম—আপনি কি সত্যই ও-বিষয়ে সিরিয়স—

—নিশ্চয়ই। আপনি জানেন না মেটাজী, আমি অন্য বাঙালী মেয়ের মত মানুষ হইনি—আমার শিক্ষা দীক্ষা সব আলাদা—সেদিন রাত্রে হ্যারির খোঁজে বেরিয়েছিলাম আপনার সাইকেল আর এল-জি নিয়ে, ভাববেন না ঠাট্টা করতে বা ভয় দেখাতে—আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি হ্যারি কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না—ওই মদের ওপরেই যা' দুর্বলতা আছে ওর—আর কোনও কিছুতে নেই মেটাজী—হ্যারি মিছে কথা বলবার লোক নয়—কিন্তু যদি······

বললাম—সেদিন শেষ পর্যন্ত কোথায় দেখা পেলেন ওর—

সুজাতা স্বামীনাথন বললে—ও বাড়ীর দিকেই আসছিল—সারাদিন সেই মটর বিক্রি নিয়ে এমন পরিশ্রম গিয়েছিল যে বাড়ীতে এসে খাবার সময় পর্যন্ত পায়নি—তবে স্বীকার করলে ও যে মদ খেয়েছিল—এই নিন চার মাসের বাকি ভাড়া—একটা রসিদ সময় মত পাঠিয়ে দেবেন—

কী জানি কেন তখনও সেই এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে ন্যান্‌সির কথাটা মুখ ফুটে বলতে পারলাম না।

কিন্তু যাবার সময় সুজাতা বললে—কিন্তু এ-ও বলে রাখছি মেটাজী যদি কোনদিন আমি চাক্ষুষ প্রমাণ পাই, সেদিন আমি হ্যারিকে······আমার ওই বারো বোরের বন্দুকে এল-জি লোড্‌ করে রেখেছি—ওকে আমি খুন করবোই—আপনিই সেদিন আমার প্রথম চোখ খুলিয়ে দিয়েছেন—

বললাম—না না মাফ করবেন সুজাতা বাঈ, আমি কিছুই জানি না, আমি কিছুই দেখিনি—

সুজাতা স্বামীনাথন বললে—না, শুধু আপনি নন, আরো অনেকের কাছে আমি শুনেছি যে, হ্যারিকে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েদের সঙ্গে নানা জায়গায় দেখা যায়, কিন্তু আমি নিজে যদি কোনও দিন চোখে দেখতে পাই তো খুন করবো ওকে। আমি আমার বাবা মা ভাই বোন আর বাবার প্রচুর সম্পত্তি

পায়ে ঠেলে শুধু ওর টানে চলে এসেছি। শেষকালে সেই হ্যারি যদি আনফেথফুল হয়, তাহলে সে আপনি ব্যাচিলার মানুষ ঠিক বুঝবেন না……

গুরুবচন মেটা আবার আরম্ভ করলেন—ঈশ্বরের কী ইচ্ছে ছিল কে জানে। ঠিক তার পরদিনই সেই কাণ্ডটা ঘটলো। সেদিনও এমনি জুন মাস, মনসুন আরম্ভ হয়নি। চুপচাপ ওপরের পশ্চিমমুখো বারান্দায় বসে আছি। কোন কাজ নেই হাতে। সামনের বাগান পেরিয়ে বি-এন-আর-এর আমবাগানের দিকে চেয়েছিলাম। আস্তে আস্তে সন্ধ্যে হয়ে এল। দীনদয়াল এক গ্লাশ ঠাণ্ডা মাঠা দিয়ে গেছে। তাও খাওয়া শেষ করে খালি গেলাসটা পাশের চেয়ারের ওপর রেখে দিলাম। সানি ভিলার দিকে হাওবাগ স্টেশনে বুঝি কোন মালগাড়ি এল। ওদিকের আকাশটা ইঞ্জিনের ধোঁয়ায় কালো হয়ে আসছে। আমার সামনের বাগানের দিকে চেয়ে দেখলাম, সুজাতা স্বামীনাথন সাইকেল চড়ে চৌক থেকে ফিরলো মার্কেটিং করে। ওপর দিকে চাইতেই দু'জনেই উইশ্ করলাম। তারপর আধ ঘণ্টাও কাটেনি হঠাৎ দেখি একটা সাইকেল রিকশ' আসছে আমারই 'শেয়ালকোট লজ' লক্ষ্য করে। দূরে থাকতে দেখতে পাওয়া যায়নি। গেটের মধ্যে সাইকেল রিকশ'টা ঢুকতেই নজরে পড়লো হ্যারি একলা নয়। প্রচুর মদ খাওয়ার জন্যে নিজে একেবারে অর্ধ-বেহুঁষ, আর সঙ্গে সেই ফ্যান্সী, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে। সে-ও প্রকৃতিস্থ বলে মনে হলো না।……

নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস হলো না। এখানে ফ্যান্সীকে নিয়ে এল কেন? তবে হয়ত ওর খেয়াল নেই। দু'জনে কিংসওয়ে থেকে বেরিয়ে কোথায় যেতে কোথায় চলে এসেছে। কিংবা হয়ত পুরোন রিকশওয়ালা। রোজকার অভ্যাসমত বাড়ীতে নিয়ে চলে এসেছে। ওরা দু'জনেই জানে না, কোথায় কোন্ বাড়ীতে এসে ওদের নামিয়েছে রিকশওয়ালা—

উত্তেজনায় সমস্ত নার্ভ আমার শিথিল হয়ে এল। এখনি যে বিপদ ঘটবে, তা ওরা কেউ জানে না। অথচ কালকেও আমার কাছে সুজাতা স্বামীনাথন যে প্রতিজ্ঞা করে গেছে, ও-মেয়ে তো সেকথা ভোলবার নয়।

মাথা থেকে পা পর্যন্ত আমার থর থর করে কাঁপতে লাগলো। মনে হলো, এখনি একতলায় একটা প্রচণ্ড শব্দ হবে আর তারপর দুটো না হোক, একটা লাইফ সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে। ঠিক 'এইম্' করে মারতে পারলে একটা টাইগারের লাইফের পক্ষেও একটা এল-জি যথেষ্ট।

কথাটা মনে পড়তেই আরো আতঙ্ক হলো আমার। ওটা তো আমার এল-জি। যদি প্রমাণ হয়, আমিই সুজাতাকে ও এল-জিটা দিয়েছি, তাহলে মার্ডার চার্জে তো আমিও পড়বো। হ্যারির বডি থেকে যদি এল-জিটা বেরোয়। তারপর সুজাতা স্বামীনাথনের সঙ্গে ব্যাচিলর বাড়ীওয়ালা গুরুবচন মেটার একটি কল্পিত সম্পর্ক খাড়া করে দিয়ে হ্যারি স্বামীনাথনকে খুনের অপরাধে···

আর ভাবতে পারলাম না।

কান পেতে রইলাম উদ্‌গ্রীব হয়ে। নীচেয় ওদের তুমুল ঝগড়া চলেছে। মাঝে মাঝে সুজাতার গলা। তারপর হ্যারির। হ্যারি মদ খেলেও মনে হলো যেন সেন্স ঠিক আছে তার। এইবার বুঝি সুজাতা স্বামীনাথনের বারো বোরের বন্দুকটা প্রচণ্ড শব্দে ফেটে উঠবে···গুরুবচন মেটা থামলেন।

আজাইব্ সিং বললেন—থামলেন কেন মেটাজী—

বুড়ো টি-আই এণ্টনী বললে—শেষ হয়ে গেল নাকি—

সোনপার সাহেব বললেন—বন্দুকের শব্দটা শেষ পর্যন্ত হলো কি না বলুন মেটাজী, আর দেরী করবেন না—

মুদেলিয়ার বললেন—সুজাতা কি দু'জনকেই মারলো, না একজনকে মারলো—

সোনপার সাহেব বললেন—আপনার যেমন চারুপানি খাওয়া বুদ্ধি মুদেলিয়ার গারু, এল-জী তো একটা শুনে আসছেন। দু'জনকে মারবে কী করে—

মুদেলিয়ার বললেন—তবে কি নিজেই আত্মহত্যা করলো নাকি সুজাতা। বড় সমস্যায় ফেলেছেন—উঃ—

গুরুবচন মেটা মিটি মিটি হাসতে লাগলেন। আপনারা এ-কাহিনীর যত কিছু পরিণতি ভাবতে পারেন ভাবুন, কিন্তু আমার ধার কাছ দিয়েও ঘেঁষতে পারবেন না, এই আমি বলে দিলাম।

টি-আই বুড়ো এণ্টনী সামনে মুখ এগিয়ে নিয়ে এসে বললে—আর বাজে কথা বলবেন না স্যার, শেষটা বলে দিন দয়া করে—

গুরুবচন মেটা বললেন—আপনাদের আমি গোড়াতেই বলেছি যে, গল্পটা যেখানে আমি শেষ করবো, তারপরে আমাকে আর কেউ কোনও প্রশ্ন করতে পারবেন না। আপনারা জানেন বোধ হয় যে, গল্প যেখানে শেষ হয়, জীবন সেখানে শেষ হয় না। জীবন বিস্তীর্ণ ব্যাপক, কিন্তু গল্প জীবনকে ভিত্তি করে গড়ে উঠলেও এক জায়গায় তার ক্লাইম্যাক্স আছে। সেখানে এসে গল্পে দাঁড়ি টানতে হয়। আমার সেই সর্ততে আপনারা রাজী হয়েছিলেন, মনে আছে বোধ হয়···যা' হোক এখনই শেষ অধ্যায়টা বলি···

একটু থেমে মেটাজী বলতে লাগলেন—সেই রকম উদ্‌গ্রীব হয়ে বারান্দায় ছটফট্ করছি, কী হবে, কী হবে! ভাগ্যিস দীনদয়াল বাড়ী ছিল না, চৌকে গিয়েছিল ভইষের খড় কিনতে, নইলে সে-অবস্থায় আমাকে দেখলে হয়ত পাগল ভাবতো। তার আসতে প্রায় এক ঘণ্টা দেরী। হঠাৎ মনে হলো নীচেকার গোলমাল যেন থেমে এল।—পাশের সিঁড়িতে কার

পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে মুখ ফিরিয়ে যা দেখলাম, তাতে অবাক হয়ে গেছি! আর কেউ নয়। মিসেস স্বামীনাথন দৌড়ুতে দৌড়ুতে ওপরে উঠছে। মুখখানা লজ্জায় ঘৃণায় পরাজয়ের কলঙ্কে, অপমানে একেবারে থরোলী অন্যরকম দেখাচ্ছে, চোখ ফেটে জল বেরুবে এখনি—

সুজাতা স্বামীনাথন আমাকে কথা বলবার অবসর দিলে না পর্যন্ত। ছুটে এসে আমার একটা হাত ধরে এক হ্যাচ্‌কা টান দিয়ে বললে—দেখেছেন তো হ্যারির কাণ্ড—

তারপর আমাকে টানতে টানতে বললে—কাম্‌ অন্‌ মেটাজী, কাম্‌ অন্‌—

আমি হতবাক হয়ে সুজাতা স্বামীনাথন-এর পেছনে চলতে লাগলাম।

তারপর আমার শোবার ঘরে আমাকে ঢুকিয়ে দিয়ে বললে—মেটাজী, আই মাষ্ট বি আন্‌ফেথফুল, আই মাষ্ট বি আন্‌ফেথফুল, আমি এর প্রতিশোধ নেব—বলে এক মুহূর্তে ঘরের একমাত্র দরজাটা বন্ধ করে সজোরে খিল লাগিয়ে দিলে।

পুতুল দিদি

এতদিন পরে যে আবার পুতুল দিদির কথা মনে পড়লো, এ পুতুল দিদিব মেয়ের বিয়ে বলে নয়। কিম্বা তার মেয়ের বিয়েতে এত পুলিশ পাহারাব বন্দোবস্ত হয়েছে বলেও নয়। মনে পড়ার আরো একটি কারণ আছে।

কারণটা পরে বলবো।

পুতুল দিদিকে জানি খুব ছোটবেলা থেকে। ছোটবেলায় পুতুল দিদির ওপর ভার পড়তো আমার তদারকের।

বাবার চাকরিতে খুব ঘন ঘন বদলি হোত তখন। আজ মিরাট, কাল দিল্লী, পরশু জব্বলপুর, আবার তারপর দিনই হয়ত কলকাতা। বদলি হবার মুখে বাবা আমাদের সবাইকে মামার বাড়িতে রেখে একলা চলে যেতেন। তারপর বাড়ি বা কোয়ার্টার ঠিক করে আবার আমাদের নিয়ে যেতেন সেখানে।

তা এই সূত্রে বড় ঘন ঘন মামার বাড়ি যাওয়ার সুযোগ ঘটতো আমাদের।

মামার বাড়িতে গেলেই আমার ভার পড়তো পুতুল দিদির ওপর। তা শোয়ানো, খাওয়ানো, জামা পরিয়ে বেড়াতে পাঠানো, সমস্ত করতো পুতুল দিদি। আমার অন্য ভাইবোনদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতো মা। তাই যে-কদিন মামার বাড়ি থাকতাম, সে-কটাদিনই পুতুল দিদির হেপাজতে থাকতে হতো।

মনে আছে দালানে সবাই সার সার শুয়ে আছি। মাঝরাত্রে আমার ঘুম ভেঙেছে। ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে গেছে। ডাকলাম—পুতুলদি—

ডাকতে গিয়েও যেন গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না। যদি ধমক দেয়! যদি মারে! পুতুল দিদি মারত খুব। মেরে আমার গালে, পিঠে, বুকে একেবারে পাঁচ আঙুলের দাগ বসিয়ে দিত।

বলতো—পিসীমা, তোমার বড় ছেলেটিকে একেবারে বাঁদর করে তুলেছ—

মনে আছে, যখন আমার খুব অল্প বয়েস, পুতুল দিদিকে যেন ফ্রক্ পরতে দেখেছি। স্মৃতির সিন্দুক খুললে এখনও অস্পষ্ট আবছা আবছা সে-চেহারাটা মনে পড়ে। খুব মোটা-মোটা গোলগাল থল্‌থলে চেহারা ছিল তখন। আর ধব্‌ ধব্‌ করছে গায়ের রং। আমাকে কোলে করে নিয়ে বারান্দায় এ-পাশ থেকে ও-পাশে ঘুরতো। তারপর সেই পুতুল দিদি শাড়ি পরতে শুরু করলে। তখন গায়ের থল্‌থলে ভাবটা কমে গেছে। রংটি আরো উজ্জ্বল হয়েছে। গায়ে আরো জোর হয়েছে। পুতুল দিদি একটা চড় মারলে সমস্ত মাথাটা আমার ঝিম্ ঝিম্ করতো।

কিন্তু যত বিপদ হতো রাত্রে। পুতুল দিদি আমার পাশেই শুতো। ঘুমোতে ঘুমোতে কখন আমার গায়ে পা তুলে দিয়েছে খেয়াল নেই। কিন্তু তবু নড়তে পাবো না।

পুতুল দিদি মা'কে বলতো—পিসীমা, জানো, যত দুষ্টুমি ওর রাত্রে—

সত্যি, রাত্রেই আমার কেমন একলা কলতলায় যেতে ভয় করতো। সমস্ত বাড়িটা তখন নিশুতি। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আশে পাশে ভাই-বোনদের নিঃশ্বেস ফেলবার শব্দ আসছে। আবার একবার আস্তে আস্তে ডাকতাম—পুতুলদি—

শেষ পর্যন্ত যখন কলতলায় নিয়ে যেত আমাকে, তখন রাগের চোটে আমার ওপর দুম্ দুম্ করে কিল্ বসিয়ে দিত।

বলতো—রাত্তিরে যে একটু ঘুমোব তারও উপায় নেই তোর জ্বালায়—এমনি প্রতিদিন।

আবার বলতো—আজ যদি রাত্তিরে আবার উঠিস তো, কাল তোকে কিছু খেতে দেব না, উপোস করিয়ে রাখবো—দেখিস্ ঠিক—

কিন্তু তারপরেই বিকেল বেলা যখন জামা কাপড় পরিয়ে পার্কে বেড়াতে পাঠাতো ঝি-এর সঙ্গে, সে এক অন্য চেহারা। পাউডার স্নো মাখিয়ে, কপালে একটা খয়েরের টিপ পরিয়ে দিয়ে আমার কড়ে আঙুলের ডগাটা আলতো করে কামড়ে দিয়ে ছেড়ে দিত।

বলতো—সন্ধ্যেবেলা পড়তে বসতে হবে কিন্তু। মনে থাকে যেন—

কিন্তু আমাকে ভালোও বাসতো খুব পুতুল দিদি। কেউ আমাকে বকলে কি মারলে পুতুল দিদি এগিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

বলবে—পল্টুর ওপরে তোদের এত গায়ের জ্বালা কেন রে—ও তোদের কী করেছে রে—শুনি—

এমনি করে মিরাট থেকে জব্বলপুর, জব্বলপুর থেকে কাট্‌নি, কাট্‌নি থেকে কোথায় কোথায় বাবার সঙ্গে আমরাও বদলি হয়ে চলতে লাগলুম। আর মাঝে মাঝে এক-একবার প্রায় পাঁচ-ছ'মাসের মত মামার বাড়ি গিয়ে থাকি।

তখন পুতুলদি আরো বড় হয়েছে। ভালো ভালো শাড়ি পরে। গায়ে সাবান মাখে, এসেন্স মাখে। পুতুল দিদি যখন আদর করে কাছে টেনে নেয়, আমি বুক ভরে এসেন্সের গন্ধ শুঁকি। পুতুল দিদির কাছে-কাছে থাকতে ভালো লাগে। পুতুল দিদির পুতুলের বাক্সতে হাত দিতে দেয় তখন। বেড়াতে যাবার আগে সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়ে এক-একদিন একটা আধলা দেয়। বলে কাউকে বলিসনি পল্টু—তোকে আমি এমনি দিলুম—

আমি আবার সেই আধলা দিয়ে হয়ত চিনেবাদাম কিনে এনে লুকিয়ে লুকিয়ে দিতুম পুতুলদি'কে।

পুতুলদি বলতো—আজ লালার দোকানের কচুরি আনতে পারবি পণ্টু—

বলতুম—কেন পারবো না—

—কাউকে বলবি না বল্—

বলতুম—না, সত্যি বলছি, কাউকে বলবো না পুতুলদি—

—মাইরি বল্, মা কালীর দিব্যি, বল্—

তাই বলতাম। শেষে সেই গরম গরম তেলে ভাজা হিং-এর কচুরি নিয়ে এসে ছাদের ওপরে চিলে কুঠুরীর কোণে বসে দু'জনে খাওয়া।

এমনি করে কতবার কতরকম নিষিদ্ধ খাওয়া খেয়েছি দু'জনে। কেবল আমি আর পুতুল দিদি। পুতুলদি আমার চেয়ে পাঁচ-ছ' বছরের বড়। তবু আমাদের বন্ধুত্বে বাধেনি কোথাও।

একবার মামার বাড়িতে গিয়ে দেখলুম পুতুলদি আরো বড় হয়েছে। ইস্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। আমাকে পেয়ে পুতুলদি যেন একটা কাজ পেলে হাতে। পুতুল খেলা তখন ছেড়ে দিয়েছে। বই পড়ে খালি। লুকিয়ে লুকিয়ে বই পড়ে। আমি গিয়ে বই নিয়ে আসি পাশের বাড়ি থেকে চেয়ে চেয়ে। পুতুলদি'র পড়া হয়ে গেলে আবার ফিরিয়ে দিয়ে আসি। বেশির ভাগ সময় পুতুলদি ছাদের ওপরে বসে বসে পড়তো।

পুতুলদি একমনে পড়তো আর আমি বসে পাহারা দিতাম।

পুতুলদি বলতো—ওখানে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে থাক্, কেউ এলেই আমাকে বলে দিবি—

সিঁড়িতে কারো পায়ের শব্দ হলেই আমি ইঙ্গিত করতাম পুতুলদি'কে আর পুতুলদি বইটা লুকিয়ে ফেলতো কাপড়ের মধ্যে। তখন একেবারে ভালো মানুষ যেন। পুতুলদি এক এক সময় গান গাইতো গুন গুন করে। আর আমি হাঁ করে শুনতাম। গানের খাতায় কত যে গান লেখা ছিল পুতুল দিদির। পুতুলদি'র বিছানার তলায় সে-সব লুকোন থাকতো। এক আমি ছাড়া আর কেউ জানতো না সে-কথা।

আমাকে কেবল সাবধান করে দিত পুতুল দিদি—খবরদার আমি যে গান গাই, বই পড়ি—কাউকে বলবিনে—বললে তোর হাড় মাস আর আস্তো রাখবো না কিন্তু পণ্টু—

তা পুতুল দিদির পক্ষে সবই সম্ভব। প্রত্যেক কথাতেই মারতো আমাকে। বেড়াতে গিয়ে হয়ত প্যাণ্ট্-এ ময়লা লেগেছে, দেখামাত্র মার। পুতুল দিদি নিজে গান গাইতো বটে, কিন্তু আমি গাইলে আর রক্ষে নেই।

বলতো—খুব যে ওস্তাদ্ হয়ে গেছিস পণ্টু—এই বয়সেই গান ধরেছিস্—

কিম্বা হয়ত বলতো—বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মেশা হয়, না—তোমার আড্ডা মারা আমি বন্ধ করছি—

কখনও হয়ত গাল টিপে দিয়ে বলতো—লুকিয়ে লুকিয়ে আমার বই পড়ছিলি—এই বয়সেই নবেল পড়া দেখাচ্ছি তোমার—

কিন্তু সেবার এক কাণ্ড হলো।

হঠাৎ মামাবাবু আপিস থেকে বাড়ি এল একদিন দুপুরবেলা। আমি তখন ঘুমোচ্ছি। মামীমা জেগে ছিল বোধ হয়। একটা আচমকা শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দেখি একতলায় মামাবাবু পুতুলদি'কে খুব মারছে। সে কী মার! দেখে আমার কান্না পেতে লাগলো। পুতুলদি চুপ করে মার সহ্য করছে। আর মামাবাবু বেত দিয়ে পিঠের ওপর সপাং সপাং করে মারছে। মারতে মারতে পিঠ দিয়ে রক্ত পড়তে লাগলো।

সবাই এসে কাছে ভীড় করে দাঁড়ালো। কিন্তু কেউ কিছু বলছে না। মামাবাবুর সামনে কারো কথা বলার সাহস নেই। মামীমাও হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মা-ও হতভম্ব হয়ে গেছে। আমরা ভাই বোনরা সব ভয়ে নির্বাক হয়ে দেখছি।

মামাবাবু বললে—আজ আমি ওকে আস্ত রাখবো না আর—ও মেয়ে মরে যাওয়াই ভালো—

মামীমা কাঁদছিল। বললে—ও মেয়ে আমার একদিন মুখ পোড়াবে ঠিক, দেখে নিও তোমরা—

মা বললে—চেঁচিও না বউ, লোক জানাজানি হলে আমাদেরই মুখ পুড়বে—ওর আর কী—

মামীমার কান্না তখনও থামেনি। বলতে লাগলো—এইটুকু মেয়ের পেটে পেটে এত বুদ্ধি মা, আমি কতবার বলেছি বিয়ে দিয়ে দাও ও-মেয়ের —তখন কেউ কথা শুনলে না আমার,—এখন হলো তো—

মা বললে—দিন কাল খারাপ পড়েছে বউ, এ হাওয়ার দোষ, আমার পন্টু হয়েছে ওই বয়েসে—বিয়ে দিলে ও মেয়ে তিন ছেলের মা হতো এতদিনে—

তা পুতুলদি'র বয়েস তখন তেরো আর আমার বয়েস সবে আট।

সেই তেরো বছর বয়েসের পুতুল দিদি সেদিন কী অপরাধ করেছিল বুঝিনি, কিন্তু যে-শাস্তিটা পেয়েছিল তা এখনও মনে আছে। মনে আছে সেদিন কয়লা রাখবার একটা ঘরে সারাদিন বন্দী হয়ে থাকতে হয়েছিল পুতুল দিদিকে; খেতে দেওয়া হয়নি, ঘুমোতে পায়নি। এক গ্লাস জল পর্যন্ত দেওয়া হয়নি সেদিন পুতুল দিদিকে। আমার বার বার মনে হচ্ছিল পুতুল দিদির কথা। কান্না পেয়েছিল পুতুল দিদির অবস্থা ভেবে। কিন্তু ভয়ে কয়লার ঘরটার কাছে যেতে পারিনি একবারও। যদি কেউ দেখতে পায়!

পরের দিন পুতুল দিদিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—ওরা তোমাকে অত মারলে কেন পুতুল দিদি? কী দোষ করেছিলে তুমি?

পুতুল দিদি ভীষণ রেগে গিয়েছিল,—বললে—তোর অত খবরে দরকার কী রে—বড় জ্যাঠা হয়েছিস তো তুই—লেখাপড়া নেই, খালি—

তারপরে পুতুল দিদির বিয়েতে আবার একবার এলাম মামার বাড়িতে। পুতুলদিদি তখন অনেক বড় হয়েছে। তখন বোধ হয় বছর ষোল বয়েস। ভারিক্কি হয়েছে চেহারা। বেনারসী আর চন্দনের টিপ পরে সে রীতিমত

অন্য চেহারা। বিয়ের দিন সন্ধ্যেবেলা চারদিকে আলো জ্বলছে। বাজনা বাজছে। লোকজন আত্মীয়-স্বজন। লুচিভাজার গন্ধ।

আমি পুতুল দিদিকে একলা পেয়ে এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করলাম—তোমার ভয় করছে না পুতুলদি ?

পুতুলদি ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে—ভয় করতে আমার বয়ে গেছে—

বললাম—তুমি তো শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে এবার—

পুতুল দিদি বললে—যাচ্ছি বৈকি—যাবোই তো—তোর কী রে—

কী জানি আমার যেন কেমন কষ্ট হচ্ছিল। সমস্ত বাড়ির কল-কোলাহল আনন্দ উৎসবের মধ্যে আমার মন যেন উদাস হয়ে যাচ্ছিল পুতুল দিদির কথা ভেবে। মামার বাড়িতে একটা মাত্র লোভ একটা মাত্র আকর্ষণ ছিল—সে পুতুল দিদি। পুতুল দিদির হাতে মার খেতেও যেন কত আনন্দ। পুতুল দিদির গালাগালিও যেন কত মিষ্টি। মামার বাড়িতে এলে এবার থেকে কে সাজিয়ে গুজিয়ে দেবে। কে পাহারা দেবে আমায়। আমি নভেল পড়ছি কি না কে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখবে। আমার ভালো মন্দের জন্যে কে অত মাথা ঘামাবে।

পুতুল দিদি তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারা দেখছিল। একবার এদিক একবার ওদিক। নতুন গয়না পরে কেমন দেখাচ্ছে, তাই।

পুতুল দিদি বললে—দেখিস তো—কেউ যেন আসে না এদিকে—

বিয়ে বাড়িতে রাজ্যের লোক। দরজা-জানালা বন্ধ করে দিলাম। কেউ আর দেখতে পাবে না। পুতুল দিদি আপন মনে সাজগোজ করতে লাগলো চুপ করে। আমি যে একটা মানুষ, তা যেন গ্রাহ্যই নেই। শাড়িটাকে ঘুরিয়ে বেঁকিয়ে নানাভাবে নানান্ কায়দায় পরেও সোয়াস্তি নেই। কিছুতেই যেন পছন্দ আর হয় না নিজেকে। নিজের রূপ নিয়ে নিজেই বিভোর। একবার ঘোমটা দিলে। একবার ঘোমটা সরিয়ে দিলে। একবার ঠোঁটে রং দিলে। আবার ঘষে রং মুছে ফেললে। কিছুতেই আর পছন্দ হচ্ছে না।

শেষকালে আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—কেমন দেখাচ্ছে রে আমাকে—

পুতুল দিদির দিকে চেয়ে কিছু বলতে পারলাম না কিন্তু। আমার মনে হলো যেন অপূর্ব। উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, জগদ্ধাত্রী, দুর্গা সব নামগুলো একসঙ্গে মনে এল।

পুতুল দিদি বুঝতে পারলে। বললে—আমার দিকে অমন করে চাইছিস কেন রে—আমি না তোর দিদি হই—খবরদার কিল মেরে পিঠ ভেঙে দেব—

বলে কথা নেই বার্তা নেই আমার পিঠে এক কিল বসিয়ে দিলে দুম্ করে।

বললে—এই সব শিক্ষা হচ্ছে, না ?···

বললাম—আমি কী করেছি—

—আবার কথা ? আমি বুঝি না কিছু—মেয়েমানুষের দিকে অমন করে তাকাতে আছে ?

পিঠের ব্যথায় আমার চোখ দিয়ে তখন জল গড়াচ্ছিল।

পুতুলদি বললে—আবার ছিঁচকাঁদুনি আছে ঠিক—বিদেশে থেকে থেকে এই সব যত বদ শিক্ষা হচ্ছে—

আমার বড় অভিমান হয়েছিল সেদিন মনে আছে। খিল খুলে বাইরে চলে আসছিলাম।

পুতুল দিদি বললে—কোথায় যাচ্ছিস শুনি—

—বাইরে—

পুতুল দিদি হঠাৎ হাতটা ধরে এক টান দিলে। বললে—এইটুকু বয়েস থেকেই এত শয়তানি—যেতে হবে না বাইরে—একটা কাজ কর—দাঁড়া এখানে—

তখন বেশ সন্ধ্যে হয়ে আসছে। এখনি বর আসবে। ঘরের বাইরে লোকজনের গলা শোনা যায়। সবাই কাজে ব্যস্ত। এখনি বরযাত্রীরা

এসে পড়বে। জামা-কাপড় পরে সবাই তৈরি হয়ে নিয়েছি। পুতুল দিদি হঠাৎ একটা কাগজ নিয়ে চিঠি লিখতে বসলো। একমনে কী সব লিখলে খানিকক্ষণ। তারপর চিঠিটা খামে পুরে জিব দিয়ে খামের মুখটা ভিজিয়ে সেঁটে দিলে। বললে—এই চিঠিটা দিয়ে আয় তো—

আমি চিঠিটা নিয়ে চলে যাচ্ছিলাম।

পুতুল দিদি থামিয়ে দিলে। বললে—কাকে দিবি—

বললাম—তুমি যাকে বলবে—

—তবে শোন্, বড় রাস্তার মোড়ে যেখানে একটা জিউলি গাছ আছে, তার গায়ে একটা এতবড় ফোকর দেখবি, সেই ফোকরের মধ্যে তুই রেখে দিয়ে আসবি—পারবি তো, কেউ যেন না দেখে—

বললাম—কেউ দেখতে পাবে না—

—যদি কেউ দেখতে পায়—তা হলে ?

—তা হলে তুমি আমায় দশ ঘা কিল মেরো—

তখন আমার সমস্ত শরীর আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। পুতুল দিদির একটা জরুরী গোপন কাজ করতে পেরেছি। পুতুল দিদি আমায় বিশ্বাস করেছে। আমার আনন্দ আর ধরে না।

কিন্তু পুতুল দিদি এক কাণ্ড করে বসলো সেই মুহূর্তে। সেই আতর, স্নো, পাউডার, সেই নতুন সোনার গয়না, সেই বেনারসী, জরি, জড়োয়া নিয়ে হঠাৎ আমার মুখটা ধরে গালে একটা চুমু খেলে। আদরে পুতুল দিদির মুখের চেহারা একমুহূর্তে অন্য রকম হয়ে গেল। বললে—লক্ষ্মী ভাইটি আমার—কেউ যেন না দেখে, বুঝলি তো—

বললাম—কেউ দেখবে না পুতুলদি—তুমি দেখে নিও—

—যদি ভালো মতন চুপি চুপি দিয়ে আসতে পারিস চিঠিটা—তো আবার তোকে একটা চুমু দেব—

সেদিন চিঠিটা যথাস্থানে নিঃশব্দে গোপনেই রেখে এসেছিলাম। এক-

বার কৌতূহল পর্যন্ত হয়নি কার নামে লেখা সে চিঠি, কে সে-চিঠিটা নিলো বা কী রকম তার চেহারা। তার সঙ্গে পুতুল দিদির কীসের সম্পর্ক। ন্যায় অন্যায় কোনও বিচারের চিন্তা মনে ঘেঁষেনি। যেন কর্তব্যটা সম্পাদন করতে পারলেই আমার পাওনা উপহারটা মিলবে—এইটেই ছিল আমার লক্ষ্য।

কিন্তু পুতুল দিদির কাছ থেকে সে-চুমু আমার আর পাওয়া হয়নি সেদিন। শুধু সেদিনই নয়—সে-পাওনা আমার বরাবরই বকেয়া রয়ে গেছে। তারপর যখন দেখা হয়েছে······

কিন্তু সে-দেখা না হলেই বুঝি ভালো হতো।

পুতুল দিদি তো শ্বশুরবাড়ি চলে গেল। আর তারপরদিন আমরাও চলে গেলাম মিরাটে। বাবা তখন জব্বলপুর থেকে মিরাটে বদ্‌লি হয়েছিলেন। পরের বছরে গরমের ছুটিতে আর আসা হয়নি মামার বাড়িতে। দেয়ালির ছুটিতেও যাওয়া হলো না।

মনে আছে একদিন পোস্ট কার্ড এল একটা।

মা চিঠি পেয়েই পড়তে লাগলো। আফিস থেকে বাবা এলে বাবাকেও দেখালে।

চিঠি পড়ে বাবারও মুখের ভাব কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। জামা-কাপড় ছাড়তে ভুলে গেলেন অনেকক্ষণ।

রান্না-বান্না পড়ে রইল মা'র। মা বললে—পোড়ারমুখী আমাদের বংশের নাম ডোবালে গো—এখনও যে দাদার দু'মেয়ের বিয়ে দিতে বাকি—

বাবা বললেন—আজকাল ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে মেলা-মেশা তো এই জন্যেই পছন্দ করিনে—

মা বললে—অমন সব্বনেশে রূপ দেখেই বুঝেছিলাম কপালে ওর দুঃখু আছে অনেক—রূপসী মেয়েরা কখনও সুখী হয় জীবনে—

রান্নাঘরে গিয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলাম—কী হয়েছে মা?

—কীসের কী রে ?

—কা'র কথা বলছিলে তখন বাবাকে ?

মা হঠাৎ রেগে গেল। বললে—তোমার সব কথায় কান দেওয়া কেন শুনি ? নিজের লেখা-পড়া নেই ?

কিন্তু কেন জানি না মনে বড় ভয় হলো। মনে হলো নিশ্চয়ই পুতুল দিদির কিছু হয়েছে। রূপসী বলতে তো পুতুল দিদিকেই বোঝায়। অমন রূপসী আর মামার বাড়িতে কে আছে !

মার নামে আবার চিঠি এল। মা সে-চিঠিটাও আড়ালে নিয়ে অনেকক্ষণ পড়লে। তারপর বাবা আপিস থেকে আসতেই বাবাকে পড়ালে। আমি আশে-পাশে ঘুর-ঘুর করছি। কী কথা বলে শুনবো।

মা বললে—তুই এখেনে কেন রে, যা পড়গে যা—

আমাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তবে যেন শান্তি। কিন্তু মনে মনে ভারি কষ্ট হতে লাগলো। সে কষ্ট কার জন্যে কিম্বা কেন তা জানি না। কিন্তু মনে হলো যেন পুতুল দিদিকে নিয়েই বাবা-মা'তে আলোচনা চলছে। পুতুল দিদি যেন চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। পুতুল দিদিই যেন মামার বাড়ির বংশে কালি দিয়েছে।

তারপর বহুদিন আর মামার বাড়ি যাওয়া হয় না। বাবা বদ্‌লি হন আর আমরা সঙ্গে সঙ্গে যাই। মা বলেন—না, ছেলেমেয়েরা তো ওই সব শুনবে, তখন কী ভাববে বলো তো—

তারপর পাঁচ বছর পরে একটা মারাত্মক অসুখের পর বাবা যেবার ছুটি নিলেন, সেবার আবার মামার বাড়ি গেলাম।

মামাবাবু তখন আরো বুড়ো হয়ে গেছেন। মামীমাও অথর্ব। মামার বাড়িতে গিয়ে আর সে-আদর সে-যত্ন পেলাম না। মামার বাড়ির সে-আবহাওয়া বদলে গেছে। মামাতো ভাই-বোনরাও বড় হয়ে গেছে খুব। মামাবাবুর সমাজে বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল। আগে কত লোকজন

আসতো। বৈঠকখানা ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কতক্ষণ ধরে আসর বসতো। কেউ আর আসে না দেখলাম। মামাবাবু একলা নিজের ঘরে বসে কেবল তামাক খান। পুরোন চাকর রামধনি নিজেই সব করে। বাজার করা থেকে তামাক সাজা পর্যন্ত সমস্ত।

বাড়িতে ঢুকেই ফটিককে জিজ্ঞেস করলাম—পুতুল দিদি কোথায় রে ?

ফটিক যেন ভয় পেয়ে চারদিকে একবার চেয়ে নিয়ে থেমে গেল। কেউ কিছু বলে না।

বিকেলে বেড়াতে যাবার সময় মা বললে—পল্টু যেন তরুয়ার দিকে —না যায়, দেখিস রামধনি—

মামার বাড়িটা ছিল শনিচরি বাজারে যাবার রাস্তার ওপরেই। আর সোজা রাস্তা ধরে পূব দিকে গেলেই তরুয়া। তরুয়াতে আগে কতবার গেছি। ওখানে আড়পা নদীর ধারে রেলের পাম্পিং স্টেশনে গিয়ে খেলা করেছি। ওপারে পেয়ারাবাগানে গিয়ে মালীর সঙ্গে ভাব জমিয়ে পেয়ারা খেয়েছি। আর এবার তরুয়াতে যেতে কেন এত আপত্তি কে জানে।

রামধনি বুড়ো মানুষ। কিন্তু সে-ও কিছু বললে না।

বললে—ও-সব কথা বলতে নেই—

কিন্তু শেষে বললে অস্তু।

বললে—কাউকে বলবে না বলো—মা-কালীর দিব্যি বলো—নইলে মা কিন্তু মাথা ফাটিয়ে দেবে একেবারে—

বললাম—বলবো না, বল্ তুই—

—মা মঙ্গলচণ্ডীর দিব্যি করে বলো—

—মা মঙ্গলচণ্ডীর দিব্যি—

অস্তু বললে—পুতুলদি না শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে—

—পালিয়ে এসেছে ! কোথায় আছে ?

—ওই যে বড়রাস্তার মোড়ে থাকতো অম্বিকাদা', সেই আমাদের

ল্যাবেনচুষ কিনে দিত? তাতে আর পুতুলদিতে তরুয়ার একটা বাড়িতে আছে—

—তরুয়ার কোন্ বাড়িতে?

—অ্যাডাম্‌স্ ব্লকে! পুতুলদি'র একটা মেয়ে হয়েছে ভাই—

—আর জামাইবাবু?

জামাইবাবুর খবর অন্তু রাখে না।

অন্তু বললে—একদিন লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়েছিলুম পুতুলদি'কে দেখতে—কী নোংরা ঘর ভাই—ময়লা কাপড় পরে তখন রান্না করছিল, আমাকে মুড়ি খেতে দিলে—আমার খুব কষ্ট হলো দেখে—

—তারপর?

—তারপর পুতুলদি জিজ্ঞেস করলে বাবা কেমন আছে, মা কেমন আছে, সবাই কেমন আছে জিজ্ঞেস করলে—

জিজ্ঞেস করলাম—আমার কথা জিজ্ঞেস করেনি পুতুলদি—

—না ভাই, তোমার কথা জিজ্ঞেস করেনি—

বললাম—আজ যাবি আমার সঙ্গে অন্তু—আমায় বাড়িটা একবার দেখিয়ে দিবি—

অন্তু বললে—না বাবা, মা বকবে—সেদিন আমাকে বাবা যা মেরেছিল—

মনে আছে কতদিন কতবার মনটা তরুয়ার দিকে যাবার জন্যে ছট্‌ফট্ করেছে। ইস্টিশনে যাবার রাস্তার বাঁদিকে পড়ে তরুয়া। তরুয়ার ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে গেলেই বড় বড় দু'টো আমগাছের তলায় অ্যাডাম্‌স্ ব্লক্। সেই-দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতাম। কোথাও কোনও বাড়ির জানালার ফাঁক দিয়ে যদি পুতুল দিদিকে দেখা যায়। অ্যাডাম্‌স্ সাহেবের বাড়িটা ছিল দোতলা। আর তার ডান দিকের সার-বাঁধা ছটা বাড়ি ছিল একতলা। সেগুলোতে থাকতো ভাড়াটেরা। অ্যাডাম্‌স্ সাহেবকে চিনতাম। বুড়ো

গার্ড সাহেব। চাকরি থেকে রিটায়ার করে বাড়ি করেছিলো ওখানে। বিয়ে-থা করেনি। সাইকেল করে টিকিয়ে টিকিয়ে সকাল-সন্ধ্যেয় গিয়ে রানিং-রুমে গার্ডদের সঙ্গে আড্ডা দিত। কিন্তু মা'র ভয়ে কোনওদিন ওদিকে যেতে পারিনি। কেবল মনে হতো পুতুলদির কাছে আমার একটা পাওনা বাকি আছে। সেদিন সেই জিউলি গাছের কোটরের মধ্যে সেই চিঠিটাতো আমি রেখেই এসেছিলাম ঠিক। তারপর বিয়ে বাড়ির হৈ চৈ-এর মধ্যে বোধ হয় পুতুলদি সে-কথা ভুলে গেছে।

কিন্তু আবার মনে হতো অম্বিকাদা'কে কী করে পছন্দ হলো পুতুল দিদির। পুতুল দিদির বরকে তো ভালোই দেখতে। মামাবাবু কত খোঁজ করে কত খরচ করে ভাগলপুরে বিয়ে দিলেন।

সেদিন বুক ঠুকে সকাল বেলাই চলে গেলাম তরুয়ার দিকে। কোন্ বাড়িতে পুতুল দিদি থাকে জানি না। তবু চলেছি। মনে হলো যা হয় হোক —মেরে মাথা ফাটিয়ে দিলেও পুতুল দিদির সঙ্গে দেখা করা চাই আমার।

সামনে আলকাতরা মাখানো জাফরি দেওয়া ঘর। ভেতরের কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না। মনে হলো যদি পুতুল দিদি আমাকে দেখতে পায় নিশ্চয় ডাকবে। বার বার রাস্তা দিয়ে ঘোরা ফেরা করলাম—কেউ ডাকলে না। রাস্তায় ছোট ছোট মাদ্রাজীদের ছেলেরা খেলা করছিল—তাদেরও জিজ্ঞেস করি-করি করে জিজ্ঞেস করা হলো না।

পরের দিন আবার একবার বিকেলের দিকে যাবো ভাবলাম। কিন্তু বাবার টেলিগ্রাম এসে হাজির হলো সেদিন। সকালবেলার নাগপুর প্যাসেঞ্জারেই রওনা হয়ে গেলাম বাবার কাছে।

যে-কদিন ছিলাম মামার বাড়িতে, দেখেছিলাম মামাবাবুর কাছে এক সাধু আসতো রোজ। মামাবাবু খুব ভক্তি করে অভ্যর্থনা করতেন। মামাবাবুকে কখনও আগে সাধুসন্ন্যাসী নিয়ে মাথা ঘামাতে দেখিনি। কেমন যেন আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম।

রামধনি বলেছিল—মস্ত বড় তান্ত্রিক সাধু উনি—জিনিস হারালে জিনিস পাইয়ে দেন—দুষমন থাকলে দুষমন নষ্ট করেন—

ফটিক বললে—ও লোকটা শ্মশানে গিয়ে পুজো করে পুতুলদির জন্যে—

বললাম—কেন?

ফটিক বললে—ও বলেছে, পুজো করলে আবার জামাইবাবুর বাড়িতে পুতুলদি ফিরে যাবে—

কিন্তু ফিরে সেবার যায়নি। যখন ফিরেছিল তখন পুতুল দিদির মেয়ে আরো বড় হয়েছে। মামাবাবু সে-ঘটনা দেখে যেতে পারেন নি। মেয়ের শোকেই প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। একদিন তিনি মারাও গিয়েছিলেন। আমরা তখন কানপুরে।

শুনলাম—পুতুল দিদি নাকি বরের কাছে ফিরে গেছে—

আমি তখন চাকরিতে ঢুকেছি সবে। ফটিকও চাকরি করছে রেলে।

ফটিক লিখেছিল—জামাইবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের বউ মারা যাবার পর, একবার এসেছিল মামার বাড়িতে—এসে কান্নাকাটি করতে পুতুল দিদি রাজি হয়েছে শ্বশুরবাড়ি যেতে। মেয়েকে নিয়েই পুতুল দিদি শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে।

আমি লিখেছিলাম—আর সেই তোর অম্বিকাদা?

ফটিক লিখেছিল—অম্বিকাদা সেই তরুয়ার বাড়িতেই আছে একলা —কার সঙ্গে মেশে, কী করে তাও জানি না।

তখন বড় হয়েছি আমরা। সব জিনিস বুঝতে শিখেছি। অতীতের ঘটনার নতুন অর্থ করেছি। তবু আমার কাছে অবাক লেগেছে কেমন করে এ সম্ভব হলো। ভেবেছি—কত বড় দরাজ বুক হলে পরের সন্তান-শুদ্ধ স্ত্রীকে আবার গ্রহণ করতে পারে লোকে। কত বড় ক্ষমাপরায়ণ মন হলে এ সম্ভব হয় তা-ও বুঝেছি। বুঝেছি সংসারে আইন দিয়ে আর যত কিছুই বাঁধা যাক, মন বস্তুটি বড় শক্ত জিনিস, সে কারো শাসন মানে

না, কোনও আইন মানে না সে, কো॰পুতুল দিদি। স্বর্গত বাবার নামে
না। শুধু একটা জিনিস বুঝিনি—সেই ॰মামাবাবু পুতুল দিদির ব্যাপারে
স্বামীর ঘরে ফিরে যেতে রাজী হলো। বুঝিনি'ব—জানকীনাথ বসুই অমর
যে করেছি তা-ও নয়। ভেবেছি স্বামী-স্ত্রীর মনের ৺ক খুব। বাবার নামে
দুর্ভেদ্য রহস্য লুকিয়ে আছে তা বোঝবার চেষ্টা করাও ে কাছারির মুখোমুখি
দিদির স্বামী-ত্যাগও যেমন দুর্বোধ্য, স্বামীকে তার পুনর্গ্রহ॰.হাসপাতাল"।
সে সম্বন্ধে বাইরের লোকের মতামত শুধু নিরর্থকই নয়, মিথ্যেও চিনতে
তাতে সুবিচারের নামে অবিচারই তো ঘটতে দেখি সংসারের স মেয়ে
সুতরাং সে-চেষ্টাও আর করিনি।

মামাবাবুর মৃত্যুর পর থেকে মামার বাড়ি যাওয়া আমাদের কমে গেল বটে, কিন্তু সম্পর্ক ঠিকই ছিল। বিয়ে শ্রাদ্ধ অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে মাঝে মাঝে দেখা বা চিঠি লেখা হতো। আমাদের বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে জীবনও জটিল হয়ে উঠলো।

ফটিকের ঘাড়েই তখন সংসারের সব ভার পড়েছে। তিন বোনের বিয়ে, দুই ভাইকে কলেজে পড়িয়ে মানুষ করানো থেকে বাড়িটা দোতলা তোলা। তা ছাড়া লোকলৌকিকতা খাওয়া-পরা, এই সামান্য রেলের চাকরি থেকে করা সামান্য কথা নয়।

সেবার অন্তুর বিয়েতে গিয়েই দেখলাম—এলাহি কাণ্ড করে বসেছে ফটিক। রশোনচৌকি, ব্যাণ্ড, খাস-গেলাসের আলো, বাজি ফাটানো আর বিলাসপুর ঝেঁটিয়ে সমস্ত বাঙালীদের সপরিবারে খাওয়ানো কি কম খরচের ব্যাপার। দেখে মনে হলো—ফটিক কি চাকরিতে মোটা ঘুঁষ পায় নাকি?

বলেছিলাম—ধার দেনা হলো বোধ হয় তোর অনেক—

ফটিক বললে—আমি ধার করবার পাত্তোর বটে—আমার তো ওই চাকরি, জানিস তো তুই—দশ আনা রোজ—ওদিকে মিণ্টুর বরকে বিলেত

রামধনি বলেছিল—মস্ত বড় তা'দিএবারে বাড়িটাও তেতলা তোলা হবে—পাইয়ে দেন—তুষমন থাকলে তুষ

ফটিক বললে—ও লোক—

বললাম—কেন? এবার পুজোতে আত্মীয়স্বজনকে কাপড় দেওয়া হলো।

ফটিক বললে—পারলে সবাই ভালো—কী বল্—

পুতুলদি ফিরে—কিন্তু এমন করে টাকা ওড়ানোর দরকার কী—

কিন্তু বললে—এ-সব কি আমার ইচ্ছে—বললে পুতুলদি শোনেনা—আরে—পুতুলদি?

—হ্যাঁ, পুতুলদি'ই তো সস্ত-নস্তর বিয়ে টিয়ে দিলে, যাবতীয় খরচ করছে সে, পুতুলদি ছিল বলে আবার বিলাসপুরে বাঙালী সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছি ভাই—পুতুলদি'র জন্যেই একবার মাথা হেঁট হয়েছিল আমাদের, আবার ওই পুতুলদি-ই আমাদের মাথা উঁচু করিয়ে দিয়েছে, এবার এখানকার তুগ্‌গো পুজোয় আটশো টাকা চাঁদা পাঠিয়ে দিয়েছিল, খুব খুসী সবাই—আবার বলেছে এখানকার লেপার হোমের জন্যেও কয়েক হাজার টাকা দেবে—টাকার তো অভাব নেই জামাইবাবুর—

—অত টাকা কী করে হলো?

—ব্যবসায়ে জানিস তো উঠ্‌তি পড়্‌তি আছে। এখন উঠ্‌তির সময় চলছে—তু'হাতে টাকা উপায় করছে জামাইবাবু—

জিজ্ঞেস করলাম—পুতুলদির ছেলেমেয়ে কী?

—ওই সেই মেয়ে একটা, লক্ষ্মী, আর তো হলো না—

এ-সব ঘটনা অনেক দিনের। পুতুল দিদির জীবনটা পূর্বাপর আলোচনা করে যেমন কোনও তাৎপর্য খুঁজে পাইনি, তাৎপর্য খোঁজবার চেষ্টাও করিনি কোনদিন। এখন বুঝেছি ফরমুলা দিয়ে বাঁধা যায় গল্প উপন্যাসকে—মানুষের জীবন ফরমুলার ধার ধারে না। নইলে সেই পুতুল দিদি স্বামীর মৃত্যুর পর ব্যবসা তুলে দিয়ে আবার কেন বিলাসপুরে আসে। কোতোয়ালীর

সামনে আবার বিরাট প্রাসাদ তুলেছে পুতুল দিদি। স্বর্গত বাবার নামে বাড়ির নাম দিয়েছে—"জানকী-ভবন"। যে-মামাবাবু পুতুল দিদির ব্যাপারে লজ্জায় অপমানে দেহত্যাগ করলেন, সেই মামাবাবু—জানকীনাথ বসুই অমর হয়ে রইলেন বিলাসপুরে। এখন জানকীবাবুর নামডাক খুব। বাবার নামে হাসপাতাল করে দিয়েছে পুতুল দিদি। ট্রেজারীর পাশে কাছারির মুখোমুখি মস্ত দু'শো বিঘে জমির ওপর "জানকীনাথ মেমোরিয়াল হাসপাতাল"। জানকীবাবুর নাম করলে এখন হাজার মাইল দূরের লোক পর্যন্ত চিনতে পারে। হাত জোড় করে মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করে। বলে—ধন্য মেয়ে জন্মেছিল বটে।

আর তা ছাড়া গুণও কি কম।

মারহাট্টিদের গণেশ পুজো, মাদ্রাজীদের পঙ্গল, বাঙ্গালীদের দুর্গাপুজো; ছত্রিশ গড়িয়াদের ছট্ পরব,—এক একটা উৎসবে হাজার হাজার লোক কাপড় পায় একখানা করে। আর সিধে।

অথচ খুব বেশি দিনের কথাও তো নয়। কিন্তু মানুষ চিনি, মানুষের সব জানি বলে বড়াই-এরও তো অন্ত নেই আমাদের। কী করে কী হলো—এসব ভাবতে গেলে কেমন যেন উপন্যাস পড়ছি বলে মনে হবে।

সেই কথাই ভাবছিলাম লক্ষ্মীর বিয়েতে এসে। পুতুল দিদির একমাত্র মেয়ে লক্ষ্মীর বিয়ে আজ। ঘটার শেষ নেই। জাঁকজমকের অন্ত নেই।

পুতুল দিদিকে দেখলাম অনেকদিন পরে। একটা তসরের থান পরে বসে আছে। চারিদিকে সাত্ত্বিক সতীলক্ষ্মী বিধবা-সধবা আত্মীয়স্বজন তোষামোদ করছে তাকে ঘিরে। পাশে লক্ষ্মী বসে আছে।

আন্নাদিদি বলছে—তুই কিছু মুখে দে পুতুল—আমরা তো আছি—দেখছি সব—

কাল একাদশী করেছে পুতুল দিদি। নির্জলা একাদশী করে আজ

এতটা বেলা মুখে কিছু দেয়নি বলে আত্মীয়াদের মাথা-ব্যথার অন্ত নেই। কিন্তু একটা জিনিস দেখে বড় অবাক লাগলো। সকাল থেকে পুলিশ-কনস্টেবলে ছেয়ে গেছে বাড়ির চারিদিক।

ফটিককে জিজ্ঞেস করলাম—এত পুলিশ পাহারা কেন রে?

ফটিক বললে—ও একটা ব্যাপার আছে—পরে বলবো—

বাড়ি আবার সরগরম্ হয়ে উঠেছে। অন্তু এসেছে, নন্তু এসেছে। জামাইরাও এসে বাড়ি আলো করেছে। ভাই, ভাজ, ভাইপো, বোন, বোনঝি, বোনঝিজামাই—সব!

পুতুল দিদি বললে—ছেলেদের নিয়ে এলি না কেন শুনি—? কতদিন তাদের দেখিনি—বউকেও নিয়ে এলিনে—বড় হয়ে সব পর হয়ে গেলি নাকি তোরা?

রাত্রের দিকে পুলিশ-পাহারা আরো বাড়লো।

ফটিককে জিজ্ঞেস করলাম—এত পুলিশ-পাহারার বন্দোবস্ত কেন?

ফটিক ব্যস্ত ছিল। তবু গলা নিচু করে বললে—পুতুলদি কোতোয়ালীর বড় দারোগাকে বলে নিজে এ-ব্যবস্থা করেছে—

—কেন?

—ওই লক্ষ্মীর জন্যে, ভাগলপুরে যতদিন ছিল, ওখানকার পাড়ার ছেলেরা ভালো নয়, লক্ষ্মীও ঠিক নিজের ভালোমন্দ বুঝতে পারে না তো, সে-বয়েসও হয়নি, একবার এক-ছেলের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিল, তারপরে অনেক কষ্টে আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে—

কেমন যেন অবাক হয়ে গেলাম।

ফটিক বললে—তা এইবার বিয়ের সম্বন্ধ হবার পর চোখে চোখে রাখতে হচ্ছে। ওকে উড়ো চিঠিও দিয়েছে একটা, তাই পুতুলদি নিজের কাছে বসিয়ে রেখেছে সমস্ত দিন—

কিন্তু মনে হলো—বরও তো আশ্চর্য ছেলে।

ফটিক বললে—তাকেও সব বলা হয়েছে, সব শুনেই সে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে।

—খুব ভালো বলতে হবে তাকে—

ফটিক বললে—টাকায় সব হয় ভাই, শাশুড়ীর একমাত্র মেয়ে জানে তো—টাকার লোভটাও আছে বৈকি।

তা' যা'হোক কখন বিয়ের ধুমধামের মধ্যে সমস্ত দিন কাটলো। বর এল। শাঁখ বাজলো। হুলুধ্বনি উঠলো। হাজার-হাজার লোক পাত পেড়ে লুচি তরকারি খেয়ে কখন বিদায় নিলে, কিছুই বোঝা গেল না। নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে কাটলো সন্ধ্যেটা। কোনও বিঘ্ন ঘটতে পারে না জানতাম। বিঘ্ন হলোও না।

আমি একফাঁকে সরে পড়লাম।

ফটিক ধরলে—এখুনি যাবে কেন, গাড়ি তো তোমার কাল ভোর বেলা—

বললাম—সেই ভোর চারটেয় ট্রেন, তারপর আবার শীতকাল—অত সকালে স্টেশনে যাওয়া—স্টেশন কি এখানে নাকি—

—তোমাকে আমি গাড়ি করে পৌঁছে দেব, কোনও ভাবনা নেই—

তবু আমি থাকতে রাজি হইনি। খাওয়া-দাওয়া চুকলেই বেরিয়ে পড়লাম। রাত্রে গিয়ে ওয়েটিং-রুমে আরাম করে শুয়ে থাকবো। তারপর ট্রেন আসবার ঘণ্টা শুনলেই উঠে পড়া যাবে। শীতকালের রাত। রাত চারটে মানে শেষ রাত্তির। আর বিলাসপুরের আপারক্লাস ওয়েটিং-রুমটা ভারি নিরিবিলি। দোতলার ওপর। বেশি লোকজন থাকে না। ভোরের ট্রেনে যেতে গেলে বরাবর এমনি রাত্রে গিয়ে শুয়ে থেকেছি সেখানে। এ আজ নতুন নয়। কিম্বা প্রথমও নয়।

একটা টাঙ্গা নিয়ে উঠে পড়লাম স্টেশনের দিকে।

তা এই ওয়েটিং-রুমের মধ্যেই সে-রাত্রে যা ঘটলো তার পরে দেখলাম

সত্যি আমার এতদিনের চেনা পুতুল দিদি রীতিমত একটা গল্পে দাঁড়িয়ে গেছে বেশ।

সেই ঘটনাটিই বলি এখানে।

টাঙ্গার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে কুলির মাথায় মালপত্তর চাপিয়ে দোতলায় ওয়েটিং-রুমে তো গিয়ে হাজির। লোকজন বিশেষ তখন কেউ নেই। কেবলমাত্র একজন ভদ্রলোক ভালো খাটটা জুড়ে বসে আছেন।

কুলিকে বলে দিলাম গাড়ি আসবার লাইন-ক্লিয়ারের ঘণ্টা হলেই যেন এসে ঘুম ভাঙিয়ে দেয় আমার। তারপর শোবার বন্দোবস্ত করতে লাগলাম।

শোবার আগে ভদ্রলোকের দিকে একবার চেয়ে দেখলাম।

বললাম—আলো নিভিয়ে দিলে কি আপনার খুব অসুবিধা হবে—

ভদ্রলোক যেন একটু অন্যমনস্ক ছিলেন। বললেন—কেন?

—না, আমার আবার আলো জ্বললে ঘুম আসে না কিনা—

ভদ্রলোক বললেন—আমি এখুনি চলে যাবো, এই সাড়ে এগারোটার গাড়িতে—আপনি বরং এই খাটটায় এসে শোন্—এইটেই মজবুত, শুয়ে আরাম পাবেন—আমি সারাদিন ছিলাম এখানে—

বলে ভদ্রলোক সত্যিই জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে কুলি ডেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ভেতরের আলো নিভিয়ে দিয়ে ওঁর খাটটি দখল করে শুয়ে পড়লাম। শুধু বাইরের সিঁড়িতে একটা আলো জ্বলতে লাগলো। ভারি শীত পড়েছিল। আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেলাম কখন টের পাইনি।

আর তারপর মনে হলো বোধহয় মিনিট খানেকও হয়নি। গাঢ় ঘুমের মধ্যে দু'ঘণ্টাকেও যেন সময় এক মিনিট বলে ভুল হয়েছে তো কতবার।

অন্ধকারের মধ্যেই হঠাৎ যেন কে ডাকতে লাগলো—দাদাবাবু গো—ও দাদাবাবু—

প্রথমটায় অস্পষ্ট। তারপর যেন মনে হলো রামধনির গলা। মামা-বাবুর বুড়ো চাকর রামধনির গলার মতন। কিন্তু এত রাত্রে আমাকে কেন ডাকে। বললাম—হুঁ—

রামধনি বললে—দিদিমণি বড় রাগ করছিল আপনার ওপর, গেলেন না একবার, তাই খাবার পাঠিয়ে দিলেন—আর এই চিঠিটা—

কেমন যেন অবাক লাগতে লাগলো।

রামধনি বললে—আমার আবার অনেক কাজ পড়ে রয়েছে দাদাবাবু, যাই আজ্ঞে আমি—খাবার রইল, খাবেন কিন্তু—নইলে, দিদিমণি পই পই করে বলে দিয়েছে—

সত্যি সত্যিই আরো দু'একবার ডেকে রামধনি চলে গেল। অনেক রাত হয়ে গেছে। সে-ও ক'দিন ধরে নাগাড়ে খাটছে। তাকে আবার অনেক দূর সিটিতে ফিরে যেতে হবে এই শীতের রাতে।

তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। আলো জ্বাললাম। একটা টিফিন কৌটোতে থরে থরে লুচি পোলাও মাংস মাছ মিষ্টি যত্ন করে সাজানো। আর একটা ভাঁজ করা চিঠি। চিঠিটা খুলতেই নিচে নজরে পড়লো পুতুল দিদির নাম সই।

পুতুল দিদি লিখছে—চিরটাকাল তোমার এমনি অভিমান করেই কাটলো, তাতে লাভটা কী হলো বলতে পারো। কাল সকালে খাবারগুলো বাসি হয়ে যাবে তাই রাত্রেই রামধনিকে দিয়ে পাঠালাম। তোমার জন্যে কি মানুষকে লজ্জা-সরম সব কিছু জলাঞ্জলি দিতে বলো। এত খরচ করে ও-সাড়ি দেবার কী দরকার ছিল! তোমারও যেমন মেয়ে, আমারও তো তেমনি! আমি তো দিয়েইছি। আমার দিলেই তোমারও দেওয়া হলো। আজ রাত্রের ট্রেনেই চলে যেও না, অনেকদিন পরে এলে, দেখা করে যেও। আমার হাতে টাকা নিতেও তো তোমার বাধে, পর পর ক'বারই মনি-অর্ডার ফেরত এল। ব্যাপার কী! বুড়ো বয়সে কি আবার রাগ-অভিমান ভাঙাতে হবে নাকি! দেখবার লোক তোমার কেউ নেই, এটা মনে রেখে শরীরটার দিকে নজর রেখো,……

আত্মভুক্

চল্লিশ জোড়া চোখ একদৃষ্টে প্রমীলার দিকে চেয়ে আছে। প্রমীলা বই থেকে চোখ সরিয়ে নিজের চেহারার দিকে চোখ বুলিয়ে নিলে।

হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেল সে। একদিন ওদের মত বয়েস ছিল প্রমীলার। ওদেরই মত শাড়ীটাকে আঁটসাট করে পরে দশটা বাজতে না বাজতে এসে বসতো ফার্স্ট বেঞ্চে। তারপর কী মনোযোগ দিয়েই না পড়ানো শুনেছে টীচারদের। একে একে ইংরিজী, হিস্ট্রী আর অঙ্কের ক্লাসের পর আধ ঘণ্টা টিফিনের ঘণ্টা—তারপর আবার একে একে সমস্ত ক্লাসের শেষে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ী যাওয়া।

—বাসন্তী—

বাসন্তী ঘোষাল পেছনের বেঞ্চে বসে পাশের মেয়েটির সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করে গল্প করছে আর হাসছে। অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করে আসছিল প্রমীলা।

—বাসন্তী—

প্রমীলা আবার তাকালে। সব মেয়েরা পেছন ফিরে দেখলে। প্রমীলা যখন ওদের মত ছাত্রী ছিল, তখন এমন করে কোনওদিন টীচারদের পড়ানোর সময় গল্প করেনি।

করুক গে গল্প। লেখাপড়া করেই বা তার কী হয়েছে। হয়ত বাসন্তী ঘোষাল আর পড়বেই না কাল থেকে। হয়ত বিয়ে হয়ে যাবে আজ-কালের

মধ্যে। মস্ত বড় ঘরেই হয়ত পড়বে। বলতে গিয়েও কিছু বলা হলো না বাসন্তীকে।

বোর্ডিংএর দালানে বসে প্রমীলা তরকারী কুটছিল।

গৌরী এল। বললে—প্রমীলাদি একটা স্থখবর আছে—ওর বাবা রাজী হয়ে গেছে—

প্রমীলা মুখ তুললে। বললে—তা হলে মিষ্টি-মুখটা কবে হচ্ছে বল্—

—সত্যি প্রমীলাদি, আমি ভাবতেও পারি নি—আজ সকালবেলা ইস্কুলে গেছি তখনও জানি না, দুপুরবেলা চিঠি এসেছে—এতদিন পরে ওর বাবা মত দিলে—

—মিষ্টি-মুখটা কবে হচ্ছে শুনি—

—বা রে, ও আস্থক, ওকেই ধরো না তোমরা—শনিবার তো আসছে—

ক'মাস মাত্র গৌরী এসেছিল এ-ইস্কুলে। বড় দুঃখও নেই কোনও, বড় আশাও ছিল না কখনও হয়ত। শৈলেশকে ভালবাসা ছাড়া জীবনে আর কোনও উদ্দেশ্য ওর নেই। শেষ পর্যন্ত শৈলেশের বাবা মত দিয়েছে—এযে কত বড় স্থখবর এ শুধু গৌরীই বোঝে।

গৌরীর মত করে ক'জন স্থখী হতে পারে!

আভা তখনও ফেরে নি। ইস্কুলের পর দুটো টুইশানি করতে হয় ওকে। শীলা এতক্ষণ বোধ হয় আহ্নিক করছে ওর ঘরে। রেবা হয়ত চিঠি লিখতে বসেছে। সপ্তাহে অন্ততঃ দুটো করে চিঠি আসে রেবার নামে। এত চিঠিও ওরা দুজনে দুজনকে লিখতে পারে।

—বামুনদি'—

প্রমীলা আলাদা করে একটা বাটিতে কপির টুকরোগুলো তুলে রাখলে।

—এই রইল শীলার নিরিমিষ তরকারী—আর এই মাছের কালিয়ার

আলু কুটে দিলাম—আভার জন্যে ঝাল দিয়ে এগুলো রেঁধো—ও আবার ঝাল না হলে খেতে পারে না—জানো তো—

প্রতিদিনের খাবার দিকটা প্রমীলাকেই দেখতে হয়। ওদের সকলের বয়েস কম। বাপ-মা ভাই-বোনদের ছেড়ে এতদূর বিদেশে চাকরী করতে এসেছে। জীবনে প্রমীলা কারো স্নেহ-ভালবাসা পেলে না বলে ওদের সে-স্নেহ থেকে কেন বঞ্চিত করবে।

—শীলা, আজ নিরিমিষ কপির তরকারীটা কেমন হয়েছে রে—আমি নিজে রেঁধেছি—

—আভা, রোজ রোজ তোমার খাবার নষ্ট হয়—বড়লোক ছাত্রীর বাড়ীতে রোজ রোজ খেয়ে এলে এদিকে যে নষ্ট হয়—আগে বলে যেতে পারো না—

—গৌরী, তুই এমন রোগা হয়ে যাচ্ছিস, তোর শৈলেশ ভাববে প্রমীলাদি বুঝি ভালো করে খেতে দেয় না—ও তো জানে না শৈলেশের কথা ভেবে ভেবে রোগা হচ্ছিস—

গরমের দিনে রবিবারের দুপুরে আভা দৌড়ে এসেছে এ-ঘরে।

—প্রমীলাদি, আইস্ক্রীমওয়ালা যাচ্ছে—আইস্ক্রীম খাওয়াবে—

বামুনদিদি খবর পাঠালে মালীকে। মালী নিয়ে এল আইস্ক্রীম—

—একি, তুমি খাবে না প্রমীলাদি—

আভা রেবা গৌরী দুটো দুটো করে নিয়েছে। প্রমীলা ছ'টা আইস্-ক্রীমের দাম বার করে দিলে ব্যাগ থেকে।

—তুমি খেলে না প্রমীলাদি, তবে আমরাও খাবো না—

আভা রেবা গৌরী রাগ করলে। প্রমীলাদিই যদি না খাবে, তবে কিসের এই আনন্দ। তুমি আমি সকলে মিলে খেলেই তো মজা। এ যেন খেতে চেয়েছি বলে খাওয়ানো।

—আর যদি কখনও খাই তো কী বলেছি—গৌরী মুখ বেঁকিয়ে বললো।

—আরে না না—রাগ করিসনি তোরা—আজ শীলার একাদশী কি না—

সবাই বুঝলো। তা তো বটেই। শীলার আজ নির্জলা একাদশী, ও জলটা পর্যন্ত ছোঁয় না। এতোটুকু মেয়ে বিধবা হয়েছে বলে এ কী নিষ্ঠুর কৃচ্ছ্র সাধন। স্বামীর স্মৃতিকে হয়ত এমনি করেই চিরস্থায়ী করে রাখতে চায়। তা' সে যা' হয় হোক্—প্রমীলা শীলার এই একাদশীর দিনে কেমন করে এই বিলাসিতা করতে পারে। শীলার মা এখানে নেই—তিনি থাকলে তিনিই কি মেয়ের নির্জলা উপোসের দিনে আইস্‌ক্রীমের নিষ্প্রয়োজন বিলাসিতার প্রশ্রয় দিতেন। প্রমীলার বয়স যাই হোক—পদমর্যাদায় প্রমীলাই বা সকলের মা'র চেয়ে কম কিসে।

বোর্ডিংএর সমস্ত টীচারদের সুখ-সুবিধে স্বাচ্ছন্দ্য সব দেখতে হবে প্রমীলাকে। শুধু যে বয়েসে বড় তা' বলে নয়। বহুদিনের গুরুদায়িত্বের অভ্যাসে এটা তখন কর্তব্যে পরিণত হয়েছে। ওদিকে সেক্রেটারী রায়সাহেব যদুনাথ চৌধুরী আছেন। ইস্কুল সম্বন্ধে যা কিছু তাঁর করণীয় সব করতে হবে প্রমীলাকেই।

—এই টেক্সট্ বইগুলো পড়ে দেখো প্রমীলা, চলবে কি না—পাব্‌লিশার বড্ড ধরেছে আমাকে—

—ইস্কুলের নতুন খান পঞ্চাশেক বেঞ্চ দরকার, দেখো তো প্রমীলা এই কোটেশনগুলো—

—ইস্কুল ফাণ্ডের সেই যে ছ' হাজার টাকা পড়েছিল বাজে একটা ব্যাঙ্কে, ভাবছি ওটা তুলে নেব, চারদিকে যেমন ফেল হচ্ছে ব্যাঙ্ক—কোনটায় রাখি বলো তো—

রায়সাহেব বৃদ্ধ হয়েছেন। একদিন কী খেয়ালে একটা ছোট চালাঘরে মেয়েদের ইস্কুল করেছিলেন। পাঠশালার মতন দু'জন পণ্ডিতমশাই নিয়ে। বাঙলা দেশের বাইরে বাঙলা শেখাবার আগ্রহটা ছিল মনে মনে। রামমোহন, ভূদেব মুখুজ্যের ভক্ত ছিলেন, বড় কিছু না হোক্, ছোটখাট

একটা কীর্তি রেখে যাবেন এমন বাসনাও ছিল বোধ হয়। তাঁর সে স্বপ্ন সফল হয়েছে। বিশেষ করে বোমার হিড়িকে ছাত্রীসংখ্যা বেড়ে যায় আশাতীত। তারপর অনেকে রিটায়ার করে এখানেই বাস করছেন। এখানকার পোস্টঅফিস, রেলস্টেশন, বাজার-হাটের মত ইস্কুলটা এখন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

রায়সাহেব বলেন—এই যে, এইটিই আমার হেড-মিস্ট্রেস্—প্রমীলা, এঁকে প্রণাম করো, ইনি হলেন পুরোন বন্ধু আমার, রিটায়ার্ড সাব-জজ ইত্যাদি, ইত্যাদি।

গোলগাল মোটাসোটা বড় শরীরটা নিয়ে ছোট একটু প্রণাম করে প্রমীলা—

কোথাও সভা-সমিতি বা সম্মিলনীর আয়োজন হলে রায়সাহেব উদ্যোক্তা-দের বলেন—কমিটির মধ্যে ওঁকেও নিও, আমার হেড্-মিস্ট্রেসকে···প্রমীলা, দেবী, একজন মহিলা সভ্যা থাকা ভালো···কী বলো—

অনেক দূর দূর থেকে মেয়েদের গার্জেনরা আসেন। বিরাট সেক্রে-টারিয়েট টেব্‌লের সামনে বসে বলেন—আপনার নাম শুনেই আসা—শুনেছি এখানে শিক্ষাটা ভালো হয়—আমার মেয়েটি আবার একটু দুষ্টু কিনা—

ওই সুনামটা বজায় রাখতে প্রমীলাকে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা চারদিকে নজর রাখতে হয়। মেয়েদের খাবার জলের জায়গাটা ঢাকা রইল কি না; মেয়েদের স্বাস্থ্য ঠিক থাকছে কি না—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার দিকেও দেখতে হয়। ইস্কুলের মধ্যে মেয়েদের পান খাওয়া নিষেধ। চীৎকার, গোলমাল, জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখা, সমস্তই বারণ।

আভার সেদিন সন্ধ্যেবেলা পড়াবার কাজ নেই। এসে বললে—প্রমীলাদি গৌরী আমাদের সিনেমা দেখাচ্ছে—

—ও, বিয়ের আনন্দে বুঝি—

—না, আমরাই তো ধরেছি সবাই, রেবাটা আজ চেপে ধরেছে, হাতে

পয়সা নেই বলতে পারবে না—আজই মাইনে পেয়েছে—চলো, বা রে—শেষকালে দেখছি তোমার জন্যেই দেরী হয়ে যাবে—

রেবাও এসে গেল। নিখিলের পূজোয়-দেওয়া সাড়ীটা পরেছে আজ। আজ যেন রেবা আর ইস্কুল-মিস্ট্রেস নয়। প্রমীলা চেয়ে দেখলে। বেশ মানিয়েছে রেবাকে। কতদিন ধরে মাষ্টারী করছে রেবা। আর কতদিন ধরে অপেক্ষা করে আছে নিখিলের জন্যে। নিখিলের একটা ভালো চাকরী হলেই ও ছেড়ে দেবে এ-চাকরী। তারপর দুজনে মিলে এক জায়গায় নীড় বাঁধবে। ছোট সংসারের নিবিড় পরিবেশে দুজনে করবে স্বর্গ রচনা।

রেবা বললে—অনেকদিন পরে এ ছবিটা এল প্রমীলাদি, নিখিল লিখেছে এ বছরে একাডেমী প্রাইজ পেয়েছে ছবিটা, ওরও খুব ভালো লেগেছে—তৈরী হয়ে নাও প্রমীলাদি—গৌরী বাথরুমে ঢুকেছে—এল বলে—

প্রমীলা মৃদু হেসে বললে—কিন্তু আমি তো যেতে পারবো না রে তোদের সঙ্গে—

—কেন? বা রে, তা' হলে আমরাও······আমি বলছি প্রমীলাদি, ছবিটা তোমার ভালো লাগবেই—নিখিল লিখেছে যে···কে কে আছে জানো ছবিতে—

প্রমীলা হাসলো। বললে—বলুকগে তোর নিখিল—বরং তুলসীদাস কি মীরাবাঈ এলে দেখা যাবে—তা' হলে শীলাও যাবে আমাদের সঙ্গে···আমরা সবাই যাবো আর ও-ই একলা বোর্ডিংএ থাকবে—সে কেমন করে হয়—

শেষ পর্যন্ত হৈ হৈ করতে করতে ওরা চলে গেল।

অনেক রাত্রে প্রমীলা শীলার ঘরে গিয়ে হাজির।

—এই দেখ ক্লাস টেন্-এর মেয়েরা এমন বানান ভুল লিখেছে, আমি এদের কেমন করে পাশ করাই বলো তো প্রমীলাদি—বিশ্বাস না হয় তো নিজের চোখেই দেখ—

শীলার ধব্ধবে সাদা থানের মত বিছানার চোখ-ধাঁধানো সাদা চাদরের

ওপর প্রমীলা বসলো। শীলার কাছে শীলার বিছানার ওপর বসতেও যেন কেমন সঙ্কোচ হলো প্রমীলার। শীলাকে দেখলেই যেন কেমন চোখে ধাঁধা লেগে যায়। শীলার অকাল বৈধব্য তা'কে যেন এই ইস্কুল-মিস্ট্রেসদের বোর্ডিং-এর আবহাওয়ার মধ্যে এক অপরূপ স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে। দল বেঁধে আইস্‌ক্রীম খাওয়ার দলে সে নেই, সিনেমায় যাওয়ার পার্টিতে সে নেই। কিন্তু তবু প্রমীলাকে কেবল এই দু'টো দলের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে হয়। সংসারে বুঝি এই স্কুল ছাড়া শীলার আর কোথাও কিছু আকর্ষণ নেই। এই এক জায়গায় দু'জনের যেন অপূর্ব মিল। যখন গরমের দীর্ঘ ছুটিতে সবাই যে যার বাড়িতে চলে যায়, শীলা পড়ে থাকে এই বোর্ডিং-এ। আর থাকে প্রমীলা। একজন কুমারী আর একজন বিধবা। ইস্কুলের উন্নতির চিন্তায়, মেয়েদের মানুষ করবার মহৎ প্রেরণায় ওরা জীবন যৌবন জলাঞ্জলি দিচ্ছে—ওদের দেখে এমনি ধারণা পোষণ করাও বুঝি অন্যায় নয়।

শীলা বললে—এবার সামার ভেকেশনের সময় আমি কোচিং ক্লাস করবো প্রমীলাদি—এ-রকম হ'লে আমাদের স্কুলের যে বদনাম হবে—

সেদিন আভা বললে—জানো প্রমীলাদি—আমার টুইশ্যানি কমলো একটা—

—কেন—

বাসন্তী ঘোষালের বিয়ে। বিয়ের পর কে আর পড়ে বলো—তা' মেয়েটার ভাগ্যি ভালো, স্বামী বুঝি কোন মেজর একজন—দেখতেও চমৎকার—কলকাতায় নিজেদের বাড়ি—

আভার ত্রিরিশ টাকার টুইশ্যানি যাওয়ার চেয়ে বাসন্তী ঘোষালের বিয়ের সংবাদটাই বড় মনে হলো প্রমীলার কাছে। দেখতে বাসন্তীকে কী খুবই ভালো? লেখা-পড়ার ধার দিয়েও যেত না কখনও। এম-এ পরীক্ষার পর বি-টি দেবার সময় প্রমীলারও মনে এ কথা উদয় হয়েছিল একবার। সজে

যারা পড়তো একে একে সবাই যখন সরে পড়লো, নিজেকে তখন বিজয়িনীই মনে হয়েছিল। তারপর মোটা চশমার সঙ্গে সঙ্গে শরীরটাও মোটা হয়ে এল। পদোন্নতি হলো। প্রতিষ্ঠা হলো। সময় গড়িয়ে চললো কুটিল গতিতে। নিজেকে কৃপা করবার অবসর আর মিললো না।

রায়সাহেব ডেকে পাঠালেন সেদিন। বললেন—তুমি মা, রেবা ভাদুড়ীকেও এক মাসের ছুটির রেকমেণ্ড করেছ—ইস্কুল চলবে কেমন করে—এমনিতেই কম স্টাফ্ নিয়ে কাজ চালাতে হচ্ছে—

প্রমীলা ফাইলটা হাতে নিয়ে পাখার তলায় বসেও ঘামতে লাগলো।

—এই সেদিন গৌরী চ্যাটার্জি বিয়ের জন্যে ছুটি নিয়ে গেল, তা'ও তিন মাস হয়ে গেছে—এখনও তো এল না—আর আসবেও না বোধ হয়—

শৈলেশের বড়লোক বাবার মত হওয়াতে গৌরীর বিয়ে হয়ে গেছে। সে কেন আর এই সাতশো মাইল দূরে চাকরী করতে আসবে। ক্রমেও তা'কে বাধা দেবার কে! তারপর এই রেবা। নিখিল যে একটা চ... জুটিয়েছে। ...।

সেক্রেটারী জিজ্ঞেস করলেন—এই তো সামার ভেকেশন গেল সেদিন—বাড়ি থেকে এল সবাই—এরি মধ্যে আবার ছুটির দরকার হলো কিসে—এরও কি বিয়ে নাকি মা—

—হ্যাঁ—একটু হেসে মাথা নীচু করলে প্রমীলা।

—সে তো ভালো কথাই মা—ভালই কথা—কিন্তু···সামনে টেস্ট্ পরীক্ষা—ক্লাশ প্রমোশনের সময়—

কিন্তু সেক্রেটারীর যুক্তিটায় যেন জোর কম বলে মনে হলো। কিম্বা বিবাহিত রায়সাহেব বুঝি অবিবাহিতা হেড মিস্ট্রেসের সামনে তা' নিয়ে আলোচনা করা যুক্তিসঙ্গত মনে করলেন না।

বাইরে নিখিল দাঁড়িয়ে আছে। হেড মিস্ট্রেসের অফিসে চেয়ারে বসবার অবসরটুকুও যেন নেই তার। রেবাকে দেখবার আগ্রহে বুঝি এতই অধীর সে।

রেবা পায়ে হাত দিয়েই প্রণাম করলে। বললে—বিয়েতে যেতে চেষ্টা করো প্রমীলাদি—

মালকোঁচা করে ধুতিটা পরা। গায়ে একটা নীল সার্ট। চুল ওল্টানো। পায়ে কাবলী জুতো। রেবার বিছানার বাণ্ডিল আর স্যুটকেসটার পাশে দাঁড়িয়ে রেবার জন্যেই অপেক্ষা করছে। তারপর একটা সাইকেল-রিক্সা ডেকে দু'জনে গিয়ে ট্রেনে উঠবে। শৈলেশও একদিন ওমনি করে এসেছিল গৌরীকে নিতে। গৌরীর বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠিও এসেছিল। তারপর আভাও হয়ত একদিন চলে যাবে। অবস্থা খারাপ বলেই এতদিন চাকরি করতে হচ্ছে। কিন্তু তারপর? তারপর শীলা! শীলা আর সে।

কিন্তু এত কথা ভাববার সময় নেই প্রমীলার।

অনেক রাত হয়ে গেছে। বোর্ডিং-এর বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল সে। ...মর রাত। শুকনো আবহাওয়া। হাওয়া নেই কোথাও। আকাশের ...ক চেয়ে দেখলে। মাটি আর আকাশ যেন এদেশে এসে বন্ধ্যা হয়ে ...গেছে। অন্ততঃ প্রমীলার কাছে তাই মনে হয়। শীলার মত সর্বাঙ্গে বৈধব্যের সাজ এখানকার মাটিতে আর আকাশের গায়ে।

ছোট বাড়িতে এত ছাত্রী ধরতো না। তাই সেক্রেটারীর বাড়ির পাশে ইস্কুলের নূতন দোতলা বাড়ি তৈরী হয়েছে। ছাত্রী আরো বেড়েছে—প্রমীলার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব আরো বেড়েছে। প্রমীলা শরীরের চাপে না হোক দায়িত্বের চাপে আরো ভারি হয়েছে ইদানীং। আশে পাশের আরো অনেক শহরে নাম ছড়িয়ে পড়েছে বিলাসপুরের ইস্কুলের আর তার হেড মিস্ট্রেস প্রমীলা সরকারের।

দূর থেকে হেড মিস্ট্রেসকে আসতে দেখলে রাস্তার একপাশে সরে দাঁড়ায় ছাত্রীরা। বড় কড়া লোক এই প্রমীলা সরকার।

গার্জেনরা বলে—এই-ই তো ভালো—একটু শাসনের মধ্যে না থাকলে কি ছেলেই বলো আর মেয়েই বলো—সৎশিক্ষা পায়—

কিন্তু এত অমায়িক ব্যবহারও আবার আর কারো কাছে পায় না ছাত্রীরা।

বাবা মারা গেছে, ছ'মাসের মাইনে দিতে পারেনি, এমন ছাত্রীকে ফ্রি-শিপ্ করিয়ে দিতে আর কে পারতো। রায়সাহেব এখন বৃদ্ধ হয়েছেন আরো, নিজের ব্যবসার কাজে আরো সময় পান না—স্বাস্থ্যেও তেমন কুলায় না। প্রমীলাকেই একলা সেক্রেটারীর কাজ, স্কুল কমিটির সমস্ত কাজ দেখতে হয়। নতুন বিল্ডিং হবে তার কন্‌ট্রাক্ট দেওয়া, ইউনিভার্সিটির সঙ্গে ম্যাট্রিকে মেয়েদের পরীক্ষার সেণ্টার নিয়ে চিঠিপত্র লেখা, চাকরির য়্যাপয়েণ্টমেণ্ট করা সমস্তই করতে হয় প্রমীলাকে। সেক্রেটারী শুধু তলায় নামসই করে দিয়েই খালাস।

শীলা এল। বললে—প্রমীলাদি, আমার একমাসের ছুটি রেকমেণ্ড করতে হবে—

—ছুটি! প্রমীলা অবাক হয়ে গেল। গৌরী গেছে, রেবা গেছে। আভাও একদিন বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে চলে গিয়েছিল, আর আসেনি। ভাই নেই, সব ক'টাই বোন। ছ'টি সাতটি ছোট ছোট বোনের তদ্বির তদারক এক-কথায় বোনদের মানুষ করতে একমাত্র আভাই ছিল সকলের মাথার ওপর। এখানে যতগুলো টাকা মাস্টারি আর টুইশ্যানি করে উপায় করতো সব পাঠিয়ে দিত সংসারে। তারও একদিন চিঠি এসেছে। বিয়ে হয়ে গেছে তার। তা হ'লে শীলারও কি গোপন টান আছে কোথাও?

শীলার মুখের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলে প্রমীলা। সারা দেহে তার বৈধব্যের প্রশান্তির প্রলেপ। ও কি তবে ছদ্মবেশ! ওর ভেতরেও কি আগুন ছিল!

—প্রাইভেটে এম-এটা দেবো—তারপর যদি পারি তো বি.টি টাও—

শীলাও শেষ পর্যন্ত একদিন চলে গেল বিলাসপুরের বোর্ডিং ছেড়ে। অন্য কিছু না হোক, শিক্ষয়িত্রী হিসেবে উন্নতি করবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তারও আছে। যে একদিন পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিলাসপুরের এই স্কুলে এসে আশ্রয় নিয়েছিল, সামার ভেকেশনে বোর্ডিং ছেড়ে এক রাত্রির জন্যেও যার যাবার কোনও ঠাঁই ছিল না—সে-ই আবার ফিরে গেল যেন তার ফেলে আসা সংসারে। শীলার ট্রেনটা যখন ছেড়ে গেল, তারপরেও অনেকক্ষণ প্রমীলা সরকার বিলাসপুরের "বাণী বিদ্যায়তনের" হেড মিস্ট্রেস প্লাটফরমের ওপর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

নতুন নতুন মিস্ট্রেস, নতুন ছাত্রী, শহরে অনেক নতুন লোক এসেছে। প্রমীলা বুঝি আজকাল আরো মোটা আর ভারী হয়েছে। আরো মোটা চশমা উঠেছে চোখে। কাজ আরো বেড়েছে—সুনাম বেড়েছে ততোধিক।

সকালবেলা নিয়ম করে সেক্রেটারীর বাড়ি একবার ফাইল নিয়ে যেতে হয়। সেখানে প্রায় একঘণ্টা কাটে স্কুলের দৈনন্দিন কাজের রিপোর্ট নিয়ে আলোচনায়। তারপর তাড়াতাড়ি ফিরে এসে এগারোটার মধ্যে স্কুল।

ইতিহাসের ক্লাশে দাঁড়িয়ে প্রমীলা ছাত্রীদের দিকে চেয়ে বলতে থাকে—

"……তোমরা যখন বড় হয়ে গ্রীসের ইতিহাস পড়বে—দেখবে ট্রয় নামে এক নগরী ছিল—সেই ট্রয় নগরীতে এক বিরাট যুদ্ধ হয়……সেই যুদ্ধের সূত্রপাত সামান্য একটি নারীকে উপলক্ষ্য করে…তার নাম হেলেন…অপরূপ রূপসী সেই হেলেনের ভুবনবিজয়ী রূপই হলো গ্রীক ইতিহাসের এক রক্তাক্ত অধ্যায়—ঐতিহাসিকরা বলেন—হেলেনের রূপের আগুনেই ট্রয় নগরী নাকি পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছিল…ঠিক তারই পুনরাবৃত্তি হয়েছিল আর একবার আমাদের এই ভারতবর্ষে……পাঠান যুগে……যখন……"

সেক্রেটারী সেদিন বললেন—এবার থেকে আমাকে ছুটি দাও মা—আমি

বৃদ্ধ হয়েছি—আমার ছেলে আসছে বদলি হয়ে, এবার থেকে সে-ই সব দেখাশোনা করবে তোমার কাজ···

রায়সাহেবের একমাত্র ছেলে বহুকাল পরে বদলি হয়ে এখানে আসছে। সরকারী চাকরীতে নতুন কী একটা প্রমোশন পেয়েছে। এতদিন বাইরে বাইরে কাটিয়েছে প্রদ্যোৎ, এবার অনেক তদ্বির করে বাড়িতে আনিয়েছেন তাকে নিজের জেলায়।

রায়সাহেব কাজ বুঝিয়ে দিয়ে গ্রামের জমিদারীতে গিয়ে বিশ্রাম নিয়েছেন। প্রদ্যোৎ চৌধুরী মানুষটি ভালো। বললেন—বসুন, আমি তো কিছুই বুঝি না ও-সব—যেমন আপনি করছেন—তেমনিই করবেন, আমি শুধু···

স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীও এসেছে। সেদিন হঠাৎ ঘরে ঢুকতেই প্রমীলা চমকে উঠেছে। প্রীতি সেন। পাঁচশো মাইল দূরের বহুদিন আগের বন্ধু, ক্লাসমেট।

—একি, প্রমীলা তুই—ঝলমল্ করে উঠলো প্রীতি সেন।

—চেন নাকি এঁকে—প্রদ্যোৎ চৌধুরী স্ত্রীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে হাসলেন।

—বা রে, প্রমীলা আমাদের ক্লাশের ইটার্ণাল ফার্ষ্ট মেয়ে—

তারপর কাছে এসে একেবারে প্রমীলার হাত দু'টো ধরেছে। সেই প্রীতি সেন। লেখাপড়ায় বরাবর ছিল কাঁচা। ক্লাসে আসতো দেরীতে। একবার পরীক্ষায় নকল করার অপরাধে নাকাল হয়েছিল খুব। তবে একটা গুণও ছিল ওর। মিশুক ছিল ভারি। বাবার পয়সাও ছিল বোধ হয় বেশ। ক্লাশময় মেয়েদের রেস্টুরেণ্টে খাওয়াতো খুব।

—থাক তোমাদের কাজের কথা, তুই আয়তো প্রমীলা···আরে তুই আমাদের স্কুলের হেড মিস্ট্রেস তাকি জানি ছাই—

টানতে টানতে একেবারে নিজের খাস-কামরায় নিয়ে এসেছে প্রীতি। সেক্রেটারীর বাড়ির ভেতরে কখনও আসেনি প্রমীলা।

—আয় বোস্ এখেনে, এই কোচটায়, ফার্ণিচার টার্ণিচার কিছুই এখনও প্যাক্ খোলা হয়নি ভাই—ত্মাখ না—ড্রেসিং বুরোটা এখনও এসে পৌছুলো না, পিয়ানোটার যে কী দশা হয়েছে কে জানে—এমন অস্থবিধে হচ্ছে—

তারপর সামনে আঙুল দিয়ে দেয়ালের একটা ছবির দিকে দেখালে—ওই তো আমার বড় মেয়ে বেবি—দেরাছুনে পড়ে—ওইটুকু তো মেয়ে—তুই ওর ইংরিজী গান শুনলে হাসতে হাসতে তোর পেটে খিল্ ধরে যাবে—উনি বলেন—

উনি কী বলেন, তা আর বলা হলো না, প্রীতি মিহি গলায় ডাকলে—দায়ি—ও দায়ি—

ঝি আসতেই প্রীতি বললে—আমাদের ছু'কাপ চা খাওয়াতে পারিস দায়ি—আর ত্মাখ্, কালকে বেকারী থেকে কি কি এসেছিল নিয়ে আয়তো আমার কাছে···

অনেক কথা। অনেক হাসি। প্রীতি কথার বন্যায় একেবারে ভাসিয়ে দিলে। প্রীতিকে দেখে মনে হয়, বয়েস যেন প্রীতির অনেক কমে গেছে। এত স্থন্দরী তো ও ছিল না আগে। টেব্‌লের ওপর প্রদ্যোৎ চৌধুরী আর প্রীতির কাঁধে কাঁধ লাগানো একখানা জোড়া ফটোগ্রাফ। কোথায় কোন্ ঘটনাচক্রে এদের দু'জনের বিয়ে হলো কে জানে।

—হ্যাঁরে, কত পাস তুই এখানে ?

চা এসে গেছল। চায়ে চুমুক দিয়ে প্রীতি উঠলো। বললে—দাঁড়া আমার এ্যালবামটা তোকে দেখাই···এবার মুসৌরী গিয়েছিলাম সামারে—সেখানে গিয়ে কী কাণ্ড হলো শোন্—

প্রীতি এক মিনিট চুপ করে থাকতে জানে না।

প্রমীলা বললে—এবার উঠছি প্রীতি—

—সে কিরে, না, না, আজ ইস্কুল কামাই করে দে—তোর কথা কিছু শোনাই হলো না—

—তা ওই মাইনেতে তোর চলে— ?

প্রীতি সহানুভূতিতে এক সময়ে শান্ত হয়ে এল। বললে—তোর জন্যে ভাই আমার দুঃখু হচ্ছে···অত খেটে রাত জেগে লেখাপড়া করলি—বিয়ে-থাও হলো না—আর এখন তো যা' মোটা হয়েছিস—ভালো কথা—তোর সেই উত্তম রায় এখনও আমাকে চিঠি লেখে জানিস—আমিও ছেড়ে কথা বলি না জানিস তো—আমি তাকে বলেছিলাম······

প্রমীলা বললে—আচ্ছা, আজ তাহলে উঠি রে···

প্রীতি নিজের কথার জের টেনে বললে—আমিও উত্তমকে বলেছিলাম যে, তুমি একটা স্কাউণ্ড্রেল—প্রমীলার সঙ্গে তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছ—

সিঁড়িতে তাড়াতাড়ি নামতে নামতে বললে—ভালো করিনি, কি বলিস তুই—তোর জন্যে সত্যিই আমার দুঃখু হয় ভাই—সত্যিই তো আজ তোর এই অবস্থার জন্যে উত্তম ছাড়া আর কে দায়ী বল—ওর জন্যেই তো তুই······

দরজার কাছে এসে প্রমীলা বললে—আচ্ছা, আসি ভাই—

রাস্তায় নেমে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো সে। কিন্তু তবু প্রমীলার মনে হলো সে যেন আজ বিলাসপুরের সকলের কাছে বড় কৃপার পাত্রী হয়ে উঠেছে। শ্রদ্ধার আসন থেকে নামিয়ে সবাই আজ থেকে তাকে অনুকম্পা করছে। একটি সামান্য কারণে তার সমস্ত শিক্ষা শ্রম নিষ্ঠা ধূলিসাৎ হয়ে গেল এক নিমেষে। সে যেন আশ্রিত। নেহাৎ পৃথিবীর কোনও কোণে তার মাথা গোঁজবার জায়গা নেই বলেই এখানে সে মেয়েদের মানুষ করবার অছিলায় স্বেচ্ছানির্বাসন বরণ করেছে। আজ প্রমীলার কাছে এই কথাটাই প্রকট হয়ে উঠলো যে, তার এই হেড মিস্ট্রেস পদের কোনও গৌরবই নেই বরং লজ্জা, অপমান আর বিড়ম্বনাই কেবল সার হলো তার।

বোর্ডিংয়ে এসে মাথাটা খুব ভারি মনে হলো।

—বামুন দি—

একটা ছোট শ্লিপে এক লাইন লিখে দিয়ে বললে—এইটে মালীকে গিয়ে দাও তো বামুনদি—বলো ছোট দিদিমণির হাতে গিয়ে যেন দেয়—আর যেন বলে যে আমার শরীর খারাপ, আমি আজ স্কুলে যেতে পারবো না—

সেদিন মাথাটা আর কিছুতেই ছাড়লো না।

সেক্রেটারী সেদিন বোর্ডিং-এ এলেন। বললেন—ডাক্তারকে পাঠিয়ে দেবখন—এখন তাড়াতাড়ি ইস্কুলে যাবার দরকার নেই, আপনি বরং বিশ্রাম নিন দিন কয়েক—

দিন কয়েক বিশ্রামই নিতে হলো। কিন্তু এ বড় বিড়ম্বনা। বরং সারাদিন কাজের তাগিদে ব্যস্ত থাকা—সে এর চেয়ে অনেক ভালো। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া যায়। নিজেকে ভুলে যেতে পারা যায়। সমস্ত অতীতটা এমন মুখর হয়ে তাকে পীড়া দিতে পারে না।

শেষে একদিন গা হাত পা ঝেড়ে উঠলো। এমন করে আর ক'দিন ধরে পড়ে থাকা যায় বিছানায়। হঠাৎ বামুনদি ঘরে এসে একটা চিঠি দিয়ে গেল। নতুন সেক্রেটারীর বাড়ি থেকে এসেছে। প্রদ্যোৎ চৌধুরীর মনোগ্রাম করা খাম।

কিন্তু সেক্রেটারী নয়। লিখেছে প্রীতি।

"······শুনলাম তুই একটু ভালো আছিস······আজকে একবার বেড়াতে বেড়াতে আয় না আমাদের বাড়ীতে······উত্তম রায়ের একটা চিঠি এসেছে······তাকে লিখেছিলাম যে, তুই এখানে আছিস······সে কি লিখেছে জানিস····· যা' হোক্ তুই এলেই তোকে দেখাবোখন চিঠিটা··· আজকে যখনি সময় পাবি একবার আসিস······বুঝলি—

অপমানে ধিক্কারে প্রমীলার কালো মুখখানা বেগুনি হয়ে উঠলো।

একটা কাগজ কলম নিয়ে বিকেল বেলাই লিখতে বসলো। লম্বা একটা দরখাস্ত।

সন্ধ্যের পর সেক্রেটারী এলেন।

বেড়াবার ছড়িটা নিয়ে নীচের বসবার ঘরে বসে আছেন। প্রমীলা খবর পেয়ে নিচে নেমে এসে নমস্কার করলে—

সেক্রেটারী বললেন—লম্বা ছুটির দরখাস্ত করেছেন, কিন্তু ইস্কুলের কাজে বড় গোলমাল দেখা দিয়েছে—সেকেণ্ড টিচার সব পেরে উঠছেন না…… অবশ্য বিশ্রাম আপনার চাই স্বীকার করি……

প্রমীলা বললে—আমার ছুটিটার জরুরী দরকার ছিল—আমি কলকাতায় যাবো—

সেক্রেটারী বললেন—সেইটেই তো মুশকিল হয়েছে, আপনি ছুটিতে থাকলেও দরকারের সময় আপনার কাছে সাহায্য পাওয়া যেতো…… কিন্তু কলকাতায় চলে গেলে—

প্রমীলা চুপ করে রইল।

সেক্রেটারী বললেন—অবশ্য দরখাস্তে কিছু কারণ দেননি—বোঝা যায় বিশ্রামই দরকার আপনার—কিন্তু তবু কমিটির কাছে একটা যা' হোক কিছু কারণ……

প্রমীলা মুখ তুললে। তারপর মুখ নিচু করে বললে—আমার বিয়ে—

প্রদ্যোৎ চৌধুরী ধুতি পাঞ্জাবি পরে ছড়ি নিয়ে হয়ত সান্ধ্য-ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু ঠিক এমন ঘটনার মুখোমুখি হবেন, ভাবতে পারেন নি। তাহলে হয়ত প্রস্তুত হয়ে বেরুতেন। কিন্তু প্রমীলার মনে হলো যেন প্রদ্যোৎ চৌধুরী নয়—প্রীতি চৌধুরীকেই সে তার কথা শোনাচ্ছে।

সেক্রেটারী বললেন—কিন্তু……আমি শুনেছিলাম—

প্রমীলা শেষ করতে দিলে না। সেক্রেটারী কী বলবেন, তা যেন সে আগে থেকেই জানতো। বললে—আপনি ভুল শুনেছিলেন—

প্রমীলার এই হঠাৎ বাঙ্ময় আত্মঘোষণা প্রদ্যোৎ চৌধুরীর কাছে যেমন

আকস্মিক, তেমনই অস্বাভাবিক। তাই মুখ দিয়ে তাঁর কোনও কথাই বেরুল না।

প্রমীলাই আবার বললে—গত দশ বছরে একদিনও কামাই করিনি বা ছুটি নিইনি—ইস্কুলটা গড়ে তোলবার দিকেই মন ছিল, নিজের কথা আর ভাববার সময়ই পাইনি, কিন্তু এবার আর এড়াতে পারছি না—তা ছাড়া······উত্তেজনার চোটে আরও অনেক কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু নিজেকে সামলে নিলে।

নাটকীয় ভঙ্গিতে বলা কথাগুলো হুবহু আজই প্রীতি নিশ্চয় শুনবে। প্রদ্যোৎ চৌধুরী দরখাস্ত মঞ্জুর করে দিয়ে উঠলেন।

প্রদ্যোৎ চৌধুরীর গাড়ীটা শব্দ করে চলে যাবার পরও প্রমীলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো। তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে থমকে দাঁড়াল। তাকে এখান থেকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে কেউ আসবে না সত্যি। তাকে একলা গিয়েই ট্রেণে উঠতে হবে। তারপর? তারপর হাওড়া স্টেশনে নেমে ভাবা যাবে কোথায় উঠবে সে।

হাওড়া স্টেশনের প্লাটফরমে যখন প্রমীলা প্রথম এসে নেমেছিল সেদিনও সে জানতো না যে, শেষ পর্যন্ত এখানে এসেই আশ্রয় মিলবে তার।

বউবাজারে একটা গলির মধ্যে নোনাধরা ইটের পুরোন বাড়িটাতে এতদিন কাটলো কেমন করে, একথা প্রমীলা নিজেই ভাবতে পারে না।

ইন্দু-মাসিমা অনেক দেরি করে বাড়ি আসেন। সারাদিন ইস্কুলে পড়ানোর পর চলে যান ছাত্রীদের বাড়ি। একটা, দুটো, তিনটে জায়গায় টুইশ্যানি সেরে ফিরতে একটু দেরি হয়। বিধবা মানুষ। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার বালাই নেই।

ইন্দু-মাসিমা বলেন—হ্যাঁরে প্রমীলা—কী ঠিক করলি—

জমানো কিছু টাকা সঙ্গে এনেছিল প্রমীলা। বিলাসপুরে বিশেষ খরচ

ছিল না—কিছু টাকা জমেছিল। তাও এমন কিছুই নয়। বসে খেলে কুবেরের ভাঁড়ারও শেষ হতে কতক্ষণ লাগে।

প্রমীলা বলে—ভাবছি আর ফিরে যাবো না মাসিমা—এখানেই একটা চাকরি টাকরি কিছু জোগাড় করে দিন।

ইন্দু-মাসিমা এসেছিলেন হাওড়া স্টেশনে কোন্ ছাত্রীদের ট্রেণে তুলে দিতে। সেইখানেই দেখা। সাত আট দিন থাকবে সেই রকম ঠিক ছিল—তার বদলে সাত মাস হয়ে গেল।

রান্না-বান্না করে ইন্দু-মাসীমা দশটার মধ্যেই বেরিয়ে যান। তারপর প্রমীলাও বেরিয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে অনেকগুলো জায়গায় দেখা করাও হয়ে গেছে। দরখাস্তও পাঠিয়েছে অনেক জায়গায়।

প্রীতি চিঠি লিখেছে—তোর বিয়ের খবর শুনে খুব সন্তুষ্ট হলাম—আগে জানালে যেতাম—কবে আসছিস—দুজনে আসিস—আলাপ করবো—

সেক্রেটারীও একটা চিঠি লিখেছেন—হেড মিস্ট্রেসের পদটা এখনও খালি রাখাই হয়েছে—প্রমীলার কাছ থেকে সঠিক জবাব পেলে অন্য ব্যবস্থা করবেন—

প্রমীলা অনেক গর্ব করে চলে এসেছিল বিলাসপুর থেকে—আবার সে কেমন করে সেখানেই ফিরে যাবে।

গৌরী চিঠি দিয়েছে—প্রমীলাদি, বিয়েতে তো তুমি এলে না…… দীপুর অন্নপ্রাশনে নিশ্চয় আসতে চেষ্টা করবে—যদি একান্তই না আসতে পারো—তোমার আশীর্বাদ পাঠিয়ে দিও—

রেবারা বদলি হয়ে গেছে জব্বলপুরে। নতুন জায়গার বিবরণ জানিয়ে চিঠি দিয়েছে রেবা। নিখিলের নাকি আর একটা প্রমোশন হয়েছে চাকরীতে।

আভাও ভাল আছে। বিজয়ার নমস্কার জানিয়ে লেখা চিঠিটা এতদিন পরে হাতে এল। সব চিঠিগুলোই বিলাসপুরের পোস্ট অফিসে ঘুরে এখানে এসেছে।

আস্তে আস্তে সব টাকাগুলো প্রায় ফুরিয়ে এল। অথচ কোনও কিছুর ব্যবস্থা হলো না।

ইন্দু-মাসীমা সেদিন আরো ভাবিয়ে দিলেন—

—ওরে প্রমীলা, খুব মুশকিল হয়েছে রে—আমার চাকরি বোধ হয় গেল—

—কী রকম—প্রমীলা ভাবনায় পড়ে গেল।

—এবার রিটায়ার করতে বলছে আমাকে—বলছে, অনেক বয়েস হলো এবার বিশ্রাম নিন—ছাখ্ তো মা, আমার না-আছে সংসার, না-আছে কেউ—সারা জীবন ওই ইস্কুল নিয়েই রইলুম—শেষে কি না······

তা' ইন্দু-মাসীমার তেমন ভাবনা নেই। চাকরি গেলেও ছাত্রীরা ইন্দু-মাসীমাকে সবাই ভালবাসে। পুরোন ছাত্রীদের কত বড় বড় ঘরে বিয়ে হয়েছে—যার কাছে গিয়ে দাঁড়াবেন, সে-ই মাথায় তুলে রাখবে—

কিন্তু প্রমীলার নিজের ভাবনাটাই বাড়লো সেইদিন থেকে।

একদিন ইন্দু-মাসীমা বললেন—হ্যাঁরে, এমনি করে কাটিয়ে দিলি—বিয়ে থা-ও করলি নি—

মাসীমা নিজের মায়ের মতন। তাঁর কাছে লজ্জা নেই। ঠাণ্ডা মেঝের ওপর শুয়ে শুয়ে গল্প করছিল প্রমীলা। হারিকেনটা নেভানো। অন্ধকার ঘর। প্রমীলা বললে—করলুম না নয় মাসীমা—হলো না—

সেদিন আর এক কাণ্ড ঘটে গেল। এমন করে দেখা হবে ভাবা যায়নি।

—প্রমীলাদি—

হ্যারিসন রোড আর কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে······

সে-ই আর পাশে আর একটি স্যুট পরা লোক। শীলার পরনে শাড়ী—সিঁথিতে সিঁদুর—

—তোমার সঙ্গে এমন করে দেখা হবে, ভাবিনি প্রমীলাদি—কবে এলে বিলাসপুর থেকে—

যেন শীলার সঙ্গে এমনভাবে দেখা হবে তা প্রমীলাই ভাবতে পেরেছিল!

—জানো প্রমীলাদি, লেক কলেজে প্রফেসারি করছি আজকাল—

তারপর যাবার সময় বললে—এঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই প্রমীলাদি—

রাত্রে বাড়ী এসে প্রমীলা বললে—ইন্দু-মাসীমা কাল সকালবেলা ট্রেণ—

—সে কি—কোথায় চললি তুই—ইন্দু-মাসীমা অবাক হয়ে গেলেন—

—রাজপুতানা—

এত জায়গা থাকতে রাজপুতানার নাম মুখ দিয়ে কেন বেরুল, কে জানে। ইতিহাসের পাতায় তো আরো অনেক দেশের নাম আছে। কিন্তু শীলার সিঁথির ওপর সিঁদুরের শিখাটা তখনও যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে। প্রমীলার মনে পড়লো রাজপুতানার মেয়েরাই তো জহর ব্রত করতো—ইতিহাসে লেখা আছে।

সেক্রেটারী প্রদ্যোৎ যথারীতি সকালবেলা নিজের অফিস ঘরে বসেছিলেন। হঠাৎ সামনে যেন ভূত দেখলেন। কিম্বা দেখলেও বুঝি লোকে এত চমকায় না।

—এ কি—এর বেশি কিছু মুখ দিয়ে বেরুল না তাঁর।

—বসুন—

প্রমীলা বসলো। বললে—আপনি লিখেছিলেন—তাই আবার আমি এলাম—

—ভালোই করেছেন—কিন্তু···বেশী কিছু বলতে পারলেন না প্রদ্যোৎ চৌধুরী—

খবর পেয়ে ঝল্‌মল্ করে দৌড়ে এল প্রীতি। ঘরে ঢুকে সেও পাথরের মত নিশ্চল হয়ে গেছে। প্রমীলার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে কী যে সে বলবে

বুঝতে পারলে না। তারপর সামনে এগিয়ে এসে প্রমীলার হাত দু'টো ধরলে।

প্রীতির চোখ দিয়ে জল পড়ছে। বললে—কী করে হলো ভাই—

প্রীতি প্রমীলাকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো। বললে—কী করে হলো ভাই—

—হঠাৎ হলো—কিছু টের পাইনি—প্রমীলা মাথা উঁচু করে বললে।

প্রমীলা আবার বলতে লাগলো—অমন স্বাস্থ্য—অমন লম্বা চওড়া চেহারা—কিছুতেই ভাবতে পারিনি—দশ বছরে একদিনের জন্যে একটু মাথা ধরারও খবর পাইনি—সেই লোক কিনা······

বলতে বলতে প্রমীলা মাথা নীচু করলে।

প্রীতি জিজ্ঞেস করলে—ডাক্তারেরা কী বললে—

—ডাক্তারেরা আর কী বলবে—কোনো ডাক্তার আর বাকি ছিল না ডাকতে—সাতদিনে সর্বস্ব খুইয়ে ফতুর হয়ে গেলাম—

বোর্ডিং-এ এসে প্রমীলা আবার তার পুরোন ঘরটায় গিয়ে ঢুকলো।

সাদা থান, সাদা সেমিজ, পায়ে সাদা কেড্‌স্‌। পুরোন ছাত্রীরা সবাই এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। ভালোই আছে। এবার আর কেউ তো কৃপা করবে না, অনুকম্পা করবে না—সমস্ত সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া গেল। ক্লাশে দাঁড়িয়ে প্রমীলা পড়ায়—

"······তোমরা যখন বড় হয়ে গ্রীসের ইতিহাস পড়বে দেখবে ট্রয় নামে এক নগরী ছিল—সেই ট্রয় নগরীতে এক বিরাট যুদ্ধ হয়—সেই যুদ্ধের সূত্রপাত সামান্য একটি নারীকে উপলক্ষ্য করে···তার নাম হেলেন··· অপরূপ রূপসী হেলেনের ভুবনবিজয়ী রূপই হলো গ্রীক ইতিহাসের এক রক্তাক্ত অধ্যায়···ঐতিহাসিকরা বলেন, হেলেনের রূপের আগুনেই নাকি ট্রয়

নগরী পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছিল···ঠিক তেমনি ঘটনা ঘটেছিল আমাদের দেশে—এই ভারতবর্ষে···আলাউদ্দিন খিলজী পদ্মিনীর রূপে উন্মাদ হয়ে চিতোর রাজ্য আক্রমণ করলে···কিন্তু পদ্মিনী···ঐতিহাসিকরা বলেন··· পদ্মিনীর সেদিনকার আত্মত্যাগের ফলে দেশকে শত্রুর অত্যাচার থেকে তিনি বাঁচাতে পারেন নি, কিন্তু তিনি তাঁর আত্মসম্মান রক্ষা করেছিলেন— পদ্মিনী সেদিন জহর-ব্রত করেছিলেন—জহর-ব্রত কা'কে বলে জানো··· তুমি জানো···অনুপমা তুমি জানো···উৎপলা তুমি—ইলা তুমি···তুমি··· তুমি···তুমি···তুমি···তুমি···"

উত্তেজনায় প্রমীলার কণ্ঠস্বর ক্রমে পর্দায় পর্দায় উঁচু থেকে আরো উঁচুতে উঠতে লাগলো।

প্রাণতোষ সরকারকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত গল্প লিখতে হবে এ-কথা কে ভেবেছিল! অতি সাধারণ বৈচিত্র্যহীন জীবন। চিরকুমার প্রাণতোষ চিরকাল নিজের স্বাস্থ্য নিয়েই বিব্রত জানতাম। পান, সিগ্রেট, চা, কলের জল, মদ সজ্ঞানে কখনও খাননি। নিয়ম করে সকাল সাড়ে নটার সময় ভাত খেয়ে নিয়ে ধুতি-পাঞ্জাবী পরে কাঠের চেয়ারে বসে ইংরিজী খবরের কাগজের সম্পাদকীয় বা উপনিষদ ও তার টীকা পাঠ করেছেন বিকেল পর্যন্ত। বড় জোর বাড়িভাড়ার বিলগুলো ফাইলে সাজিয়ে রেখেছেন মাসিক ক্রমানুসারে। তারপর ট্রামের মান্থ্লিটা নিয়ে বেড়াতে গিয়েছেন চৌরঙ্গীর সামনের ময়দানের খোলা হাওয়ায় হাতে ছাতি নিয়ে। সন্ধ্যে সাতটার আগে বাড়ি ফিরে এসে সকাল বেলার পড়া খবরের কাগজটাই আবার পড়েছেন। পাঞ্জাবীর ভাঁজ কখনও ভাঙতে দেখিনি। ধুতির কোঁচা কখনও এলোমেলো হতে দেখিনি। ফিতে বাঁধা জুতো মোজাহীন পায়ে পরতে দেখিনি কখনও। বরাবর মনে হয়েছে, নিখুঁত নিরেট জীবন প্রাণতোষের। কোথাও কোনও অপব্যয় নেই। আবার অত বড়লোক হয়েও কোনও বাহুল্য নেই কোথাও—একমাত্র ওই বাড়িভাড়ার আয়টি ছাড়া।

প্রাণতোষ এম-এ বি-এল পাশ করেছিলেন ছাত্রজীবনে।

একদিন বলেছিলাম—আর লেখাপড়া করলেন না কেন? অন্ততঃ পি-আর-এস্টা…

প্রাণতোষ বলেছিলেন—না, ওটা বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যায়—

ওই বাড়াবাড়িব ভয়েই প্রাণতোষ কিছু করেন নি জীবনে। যে-লোক পয়সার অভাব জানেননি, ছাত্রও ভাল ছিলেন, যাঁর চাকরি করারও দরকার হয় নি, তাঁর পক্ষে সমস্ত কিছুই করা সম্ভব। অন্ততঃ বিলেতটা ঘুরে এলেও হয়। একটা রাজনৈতিক দল না হোক্, যে কোনও একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিলেও হয়। অথচ কৃপণ বলা চলবে না প্রাণতোষকে। খাওয়া-দাওয়াতে বাহুল্য না থাক, সুরুচি আছে—বিচার আছে।

একদিন বললেন—রুই মাছের মুড়ো ভালো জিনিস, কিন্তু বড় তেল টানে। বাঙালীদের রান্নার ওই তো দোষ, পেটের গোলমাল ওই জন্যেই এদেশে এত বেশী···

তারপর বললেন—সাহেব বেটাদের কি সাধে অমন স্বাস্থ্য! আপনি আস্ত একটা মুর্গীর রোস্ট খান, দিব্যি হজম হয়ে যাবে, কিন্তু মাছের একটা মুড়ো খেলেই পেটটা ভুট্‌ভাট্‌ ভাট্‌ভুট্‌···

আশ্বিন-কার্তিকের মাঝামাঝি থেকে ফাল্গুন মাসের গোড়া পর্যন্ত ভোর বেলা বেড়াতে যান লেকের ধারে, প্রতি বছর এমনি। বেড়ানো মানে হাঁটা নয়। রীতিমত স্বাস্থ্যসঞ্চয়ের ব্যাপার। বুকটা চিতিয়ে দেন। মাথাটা সোজা। পায়ে কেড্‌স্। লম্বা লম্বা শ্বাস টানতে টানতে চলেন। বাড়িতে ফিরে এসেই ঠাণ্ডা এক গ্লাস জল।

বলেন—হাঁটি কি আর মাস্‌ল্ করবার জন্যে ? ও শুধু পেটের জন্যে,—ওতে হজমশক্তিটা বাড়ে। আর ওই যে ঠাণ্ডা এক গ্লাস জল খেলাম, ওটা কী জন্যে বলুন তো অবনীবাবু—

আমি স্বাস্থ্যবিশারদ নই, সুতরাং আমার সেটা জানার কথা নয়।

প্রাণতোষ সরকার বলেন—আপনাদের বয়েস কম, রক্তেব তেজ আছে, বে-পরোয়া। কিন্তু আমার মতন বাহান্নর ধাক্কায় পৌঁছন, তখনই দেখবেন, পেটটা ঠিক কাজ করছে না—সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে খিদে পাবে

না—রাত্তির ন'টা বাজতে চললো, অথচ ক্ষিদে পাচ্ছে না—সে কী যন্ত্রণা বলুন তো? সারা পেটময় কেবল বায়ু ভর্তি মনে হবে—

বললেন—এই যে পেট দেখছেন, নাভি-কুণ্ডলী থেকে এক বিঘৎ রেডিয়াস্ পর্যন্ত এই যে এরিয়া, এটি যদি ভালো থাকে তো আপনার ব্রেন বলুন, হার্ট বলুন……

একদিন খুব সকালে গেছি প্রাণতোষ সরকারের বাড়ী। তখন তাঁর ঠাণ্ডা জল, ছাগলের দুধ, কমলা নেবু, মধু—সব খাওয়া হয়ে যাওয়ার কথা।

আমাকে বসিয়ে চীৎকার করে ডাকলেন—মথুরা, ও মথুরা প্লেটটা নিয়ে আয় বাবা—

প্লেট! অবশ্য কথা ছিল আমার আসবার। এক প্লেট রেখে দিয়েছেন হয়ত। হয়ত কালকে অতিথি-অভ্যাগত কেউ এসেছিলেন, তা'র থেকে এক প্লেট খাবার বাঁচিয়ে রেখে দিয়েছেন আমি আসবো বলে।

কিন্তু মথুরা এল একটা এক্স-রে'র নেগেটিভ্ প্লেট নিয়ে।

প্রাণতোষ বললেন,—এই দেখুন, এই জানালার ধারে আলোতে আসুন—এই যে দেখছেন পাকস্থলী, আর পাকস্থলীর ওপরে এই যে খাদ্যনালী—এই খাদ্যনালী দিয়ে…

আমি কিছুই দেখতে পেলাম না। শুধু দেখতে লাগলাম প্রাণতোষ সরকারের চর্মহীন অস্থিসার কঙ্কাল,—যে মানুষটাকে আমি চিনি জানি, যে শুধু নিজের স্বাস্থ্যটা নিয়েই দিনরাত বিব্রত। প্রাণতোষ সরকারের স্বাস্থ্য যে খারাপ, তা' নয়। কিন্তু প্রচুর যাঁর অর্থ, ছেলেপুলে সংসার কোনও কিছুর চিন্তাই যাঁর নেই, কী নিয়ে থাকবেন তিনি! আমার বরাবর মনে হয়েছে, কিছু একটা অবলম্বন নেই বলেই প্রাণতোষ সরকারের এই স্বাস্থ্যচিন্তা। যে-টা বাতিক বলে মনে হয়েছে আমার! কিন্তু সে যে কত বড় ভুল, তা' সেদিন বুঝলাম। নইলে প্রাণতোষ সরকারকে নিয়ে যে শেষ পর্যন্ত আজ গল্প লিখতে হবে, একথা কে ভেবেছিল!

আজ প্রাণতোষ সরকারের পুরোন সব কথা মনে পড়ছে আমার। তাঁর সমস্ত কথা আজ অন্য অর্থে আমার সামনে ধরা দিচ্ছে।

প্রাণতোষ সরকার একদিন বলেছিলেন—আপনারা গল্প লিখতে যান কেন অবনীবাবু? আপনাদের অর্থাৎ বাঙালীদের অভিজ্ঞতাই বা কতটুকু, কটা দেশই বা দেখেছেন? এক শরৎ চাটুজ্যের যা' কিছু······

তারপর বললেন—এই দেখুন না আমার কথা, পূজোর সময় পশ্চিমে গেলেই হয়—

বললাম—সত্যিই তো, যান না কেন? আপনারাই যদি না যাবেন তো যাবে কে—

—যাবো কি করে? ট্রেণে চড়ে ওই বাজে জল আর খাবার খেয়েই পেটটা খারাপ হয়ে যাক্ আর কি—কলের জল খেলেই যে চোঁয়া ঢেকুর ওঠে। তারপর ট্রেণে ওঠা মানেই অনিয়ম—ওই পেটের গোলমালের জন্যেই তো বাঙলা দেশে আজো একটা ভালো সাহিত্যিক জন্মালো না—

—কেন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ—

—বঙ্কিমচন্দ্রের কথা ছেড়ে দিন মশাই, তাঁরা সেকালের মানুষ, খাঁটি দুধ-ঘি খেয়েছেন,—টাট্‌কা তরিতরকারি মাছ মাংস খেয়েছেন। আর তখন যে আপনাদের ওই কলের জল ছিল না মশাই—আর রবীন্দ্রনাথের ব্যাপার আলাদা। ক'দিনই বা থাকতেন কলকাতায়—হয় পদ্মার চরের খোলা হাওয়ায়, নয়ত রাঁচির পাহাড়ে, নয়ত বিলেতের······

মাসের শেষে প্রচুর বাড়িভাড়ার আয়, তারপর বাপের একমাত্র ছেলে, বিরাট সম্পত্তি, শহরের ভেতরে নিজেদের বাড়ি,—মানুষের সংসারে আর কী চাই? তাই বরাবর আমার মনে হতো, প্রাণতোষ সরকারকে নিয়ে যাই কিছু করা যাক্, গল্প লেখা চলে না। এমন নীরস নির্ভেজাল বৈচিত্র্যহীন জীবন কখনও গল্পের উপাদান হতে পারে না।

কিন্তু ভুল ভাঙিয়ে দিলেন প্রভাবতী। প্রভাবতী বসু।

প্রভাবতী বসুকেই কি আগে চিনতাম? অথচ কতদিন ধরে প্রাণতোষ সরকারকে চিনে এসেছি!

দরখাস্তটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে প্রভাবতী সঙ্গে একটা চিঠি দিলেন হাতে। চিঠিটা প্রাণতোষ সরকারের লেখা। প্রভাবতীর বয়েস কত হবে? এই চল্লিশ কি বিয়াল্লিশ। অপূর্ব স্বাস্থ্য! ঠিক যেন প্রাণতোষ সরকারের বিপরীত। উজ্জল ফরসা গায়ের রং। চোখ দুটো ভাসাভাসা। সরু কাল পাড়ের কাঁচি ধুতিটা গায়ে সমুদ্রের ফেনার মত সাদা ব্লাউজের ওপর জড়ানো। এতখানি স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্যের প্রাচুর্য যেন অনেক দিন দেখিনি। কী জানি কেন, অনেক দিন পরে চোখ যেন জুড়িয়ে গেল।

বসতে বললাম।

সাদা ধবধবে ডিমাই কাগজে গোটা গোটা ইংরিজী অক্ষরে দরখাস্তটি লেখা। প্রাইভেটে ম্যাট্রিক থেকে সুরু করে, আই-এ পাশ করে, ডিস্টিংশন নিয়ে বি-এ পাশ করেছেন দু'বছর আগে। অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলেন। সাংসারিক অভাবের কথাও দরখাস্তের এক জায়গায় ছোট করে লেখা আছে। তবে ইস্কুলে পড়ানোর অভিজ্ঞতা কিছুই নেই। আগে কখনও কোথাও চাকরি করেন নি।

প্রাণতোষ সরকারের লেখা সঙ্গের চিঠিটাও খুললাম।

বন্ধুর কাছে বন্ধুর চিঠি। প্রভাবতীর চাকরি হলে প্রাণতোষ সরকার খুবই সুখী হন,—এই কথাটাই চিঠিটার দু'-তিনটে লাইনে বলা হয়েছে।

জিজ্ঞেস করলাম—প্রাণতোষ সরকারকে আপনি চিনলেন কি করে?

—তিনি আমার আত্মীয় হন। প্রভাবতী স্পষ্ট গলায় উত্তর দিলেন।

—কী রকম আত্মীয়?—আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম।

কারণ প্রাণতোষ সরকারের কোন আত্মীয় বা আত্মীয়ার কথা কখনও শুনিনি। প্রাণতোষ সরকারের আপন জন বলতে সংসারে অতিবৃদ্ধ বাবা—প্রায় বিরাশি বছর বয়স তাঁর। আর তাঁর মা। না আছে কোনও

বোন, আর না আছে কোনও ভাই। হাজরা রোডের মোড় থেকে স্থরু করে কালীঘাট লেন-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত দু' পাশের প্রায় সবগুলো বাড়িই ওঁদের। সমস্ত বাড়ির উত্তরাধিকারী একমাত্র প্রাণতোষ সরকার। বরাবর তাই জানি।

আমার কথার উত্তরে প্রভাবতী বললেন—প্রাণতোষ সরকার আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয় হন—

কথাটা আমার ঠিক মনঃপূত হলো না। বললাম—আজ তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হবে?

প্রভাবতী বললেন—হ্যাঁ, আমরা তো একই বাড়িতে থাকি—

বললাম—তা' হলে ভালোই হলো, আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে বলবেন প্রাণতোষ বাবুকে—

প্রভাবতী চলে গেলেন। কিন্তু মন থেকে চিন্তা গেল না। প্রভাবতীর কথা তো কখনও শুনিনি প্রাণতোষ সরকারের কাছে!

•

ইজিচেয়ারে হেলান্ দিয়ে মাথাটা এলিয়ে দিলাম পেছনে। হঠাৎ নজরে পড়লো একটা রঙিন প্রজাপতি সূর্যের আলো মেখে আমার ঘরের দেয়ালের কোণে এসে বসেছে। বাইরের উপদ্রব থেকে নিরাপদ আশ্রয়ে এসে বুঝি মৃদু মৃদু পাখা নাড়ছে।

পরদিন প্রাণতোষ সরকার সন্ধ্যেবেলা বেড়িয়ে ফেরার পথে এলেন। সেই সিল্কের মোজার ওপর ফিতে বাঁধা জুতো পায়ে, গায়ের পাঞ্জাবীটি নির্ভাঁজ, হাতে ছাতা। মাথার চুল স্থবিন্যস্ত। দাড়িটি নিখুঁতভাবে কামানো। বাহান্ন বছর বয়সের, ভিটামিন আর খোলা হাওয়া-খাওয়া চেহারা।

বেশীক্ষণ বসেন না কোথাও। তবু বসেই বললেন—বেশীক্ষণ বসবো না—তারপর, প্রভার কাছে শুনছিলাম সব—দিন ওর একটা চাকরি করে,

অবনীবাবু। বেচারী ছেলেমেয়ে নিয়ে বড কষ্টে আছে। যা বাজার পড়েছে আজকাল।

বললাম—প্রভাবতী বসু, ও কি আপনার কেউ হয় নাকি ?

—হবে আবার কে ? প্রাণতোষ সরকার বললেন—আপনিও যেমন, আমি আমার নিজের পেটটা নিয়েই দিনরাত ব্যস্ত। কিছুতেই আর শরীরটাকে জুৎ করতে পারছিনে মশাই, দেখুন না—কাল তো সোমবার ছিল, সোমবার দিনটায় বরাবর উপোস করি,—বিকেল বেলা একটু মুগ ভিজোনো আর একটা কচি নেয়াপাতি ডাব খেয়েছি। তা' ডাবটায় আধ সের টাক্ জল ছিল—সেইটুকু কেবল খেয়েছি। আর, আজ ভোর চারটের সময় রোজ নিয়মমত যেমন উঠি, তেমনি উঠেছি, দেখি পেট একেবারে আই-ঢাই করছে—স্রেফ বায়ু—ভরপেট বায়ু—দম আটকে আসে আর কি ! আজ সকাল বেলা দই দিয়ে চারটিখানি ভাত পাতিনেবুর রসে বেশ করে চট্‌কে—তা' থাকগে বাজে কথা, কি বলছিলাম ভুলে গেলাম······

বললাম—প্রভাবতী বসু কি আপনার দূর সম্পর্কের কোনো বোন-টোন্—

প্রাণতোষ সরকার বললেন—আরে না, না—আপনিও যেমন······হ্যাঁ তা' বোনই বলতে পারেন একরকম, আমাকে দাদা বলেই তো ডাকে প্রভা—সুবল আর মিনি—ওর ছেলে মেয়েরা আমাকে মামা বলেই ডাকে, সুতরাং দাদাই বটে। আসলে গলগ্রহই বলতে পারেন—আজ চোদ্দ বছর তো আমারই গলগ্রহ কি না। কিন্তু এবার প্রভাও হাঁফিয়ে উঠেছে, আমিও হাঁফিয়ে উঠেছি মশাই। মেয়েটা বোর্ডিং-এ থেকে পড়ে, সুবল আসছে বার ম্যাট্রিক দেবে, প্রভাকেও নিজে পড়িয়ে প্রাইভেটে বি-এ পাশ করিয়ে দিলাম। আর কী বলুন—মানুষ আর কী করতে পারে—একজন অনাথা অনাত্মীয়া বিধবার জন্যে ?······

বললাম—আসছে মাসের প্রথম দিকে কমিটির মিটিং আছে—আমি

প্রভাবতীর দরখাস্তটা সেই সময়ে পেশ করবো-তা’ হলে। তা’ ছাড়া আমার একলার তো হাত নেই—সেক্রেটারী আছেন—কমিটির অন্য মেম্বাররা আছেন—

প্রাণতোষ সরকার বললেন—না, না, তা বললে শুনবো না অবনীবাবু, ও আপনাকে করে দিতেই হবে—যা’ হা’ করলে প্রভার চাকরিটা হয়, তা আপনাকে করতেই হবে। অবিশ্যি আমার নিজের কেউ-ই নয় ওরা, তবু একটা অনাথা অনাত্মীয়া বিধবার যদি একটা উপকার হয়, আর আমার ঘাড় থেকেও একটা বোঝা নামে মশাই—চোদ্দ বছর পরে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি তা’হলে—

প্রাণতোষ সরকার চলে গেলেন।

কিন্তু কয়েক দিন পরে প্রভাবতী বসু আবার একদিন এলেন। ভালো করে চেয়ে দেখলাম সেদিন। চোদ্দ বছর প্রাণতোষ সরকারের গলগ্রহ। অনাথা বিধবা। দু’টি নাবালক ছেলে মেয়ে তার। কিন্তু প্রভাবতীকে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। ওসব কথা মনেই আসে না। দুঃখ-দারিদ্র্যের ছাপ চেহারায় কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না—এমনি তার নিটোল স্বাস্থ্য, এমনি তার রূপ!

বসে বললে—দাদা আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন, আমার চাকরিটার কতদূর কী হলো—

তারপর খানিক পরে বললে—আপনি তো সবই শুনেছেন দাদার কাছে, আজ চোদ্দ বছর ওঁর অন্নে রয়েছি—এই বাজারে দু’টি ছেলে মেয়ের খাওয়া-পরা-লেখাপড়ার খরচ। আমার খাওয়া-পরা, বি-এ পাশ করার খরচও—সমস্তই উনি দিয়ে আসছেন, কিন্তু আর এখন লজ্জা করছে, এতদিন যা’ নিয়েছি নিয়েছি—কিন্তু ঋণের বোঝা আর বাড়াতে চাইনে—

বললাম—ওঁর ওখানে মেয়ে নিয়ে আপনার কিছু অসুবিধে হচ্ছে না তো?

প্রভাবতী বসু বললেন—ছি ছি, অমন কথা যেন কখনও স্বপ্নেও না ভাবি—

চোখ দু'টো ছল ছল করে উঠলো প্রভাবতীর। বললে—মানুষ যে মানুষের এমন নিঃস্বার্থ উপকার করতে পারে, একথা দাদাকে না দেখলে জানতেই পারতাম না। সাতাশ বছর বয়েসে বিধবা হলাম, তখন আমার মেয়ের বয়েস তিন বছর, আর খোকা সবে এক বছরের। তারপর এই চোদ্দ বছর দাদা যে কী করে আমাদের তিনজনকে আগ্‌লে আগ্‌লে এসেছেন—তা'...তা' ছাড়া উনি মানুষ নন, দেবতা বললেও যেন কম বলা হয়—

প্রভাবতীর কথার একবর্ণও মিথ্যে নয়, একথা প্রাণতোষের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা জানে। প্রাণতোষ যে নিষ্কলুষ, পূত-চরিত্র, আজীবন ব্রহ্মচারী—সে সম্বন্ধে কারোর দ্বিমত নেই। প্রাণতোষের চরিত্রে যদি কোনও দোষ থাকে তো সে-দোষ তাঁর চরিত্রের অতি পবিত্রতা। সত্যবাদিতার এমন প্রতিমূর্তি যুদ্ধোত্তর যুগে বিরল শুধু নয়, দুর্লভ। তাই কতবার আমাদের বন্ধুমহলে ওঁকে বর্তমান যুগের বেখাপ্পা মানুষ বলে মত প্রকাশ করেছি। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যেটা ওঁর অতি-সাবধানতা, সেটা তো একটা বাতিক মাত্র। আর কিছু নয়। এত অর্থের মালিক হয়েও প্রাণতোষের শোবার ঘরে গিয়ে দেখেছি, একটা সেগুন কাঠের তক্তাপোষের ওপর খালি একটা পাতলা তোষকের ওপর রঙিন সুজনি পাতা।

প্রাণতোষ সরকার বলেন—বেশী নরম বিছানায় শুয়ে শুয়েই তো বাঙালী-বাবুদের ওই পেট-গরমের ধাত—

প্রভাবতী বললে—দাদা যদি আমাদের না দেখতেন, আমরা যে কোথায় তলিয়ে যেতাম, জানি না। বাপের বাড়ী, শ্বশুর বাড়ী—কোনও দিকেই কেউ তো ভার নিলে না, অথচ স্বামী বেঁচে থাকতে আসা-যাওয়াও ছিল, দেওয়া-থোওয়াও ছিল; কিন্তু বিপদের দিনে দেখলে না কেউ। তাই ভাবি……

প্রভাবতী নিজের দুঃখের কাহিনী সমস্তই বলে গেল। প্রাণতোষ সরকার সেদিন না থাকলে সাতাশ বছর বয়সের অনাথা যুবতী বিধবা দু'টি নাবালক ছেলে-মেয়ে নিয়ে মানুষের ভিড়ে হারিয়েই যেত বোধ হয়। সেই কাহিনী শুনতে লাগলাম বসে বসে। চোখের সামনে দেখতে পেলাম সেদিনকার সাতাশ বছর বয়সের প্রভাবতী আর সাঁইত্রিশ বছর বয়সের প্রাণতোষ সরকারকে! সেদিন সেই যৌবন-মধ্যাহ্নে একজন বিধবা আর একজন অবিবাহিত অনাত্মীয় যুবকের সেই অনাবিল স্নেহের সম্পর্ক। প্রাণতোষ সরকারকে আমার চোখের সামনে যেন আরো সুস্পষ্ট করে চিত্রিত করে তুললে।

প্রভাবতী চলে যাবার পর সমস্ত দিন সে-কাহিনী আমার মনের মধ্যে গুঞ্জন করতে লাগলো।

চোদ্দ বছর আগের ঘটনা।

যতীন মারা গেল। রোগ নয়, ভোগ নয়, সুস্থ সবল মানুষটা হঠাৎ কেমন করে মারা গেল, আজ প্রভাবতী ছাড়া আর কারো তা' মনে থাকবার কথা নয়।

দেড় শো টাকা মাইনে পেত যতীন। সে-কালের দেড় শো টাকা; দিয়ে-থুয়ে, হেসে-খেলে রাজার হালে থাকা উচিত। উপরন্তু কিছু জমানোও উচিত। কিন্তু কে জানতো, অমন হঠাৎ মরে যাবে! প্রভাবতী জানতো না, যতীনও বুঝতে পারেনি। নইলে একটা উপায় করে যেত বৈ কি!

সেই শোকে মুহ্যমান অবস্থায় প্রাণতোষ সরকার আবিষ্কার করলেন, যতীনের নামে পোষ্টাপিসের বইতে একশোটা টাকা আর লাইফ্ ইন্সিওরের দু' হাজার টাকার পলিসিখানা।

প্রাণতোষ এগিয়ে এসে বললেন—এ-বাড়ী ছাড়তে হবে তোমায়, সস্তা দেখে অবশ্য একটা ঘর ইতিমধ্যে খুঁজেছি। আর, যদি বাপের বাড়ী বা শ্বশুর-কুলের কেউ কোথাও থাকে, তা-ও বল। তুমি যা' বলবে সেই ব্যবস্থাই করবো—

খুঁজে-পেতে বাপের বাড়ীর দেশেও গিয়েছিল প্রভাবতী কিছুদিনের জন্যে। কিন্তু বাপ-মা মারা গেলে বাপের বাড়ীও যা', আর রাস্তাও তাই। বড় ভাই বললে—আমার অবস্থা তো দেখছো—যতীনের মত বড়লোক নই যে, ভালো খাওয়াতে পরাতে পারবো। তবে এসেছো, বারণ করতে পারবো না। বৌদির মন রেখে চল, বৌদির কাছে যদি পাশ করতে পারো, মোটা ভাত-কাপড়টা দিতে পারবো আশা করি—

কিন্তু কিছুদিন পরেই ছেলে-মেয়ে নিয়ে প্রভাবতী আবার একদিন কলকাতায় এসে হাজির।

খবর পেয়ে প্রাণতোষ সরকার গেলেন। বললেন—এখন কী করতে চাও বল—

জগদ্ধাত্রীর মত রূপ আর কপর্দকশূন্য অবস্থা বন্ধুপত্নীর। বললে—আমার চিন্তাশক্তি লোপ পেয়েছে, আপনি যা ভালো বোঝেন দাদা, তাই করুন—

প্রাণতোষ সরকার বললেন—পঞ্চাশটা টাকা এখন রাখো,—হঠাৎ দরকারের সময় কাজে লাগতে পারে—

প্রভাবতী বললে—টাকা-পয়সা আপনিই রাখুন, আমার দরকার হলে চেয়ে নেব—

কথাটা মিথ্যে নয়। জগদ্ধাত্রীর মত রূপ নিয়ে একলা বিধবা মানুষ কলকাতা শহরের গলিতে থাকা। প্রাণতোষ সরকার থাকেন সেই কালীঘাটের মোড়ে—এখান থেকে অনেক দূরে। হঠাৎ কোনও বিপদ-আপদ হলে কে খবর দিতে যাবে! তবু টাকা কিংবা পয়সা কাছে রাখা নিরাপদ নয়।

সস্তা ভাড়ায় নতুন একটা বাড়ি ঠিক হলো। প্রাণতোষ সরকারের সম্পর্কে ধরণীদাদা। তাঁরই বসতবাড়ির লাগোয়া। তিনতলা বাড়িটার একতলায় একখানা ঘর। ও-ঘরটাতে ভাড়াটে বড একটা আসে না। ভাড়া ঠিক হলো দশ টাকা। ধরণীদাদা বললেন—তোমার বৌদিকে জিজ্ঞেস কোরো প্রাণতোষ। তোমার বৌদি ছাড়া আর সব স্ত্রীলোককে আমি মা'র মতন দেখি। প্রভা আমার মেয়ের মত রইল—তোমার কিছু ভাবনা নেই, আমি রোজ একবার করে খবর নেব'খন। আর, যখন যা' কিছু দরকার ওর হয়—যেন আমায় বলে—

প্রভা বাঁচলো এখানে এসে। অন্ধকার একতলার একখানা ঘর। না আছে উঠোন, না আছে একটা রান্নাঘর। তবু দু'টো ছেলে-মেয়ের সেবা করতেই সমস্ত দিন কোথা দিয়ে কেটে যায়, টের পাওয়া যায় না।

ক'দিন থেকে এক বিচিত্র ব্যাপার লক্ষ্য করলে প্রভা।

ছোটগলির ধারেই প্রভার ঘরে। দু'টো জানালা। গলিটা দিয়ে একমাত্র ধরণীবাবুদের বাড়ীর লোকেরা যাতায়াত করে। জানালার ওপর একদিন ছোট একটা বিস্কুট-ভর্তি ঠোঙা পাওয়া গেল। একদিন ঠোঙার ভরা লজেঞ্চ। এমনি ক্রমাগত ঘন ঘন কয়েক দিন ধরে চললো।

ধরণীদা খবর পেয়ে বললেন—এ বড় খারাপ কথা—এর বিহিত করছি আমি। তুমি কিছু ভেবো না প্রভা—

শেষ পর্যন্ত ঘটনাটা বন্ধ হলো।

খবর নিয়ে যান রোজ ধরণীবাবু নিজে। সাধারণত আসেন সন্ধ্যাবেলা। প্রভার তখন গা ধোবার সময়।

সেদিন প্রভা অবাক হয়ে গেল। বললে—এক শো টাকা! এত টাকা আমার কী হবে বড়দা—

ধরণীবাবু বললেন—তুমি রাখোনা? বিধবা মানুষ, কত রকম বিপদ-আপদ আছে, আমি বাড়ীতে থাকি না থাকি··· আমি বলছি, তুমি রাখো দিকি—

জোর করে গছিয়ে দিয়ে গেলেন এক টাকার একশোখানা নোট—

প্রাণতোষ সরকার পরের দিন সকালে এলেন ধরণীদা'র কাছে। টাকা-গুলো ফিরিয়ে দিলেন। বললেন—প্রভা অত টাকা কী করবে বড়দা? ওকে দেবার দরকার নেই—তোমার কাছেই থাক। দরকার হলে দেবে—তা ছাড়া এখন তো ওর হাতে টাকা রয়েছে—পোস্টাপিসে যতীনের টাকাটা রয়েছে—আর লাইফ্-ইন্সিওরের দু' হাজার টাকাও তো …ও টাকা বরং তোমার কাছেই থাক—

কিছুদিন পরে প্রাণতোষ সরকার ও-বাড়ী যেতেই ধরণীদাদা বললেন—প্রভা ক'দিন থেকে একটা হার চাইছিল, এইটে গড়িয়েছি, কেমন হলো বলো তো—

প্রভার কাছে কথাটা পাড়লেন প্রাণতোষ সরকার—তুমি বড়দা'র কাছে হার চেয়েছ?

প্রভা আকাশ থেকে পড়লো।

—আমি হার চাইবো! বড়দা'র কাছে!

প্রাণতোষ বললেন—বিশ্বাস করিনি আমি। কিন্তু হার ছড়া যে আমায় দেখালেন—তিনশো টাকা দাম—

প্রভা বললে—বুঝেছি, সেদিন বড়দা'র মেজ মেয়ের বিয়ের জন্যে গয়না গড়াবার কথা হচ্ছিল স্যাকরার সামনে, বড়দা একটা ক্যাটালগ্ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার কোন্‌টা পছন্দ হয় প্রভা? তা আমি একটা পছন্দ করে বললাম—এইটে আমার পছন্দ—তা' সে কি আমার জন্যে? সে তো বড়দা'র মেজ মেয়ের জন্যে—

প্রাণতোষ সরকার ধরণীদা'কে বললেন—ও হার তোমার কাছেই থাক বড়দা—মেয়েদের অত গয়না-টয়নার লোভ দেখানো ভালো না—রেখে দিন, মিনির বিয়ে তো আমাদেরই দিতে হবে—দেবার দিন তো পড়ে রয়েছে—

চরম ঘটনা ঘটলো এর পর। খোকার বাড়াবাড়ি অসুখের সময় প্রভার নাওয়া-খাওয়া বন্ধ। ঘটনাটা সেই সময়কার। প্রভাবতী সে-লজ্জাকর ঘটনাটার বর্ণনা দিতে পারলে না।

শুধু বললে—এর পর থেকেই আমার ওপর অন্য রকমের অত্যাচার সুরু হলো—উনুনের ধোঁয়ায় নাকি দোতলার ভাড়াটের হঠাৎ বড় অসুবিধে হতে লাগলো,—সিমেণ্টের মেঝে আর দেয়ালের চুন-বালি নাকি নষ্ট করতে লাগলো আমার ছেলে-মেয়েরা! বড়দা যেন অন্য মানুষ হয়ে গেলেন—

তারপর থেমে বললে—দাদার তো শরীর বরাবরই খারাপ, খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম সহ্য হয় না—পেট-রোগা মানুষ—আমাকে নিয়ে যে কী রকম বিব্রত হয়ে পড়লেন, নিজের বোন নেই, কিন্তু পাতানো বোনের ঝঞ্ঝাটে স্বাস্থ্য এম্‌নি রোগা হয়ে গেল—

বালিগঞ্জ ছেড়ে রূপচাঁদ মুখুজ্জের লেন-এ নতুন বাড়ী বদলানো হলো।

প্রভাবতী বললে—বাড়ী বদলানো হলো, কিন্তু আমার পোড়া কপাল বদলালো না—

বাড়ীতে পুরুষ মানুষ কেউ নেই। বিধবা। দু'টি মাত্র শিশু সঙ্গে। দেখাশোনা করতে আসে শুধু একজন অনাত্মীয় যুবক। তখন প্রাণতোষ সরকারের বয়েস কম। ঘটনাটা পাড়ার লোকেদের কাছে সহজও ঠেকল না, স্বাভাবিকও ঠেকল না। বালিগঞ্জের বাড়ীতে তবু তিনবছর কোনও রকমে কেটেছিল, কিন্তু এ-পাড়ায় ছ-সাত মাস কাটতে না কাটতেই বোঝা গেল, বেশী দিন টেকা যাবে না। তা টেকা গেলও না। কয়েকদিন পরে রাত্রে বাড়ীর উঠোনে ঢিল পড়তে সুরু করলো।

একে প্রাণতোষ সরকার ডিস্‌পেপ্‌টিক লোক। মেজাজটাও অল্পতেই খিট্‌খিটে হয়ে যায়। সেই সময়ে ভাবনা-চিন্তায় তাঁর স্বাস্থ্যটাও আরো ভেঙ্গে

গেল। নিজের সংসারের ঝঞ্ঝাট না থাকলে কী হবে—ঝঞ্ঝাট-সৃষ্টি হতে কতক্ষণ লাগে!

প্রভা বললে—মহাপুরুষদের চোখে দেখিনি, পরমহংসদেব, বিবেকানন্দ... ওঁরা ছিলেন ক্ষণজন্মা পুরুষ, কিন্তু চাক্ষুষ দেখলাম দাদাকে—কোথাও কোনও আসক্তি নেই। নির্বিকার নিরাসক্ত পুরুষ। যাহোক শেষকালে দাদা বিরক্ত হয়ে পড়লেন। বললেন—তোমাদের চোখের আড়ালে রাখলেই বিপদ।—বলে তুললেন আমাদের সবাইকে নিয়ে নিজের বাড়ীতে।

প্রভাবতী থামলে। তারপর আবার বলতে সুরু করলে—তারপর থেকে ওঁরই বাড়ীতে। কখনও বুঝতে দেননি যে, আমরা বাইরের লোক। পূজোর সময় যেমন তাঁর বাবা-মা'র কাপড় এসেছে, তেমনি এসেছে আমার আর আমার ছেলেমেয়েদেরও। যেখানে ওঁদের নেমন্তন্ন হয়েছে, সেখানে আমরাও গেছি বাড়ীর ছেলেমেয়ের মত। এমনি করে নিজের স্বাস্থ্য নষ্ট করে আমাকে স্বাবলম্বিনী করবার জন্যে বি-এ পাশ করিয়েছেন—আমার খোকা আসছে বছরে ম্যাট্রিক দেবে—আর মিনির বিয়ের ব্যবস্থা···কিন্তু ওঁর ওপরে আর বোঝা বাড়াতে চাই না—

বললাম—আপনার পক্ষে চাকরিটা হলে খুবই ভালো হয়, ইস্কুলের সঙ্গে ফ্রি কোয়ার্টার আর মাইনেও দু'শো টাকার মতন—ট্রাম-ভাড়া লাগবে না। আর, তারপর যদি দু'একটা ট্যুইশনি জোগাড় করে নিতে পারেন তো বেশ চলে যাবে—

প্রভা বললে—হলে আমার বড় উপকার হয়। আমি দাদার কিছুটা ভার লাঘব করতে পারি—

—কিন্তু হওয়া সহজ নয়। কমিটির ছ'জন মেম্বরের মধ্যে দু'জনকে মাত্র রাজী করিয়েছি। সকলেরই ক্যাণ্ডিডেট আছে। মাইনেও ভাল, আর ফ্রি কোয়ার্টার আছে সঙ্গে।

যাবার সময় প্রভাবতী বলে গেলো—আমার কথা না ভাবুন, দাদার

কথা ভেবেও অন্ততঃ এই উপকারটুকু করুন। ওঁর স্বাস্থ্য দিন দিন যা ভেঙে পড়ছে…

এত শোনার পরেও কিন্তু প্রাণতোষ সরকারকে নিয়ে গল্প লেখার কথা মনে আসেনি আমার। প্রাণতোষ সরকারকে আমরা যেমন জানি, তাতে প্রভার প্রতি পরোপকারবৃত্তি ওঁর চরিত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপ খেয়ে গেছে।

প্রাণতোষ সরকার একদিন আবার এলেন। বললেন—কাল থেকে খবরটা শুনে পর্যন্ত আমার সমস্ত রাত্তির পেট ভুট্ভাট্ করেছে– অথচ কী-ই বা খেয়েছি! গাওয়া ঘিতে ভাজা দু'খানা আটার লুচি আর একটু নুন গোলমরিচ দিয়ে আলু-কাঁচকলা সেদ্ধ,—কিন্তু সারারাত্তির সেই আই-ঢাই আই-ঢাই ভাব—পেট একেবারে দমসম্ মেরে বসে আছে—কোনও দিকে নড়ছেও না, চড়ছেও না। সে যা হোক, প্রভার নাকি চাকরি হলো না?

বললাম—আশা কম—

প্রাণতোষ সরকার হতাশার সুরে বললেন—তা আপনি আর কী করবেন? মেয়েটার কপাল—চোদ্দ বছর ধরে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে ফল তো হলো এই! ওদের স্বাবলম্বী করে যেতে পারলাম না! এই দেখুন না, মিনিটার একটা পাত্র খুঁজছি দু'বছর ধরে, ওর বাবার লাইফ্-ইন্সিওরের সেই দু'হাজার টাকা আর পোস্টাপিসের একশো টাকা—পুঁজি তো মাত্র এই। নিজের পকেট থেকে আরো নয় কয়েক হাজার দিলাম, তা-ও একটা ভাল মতন পাত্তর পাচ্ছি না, মেয়েটাকেই বা যার-তার হাতে দিই কী করে বলুন? তারপর ধরুন, ছেলেটা ম্যাট্রিক দেবে আর বছর, আজকাল চাকরির যা বাজার,—ব্যবসা-ট্যাব্সা যা'হোক কিছু সেও তো আমাকেই করে দিতে হবে? তাও তো চার-পাঁচশো টাকার ব্যাপার নয়—

বললাম—চেষ্টা এখনও ছাড়িনি, আজও সকালে টেলিফোন করেছিলাম সেক্রেটারীকে—তিনি আমার দিকে। কিন্তু কমিটির চারজন মেম্বর…

প্রাণতোষ সরকার বললেন—ওদের কপালই খারাপ অবনীবাবু, যতীন মারা যাবার পর থেকে সেই যে চোদ্দ বছর ধরে কুগ্রহ চলেছে, এ আর আজ পর্যন্ত দূর হলো না! আর, শরীর-গতিক যে-রকম, তাতে আর ভরসাও হয় না যে, দেখে যাব ওরা স্বাবলম্বী হয়েছে, ওরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে—

প্রাণতোষ সরকার চলে গেলেন।

ক'দিন ধরে উঠে পড়ে নিজে ঘোরাঘুরি করলাম অনেক। সেক্রেটারীকে নিজে গিয়ে বললাম ব্যাপারটা। সেক্রেটারী ভালোমানুষ লোক। তাঁকে নিয়ে গেলাম কমিটির কয়েকজন মেম্বরের বাড়ী। ক'দিন উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও কিছু হলো না। মনে হলো, প্রাণতোষ সরকারের কথাই ঠিক। কুগ্রহ বুঝি ওদের জীবনে আমরণ জড়িয়ে থাকবে। মানুষের হাতে কোনও উপায় নেই।

কিন্তু বড় অপ্রত্যাশিতভাবে প্রভার চাকরি শেষপর্যন্ত হয়ে গেল।

আর, সেই সূত্রেই জানতে পারলাম, প্রাণতোষ সরকারকে নিয়ে গল্প লেখা চলে।

সেক্রেটারী টেলিফোনে জানালেন—আপনার সেই প্রভাবতী বন্ধুর ব্যাপারটা মিটে গেল অবনীবাবু, কাল এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার যাবে—

পরদিন প্রাণতোষ সরকারের বাড়ী গেছি। বললাম—চলুন—

—কোথায়? আরে মশাই, ভেবে ভেবে আমার হজম হচ্ছে না ভাল, আর, তা' ছাড়া সাড়ে ন'টা বাজতে আর মিনিট পাঁচেক দেরি, সাড়ে ন'টায় যে খেতে বসবো—অবশ্য খাওয়া কিছুই নয়—দু'টি পোরের ভাত, সিঙ্গী মাছের ঝোল দিয়ে…সে কিছু না, কিন্তু কোথায় যেতে হবে—

বলিনি কোথায় যেতে হবে। সুসংবাদটা হঠাৎ দিয়ে একটু বেশী আনন্দ দেবার ইচ্ছে ছিল। খাওয়া-দাওয়া সেরে ইস্কুলে পৌছুতে আরো এক ঘণ্টা।

প্রাণতোষ সরকার বাইরে বসে ছিলেন। সেক্রেটারীর ঘর থেকে প্রভাবতীর নিয়োগপত্রটা এনে দিতেই বললেন—এটা কী?

—পড়েই দেখুন না—

চিঠিটা একবার পড়ে আবার পড়লেন। বললেন—চাকরি হলো নাকি তাহলে?

একটা চরম উপকার করতে পেরেছি, এমনি একটা পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বললাম—প্রভার ভাগ্য ভালো, এতদিনে বোধহয় কুগ্রহ কাটলো, আর আপনিও নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন—

কিন্তু প্রাণতোষ সরকারের চেহারার দিকে চেয়ে হঠাৎ থমকে গেলাম। বাহান্ন বছরের, ভিটামিন আর খোলা-হাওয়া-খাওয়া, পেট-রোগা মানুষটা যেন অকারণে বড় বিমর্ষ হয়ে পড়লেন।

—অবনীবাবু,—

হঠাৎ প্রাণতোষ সরকার আমার হাত দু'টো চেপে ধরলেন।

প্রাণতোষ সরকারের এমন বিমর্ষ রূপ কখনও আগে দেখিনি। বললেন—এ-চিঠিটা আপনাকে দয়া করে ক্যানসেল্ করাতেই হবে অবনীবাবু। প্রভা চাকরি করতে পারবে না—

—সে কী!

আমি তখন বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেছি।

—না অবনীবাবু, প্রভা পারবে না, ওর স্বাস্থ্য তো দেখেছেন, বড় ডেলিকেট হেল্থ্। তার ওপর নিজের হাতে রান্নাবান্না, সংসার করা—যারা পারে, তারা পারে। আমাদের বাড়ীতে একদিনও ওকে রাঁধতে দিইনি—আপনি·········কাজ নেই অবনীবাবু, কিন্তু এ-কথা যেন প্রভাকে বলবেন না আবার—

তারপর খানিক থেমে বললেন—সামান্য ক'টা টাকার জন্যে হয়ত শেষে শরীরের ওপর অত্যাচার অনিয়ম করবে—আমি থাকবো না কাছে—হয়ত কলের জলই খাবে—তারপর ডিস্‌পেপ্‌সিয়া হয়ে চোঁয়া ঢেকুর উঠে একাকার করুক আর কি—শেষকালে স্বাস্থ্যটাই নষ্ট—অমন জগদ্ধাত্রীর মত রূপ······

আমার হাত দু'খানি কাতরভাবে জড়িয়ে ধ'রে, আমার চোখের উপর বিহ্বল দৃষ্টি মেলে, আমার উত্তরের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন প্রাণতোষ সরকার। একটা রহস্যঘন হেঁয়ালির জটিলতার মধ্যে আমার চোখের সামনে যেন অস্পষ্ট হয়ে গেলেন তিনি। চিরকালের পেটরোগা, স্পষ্টবাদী, পরোপকারী প্রাণতোষ সরকারকে বড় দুর্বোধ্য মনে হ'লো হঠাৎ।

এত চেষ্টার পর প্রভার জন্যে চাকরিটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 'না' করে দিই কী করে? তাই নিয়োগপত্রটা হাতে করেই বাড়ীতে ফিরলাম। ইজি চেয়ারটায় হেলান দিয়ে ভাবতে লাগলাম—বুঝতে চেষ্টা করলাম প্রাণতোষ সরকারকে।

হঠাৎ ঘরের এক কোণে দেয়ালের গায়ে দৃষ্টি পড়ল। সেই প্রজাপতিটা আজ হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, দেয়ালের গায়ে এক মাকড়সার জটিল ফাঁদ বন্দী করেছে সেদিনকার প্রজাপতিটাকে। মাকড়সাটা তাকে যেন আক্রমণ করতে চায় না, কিন্তু প্রজাপতির চারপাশের বাঁধন আরো শক্ত করবার জন্যে তার চারদিকে ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে নিজের অজ্ঞাতসারে নতুন নতুন জাল বুনে বুনে চলেছে, আর ক্লান্ত হয়ে পড়ছে নিজের তৈরি ফাঁদের জটিলতায়।

মিলনান্ত

বললাম—না ভাই, ভুল শুনেছ, আমি জীবনে কখনও অভিনয় করিনি—

সবাইকেই হতাশ করতে হলো। বিলাসপুরের রেল-কলোনীর ছেলেরা বড় আশা করে আমার কাছে এসেছিল। তিন দিন ধরে থিয়েটার, নাচ, গান। চাঁদাও উঠেছে বহু টাকা। কোলিয়ারীর মালিকরাই দিয়েছে সাতশো। কলকাতা থেকে ড্রেসার পেণ্টার আসছে!

আবার বললাম—না ভাই, ভুল শুনেছ তোমরা, আমি জীবনে কখনও অভিনয় করিনি—

কিন্তু ছেলেরা চলে যাবার পর হঠাৎ যেন নিজের অজ্ঞাতে চমকে উঠলাম। তবে কি ছেলেরা অন্তর্যামী! কী করে জানলে ওরা! আমি তো মিথ্যে কথাই বললাম। জানালার বাইরে দেখলাম বুধবারী-বাজারের দিকে ছেলেরা চলে যাচ্ছে। টাউনের রাস্তায় ইলেকট্রিক বাতিগুলো হঠাৎ জ্বলে উঠলো। ডাউন বম্বে মেল আসবার সময় হয়েছে বুঝি। টাঙ্গাগুলো সওয়ারী নিয়ে ছুটে চলেছে স্টেশনের দিকে। নিজের প্রায়-অন্ধকার ঘরটার মধ্যে বসে কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম। ওদের কাছে আমি মিথ্যে কথাই তো বলেছি। সত্যিই তো অভিনয় করেছি আমি। ছোট এক অঙ্কে সমাপ্ত একখানা নাটক। স্টেজ নেই, দৃশ্যপট

নেই, ড্রেসার, পেণ্টার, রিহার্শাল কিছুই নেই। তবু তো সেদিন অভিনয় করতে আমার বাধেনি!

ছেলেদের ডাকা হলো না। সেইখানে বসেই যেন মল্লিক মশাইকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম চোখের সামনে। মল্লিক মশাই বললেন—কেমন জামাই দেখলে মুকুন্দ?

বললাম—খাসা, চমৎকার—

মল্লিক মশাই আবার বললেন—আমি জানতুম জয়ন্ত রাজি হবেই, এদিকে চারশো টাকা মাইনে পায়, আর ওই তো বয়েস, এর পর পরীক্ষাটা দিলেই একেবারে অফিসার হয়ে যাবে···কিন্তু তুমি খেয়েছো তো? পেট ভরেছে?

এবারও বললাম—হ্যাঁ—

—মাংসটা কেমন হয়েছিল?

এবারও বললাম—ভালো—কিন্তু এবার আমি আসি মল্লিক মশাই, এর পর গেলে আর ট্রেণ পাবো না হয়ত—

কোনও রকমে মল্লিক মশাই-এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বাইরে আসতেই আদিনাথ ধরেছিল।

বললে—আপনি খেয়ে যাবেন না?

মনে আছে আদিনাথের হাত দু'টো ধরে বলেছিলাম, কিছু মনে করো না তুমি—কিন্তু খেতে আমাকে বোল না ভাই—

—অন্ততঃ গরীবের বাড়ীতে ডাল-ভাত-চচ্চড়ী—যা জোটে?

কিন্তু কুড়ি বছর আগের এ-ঘটনা এমন করে মাঝখান থেকে বললেই কি সব বোঝানো যায়? এখানে এই পাঁচশো মাইল দূরে বিলাসপুর রেল-কলোনীর বি-টাইপ্ কোয়ার্টারে বসেও ঘনায়মান অন্ধকার অতিক্রম করে যেন শাঁখের আওয়াজ শুনতে পেলাম। কুড়ি বছর আগের আওয়াজ এখানে পৌঁছুতে কি এত সময় লাগে? তারপরে তো কত দেশ, কত নদী,

কত পাহাড় নিঃশব্দে পেরিয়ে এসেছি—কিন্তু সে-দিনের সে-ঘটনা এমন করে ভুলতেই বা পেরেছিলাম কী করে ?

তবে গোড়া থেকেই বলি—

হঠাৎ ভৈরবগঞ্জে এসে ট্রেণটা থেমে গেল। শুনলাম—ট্রেণ আর যাবে না। এখানেই রইল। কালও যেতে পারে, পরশুও যেতে পারে—কিম্বা তার পরদিনও যেতে পারে। ইছামতীর জল বেড়ে রেলের লাইন ডুবে গেছে। জল না নাবলে কিছু বলা যায় না।

যে-যার মাল-পত্তর নিয়ে নিয়ে নেবে পড়লো।

ভৈরবগঞ্জ ছোট স্টেশন। না আছে ওয়েটিংরুম, না আছে ভালো রকমের প্লাটফরম। না আছে একটা কুলী। টিম টিম করছে এক ফালি একটা স্টেশন ঘর। কাঁকর বিছানো প্লাটফরমের ওপর রাত কাটানো যায় না।

স্টেশন মাস্টার টেলিফোন নিয়েই ব্যস্ত। কথা বলবার সময় নেই তাঁর।

হাত নেড়ে বললেন—এখন মরবার সময় নেই স্যার, তিনখানা আপ, দুখানা ডাউন গাড়ি সেকশানে আটকে গেছে—

তারপর পাশের টিফিন ক্যারিয়ারটা দেখিয়ে বললেন—ওই স্বচক্ষে দেখুন বাড়ি থেকে হালুয়া করে পাঠিয়েছে—মুখে দিতে পারি নি—

বলে আবার হ্যালো হ্যালো করতে লাগলেন।

চোখে অন্ধকার দেখলাম। বিকেল হয়েছে। এ জায়গায় রাত-কাটাবার কথাটা মনে আসতেই ভয় পেয়ে গেলাম। শনিবারের দুপুর বেলা শেয়ালদ' থেকে উঠেছি, আবার সোমবারে ফিরে গিয়ে অফিস করতে হবে।

প্লাটফরমের ওপর দাঁড়িয়ে এই কথাই ভাবছি। হঠাৎ স্টেশনের এক প্রান্তে পাথরের ওপর বড় বড় অক্ষরে "ভৈরবগঞ্জ" লেখাটা চোখে পড়তেই মনে পড়ে গেল।

ভৈরবগঞ্জ !

এই ভৈরবগঞ্জেই তো মল্লিক মশাইএর বাড়ি। কত দিন যেতে বলেছেন। কিন্তু কখনও আসা হয়ে ওঠেনি। গ্রামের নামটাও মনে আছে ছুটিপুর। এই ছুটিপুর থেকেই ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করতেন মল্লিক মশাই।

বলতেন—একবার তো সময়ই হলো না তোমার মুকুন্দ, কিন্তু মিনুর বিয়ের সময় কোনও ওজর আপত্তি শুনবো না।

বলেছিলাম—নিশ্চয়ই যাবো মল্লিক মশাই, দেখে নেবেন, মিনুর বিয়ের সময় নিশ্চয়ই যাবো।

তারপর মল্লিক মশাই হতাশা ভরে আবার কাজে মন দিতেন—হ্যাঁ, তুমি আর গিয়েছ !

সত্যিই, কত অকাজে কত দিকেই গিয়েছি, কিন্তু মল্লিক মশাইএর ছুটিপুরে যাবার আর সুযোগ হয়ে ওঠেনি আমার। হঠাৎ ভৈরবগঞ্জ স্টেশনের প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে আবার মনে পড়ে গেল মল্লিকমশাইএর কথা বহুদিন পরে।

স্টেশনের পেছনেই একটা পান বিড়ির দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

সে বললে—ছুটিপুর ? তা পোয়া তিনেক রাস্তা হবে এখেন থেকে—আজ্ঞে—সামনে খাটরোর বিল পেরিয়ে সোজা পেঁপুলবেড়ের আল্‌-পথ ধরে চলে যান—যাবেন কা'র বাড়ি ?

তারপর অবশ্য সেই বিকেল বেলা দশজনকে জিজ্ঞেস করে করে গিয়ে পৌঁছেছিলাম শেষ পর্য্যন্ত ছুটিপুর। চারদিকে সন্ধ্যে নেবে এসেছে তখন। দু'পাশে ধান বোনা হয়েছে, জলে থই থই করছে ক্ষেত। মাঝখান দিয়ে পেছল আলের পথ। অনেক উঁচুতে পৃথিবীর ছাদের ওপর দিয়ে কয়েকটা বিচ্ছিন্ন বাদুড় উড়ে চলেছে দক্ষিণ দিকে। সামনের আমবাগানের ঢালু জমিটার ওপর দিয়ে শেষ গরু ক'টা জঙ্গলের ছায়ার মধ্যে মিশে গেল। ছুটিপুরে গিয়ে যখন পৌঁছুলাম, তখন বেশ অন্ধকার।

একজন কৃষাণ গোছের লোক বললে—এ হলো মালো পাড়া, মল্লিক মশাই থাকেন পূব পাড়ায়—এই বাঁশঝাড়ের পাশ বরাবর গিয়ে পড়বেন বারোয়ারীতলায়, তার ডান ধার পানে পূবপাড়া—

চলতে চলতে ভাবছিলাম—বলা নেই, কওয়া নেই, হয়ত মল্লিক মশাই খুব অবাক হয়ে যাবেন। একদিন কত পীড়াপীড়ি করেছেন এখানে আসবার জন্যে। তখন আসা হয়নি। সেই মল্লিক মশাই অফিস থেকে রিটায়ার করলেন, ফেয়ারওয়েল হলো তাঁর—তখনও কথা দিয়েছিলাম—যাবো মিনুর বিয়েতে, নিশ্চয় যাবো কথা দিচ্ছি—

মল্লিক মশাই বলতেন—আগের দিন খবর দিও, আমি পুকুরে ঝোরা দিয়ে মাছ ধরিয়ে রাখবো, আর উমেশ ময়রাকে কাঁচাগোল্লার বরাত দিয়ে রাখবো, তাই খাবে—শেষে মিনুর গানও শুনিয়ে দেব—

আশ্চর্য! এই এতখানি পথ হেঁটে বত্রিশ বছর ধরে কেমন করে একটানা চাকরী করে এসেছেন মল্লিক মশাই। ভোর বেলা সাতটা বাজতে না বাজতে বেরুতেন বাড়ী থেকে আর ফিরতেন রাত আটটায়। আর তারই মধ্যে ইট পোড়ানো, বাড়ী করা, পুকুর কাটানো—ক্ষেতখামারের তদারক...

আমার সঙ্গে কেমন করে যে অমন বন্ধুত্ব হয়েছিল কে জানে। অথচ আমি তো প্রায় তাঁর ছেলেরই বয়সী।

মনে আছে প্রথম দিন আমাকে বলেছিলেন—এটা ক্যামেরা নাকি মুকুন্দ? তুমি নিজে ছবি তুলতে পারো?

তারপর বলেছিলেন—তা দাওনা মিনুর একটা ছবি তুলে ভায়া, ওর ভারি ছবি তোলাবার সখ—একদিন তুমি চলো আমাদের দেশে—যা দাম লাগে আমি দেব—

ভূধরবাবু বলতেন—মল্লিক মশাই আপনি যে এত মেয়ে-মেয়ে করেন—মেয়ে তো বিয়ে হলেই পর হয়ে গেল—

ওপাশ থেকে সুধীরবাবু বলতেন—এই দেখনা আমার জামাই-এর আক্কেলটা, যতবার ছেলে হবে আমার কাছে পাঠাবে, আর মেয়েও তেমনি হয়েছে—আসে আসুক কিন্তু একেবারে খালি হাতে—আমার তো এই মাইনে—সবদিক সামলাই কী করে ? .

সনাতনবাবু বলতেন—কথাতেই তো আছে—জন্-জামাই-ভাগ্না তিন নয় আপ্না—বুঝতে পারতাম মল্লিক মশাই কথাগুলো শুনে অপ্রসন্ন হতেন। চুপি চুপি বলতেন—জয়ন্ত আমার সেই রকম জামাই নাকি তোমরা ভাবো, অমন ছেলে হাজারে একটা মেলে না—

জিজ্ঞেস করলাম—আপনার মেয়ের কি বিয়ে হয়ে গেছে নাকি ?

মল্লিক মশাই বললেন—তা এক রকম হওয়াই বলতে পারো—শুধু দেরি হচ্ছে ওর চাকরীর জন্যে—সীতানাথ বাবুকে বলে আমিই তো ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম ইছাপুরে, সেখান থেকে বদলি হয়েছে জব্বলপুরে, এইবার একটা প্রমোশন হলেই ফোরম্যান একেবারে—

বললাম—তা বলে বিয়েটা করে রাখতে দোষ কী ?

মল্লিক মশাই বলতেন—আমিও তো তাই বলি—সেবার ছুটি নিয়ে সেই কথা বলতেই গিয়েছিলাম জব্বলপুরে, বেশ জায়গা, সাহেবদের বাঙ্লো পেয়েছে, চাকরবাকরে রান্না করে—আমি বললাম—কেন তোমার এ-সব হাঙ্গামা করা, মিনু এলে একদিনেই তোমার ঘর-সংসারের শ্রী বদলে যাবে—কেউ নেই তোমার সংসারে, তুমি কার পরোয়া করবে ? তা কী বলে জানো ?

বললাম—কী ?

বলে—টাকা জমাচ্ছি আমি, বিয়েতে আপনাকে এক পয়সা খরচ করতে দেব না কাকাবাবু।

—আপনি কী বললেন ?

—আমি আর কী বলবো, আমি চলে এলাম, তা তুমি কী ভাবছো আমি কিছু খরচ না করে পারি ? আমার তো এদিকে সব তৈরী, সেদিন

যে ইট পোড়ালাম, সে বাড়ী তো জামাই-এর জন্যেই—সব তৈরী মুকুন্দ, সব তৈরী,—খাট, আলমারী, ড্রেসিং আয়না, ষোল ভরির গয়না পর্যন্ত গড়িয়ে রেখেছি—দানের বাসন কিনেছি, এক একটা করে গায়ে হলুদের কাপড় পর্যন্ত কিনে রেখেছি—মিনুর মা নেই, আমাকেই তো সব করতে হবে—সাধে কি আর বলি, জামাই তো অনেকেরই দেখছো—আর বিয়ের সময় আমার জামাইকেও দেখো—খবর দেব তোমাকে—

সুধীর বাবু বলতেন—তুমি ওই বুড়োর কথা বিশ্বাস করো নাকি মুকুন্দ? আজ পাঁচ বছর ধরে শুনে আসছি ওই এক কথা। আমি কতদিন বলেছি—একটা ভালো পাত্র আছে, আপনার মেয়ের সঙ্গে দিন বিয়ে, আপনার মেয়ে সুন্দরী, একটা পয়সা নেবে না, তা উনি বলেন—না, মেয়ের আমার পাত্র ঠিক হয়ে আছে—

একদিন সরাসরি বলেই ফেলেছিলাম—আচ্ছা মল্লিক মশাই, ভগবান না করুন—যদি জয়ন্ত শেষ পর্যন্ত বিয়ে না-ই করে—এতদিন হয়ে গেল—

মল্লিক মশাই-এর কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস। বলতেন—তুমি বলো কি মুকুন্দ, জয়ন্তকে আমি চিনি না! আমি ওকে মানুষ করলাম, ছোট বেলায় বাপ-মা মারা গিয়েছিল, আমি না দেখলে ওকি বাঁচতো? ইস্কুলের মাইনে দিয়ে পড়িয়ে চাকরীতে ঢোকানো ইস্তোক—সব যে আমি করেছি—নইলে ধর্মে ওর সইবে—মাথার ওপরে ভগবান বলে একজন আছেন তা মানো তো?

সুধীরবাবু সব শুনে বললেন—শুনলে তো, এখন কী জবাব দেবে দাও—

তারপর একটু থেমে বললেন—ওঁর মেয়েটি কিন্তু ভারি সুশ্রী ভাই, লক্ষ্মী প্রতিমার মত চেহারা, এমন চমৎকার তার ব্যবহার, একবার দেশে গিয়ে দেখেছিলাম। জয়ন্ত গান ভালোবাসে বলে মেয়েকে উনি মাস্টার রেখে গান শিখিয়েছেন, জয়ন্ত ভালো-মন্দ খেতে ভালোবাসে বলে নানান্ রকমের রান্না শিখিয়েছেন—

এক-একদিন দেখতাম মল্লিক মশাই মনোযোগ সহকারে চিঠি লিখছেন।

আমি কাছে যেতেই বললেন—জয়ন্তকে আর একটা চিঠি লিখলাম—

বললাম—আগেকার চিঠির উত্তর পেয়েছেন না কি ?

বললেন—না, সেই জন্যেই তো লিখছি আবার—

—আপনার চিঠির উত্তর দেয়না এটাই বা কী রকম ?

—তা ভাই এ তো আর আমাদের মত কেরাণীগিরির চাকরী নয়, অফিসে বড় খাটুনি ওর, সময়ই পায় না—

তবু কখনও মনে পড়ে না জয়ন্ত একটা চিঠিরও উত্তর দিয়েছে।

একদিন এমনি করে রিটায়ার করবার দিনও এল। চাঁদা তুলে ফেয়ার-ওয়েল দেওয়া হলো মল্লিক মশাইকে। যাবার দিন মল্লিক মশাইএর চোখে জল এসে গিয়েছিল। বত্রিশ বছরের সম্পর্ক ছাড়তে কষ্ট হয় বৈ কি! আমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন—মিনুর বিয়েতে তোমার যাওয়া চাই কিন্তু ভাই—

আমি বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম। বললাম—দিন স্থির হয়ে গেছে না কি?

—ওই দিন স্থির করাটুকুই যা বাকি—নইলে বিয়ে ওদের একরকম হয়েই গেছে ধরে নিতে পারো, ওদের ছুটি পাওয়া খুব শক্ত কি না, বিয়ের ছুটি তাও দেবেনা বেটারা, তা বলাও যায় না একদিন হয়ত হুট্ করে এসে বলতে পারে—এখুনি বিয়ে হয়ে যাক, একদিনের ছুটি হয়ত মেরে কেটে পেয়েছে।

বললাম—একদিনের মধ্যে সব যোগাড় যন্ত্র করতে পারবেন ?

মল্লিক মশাই এবার হেসে ফেলেছিলেন—যোগাড় তো সব করেই রেখেছি ভায়া, মায় ফুলশয্যার বন্দোবস্তও শেষ—শুধু কাঁচা বাজারটা, তা সে আমার ভাইপো আদিনাথ আছে, সব করে ফেলবে সে।

এ-সব পাঁচ বছর আগের ঘটনা। মল্লিক মশাই রিটায়ার করবার পরও পাঁচ বছর কেটে গেছে। আর দেখা হয়নি তাঁর সঙ্গে। জানি বেঁচে আছেন। এই পর্যন্ত।

ভাবছিলাম—এত দিন পরে, বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ আমাকে কেমন ভাবে গ্রহণ করবেন কে জানে!

কিন্তু পুবপাড়ায় পৌঁছে আর বেশি দেরী হলো না। ছাড়া ছাড়া বাড়ি, চারদিকে গাছপালার জঙ্গল। বেশ ঘন হয়ে এসেছে অন্ধকার। কাছাকাছি কোনও বাড়িতে ঢোল আর শানাই বাজছে। ঘন ঘন শাঁখের আওয়াজও আসছে। বোধহয় কোনও উৎসব চলেছে কোথাও।

বাড়ির সামনে গিয়ে ডাকতেই একজন বেরিয়ে এল।

বললে—মল্লিক মশাই? তাঁর তো অসুখ—

বললাম—অসুখ? কী অসুখ?

—অসুখ—মানে—

ছেলেটি যেন কেমন আমতা আমতা করতে লাগল।

তারপর বললে—আপনি কোথা থেকে আসছেন?

বললাম—কলকাতা। বলোগে মুকুন্দ এসেছে। বি-এন-আর অফিস থেকে—

অফিসের নাম শুনে যেন কেমন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো ছেলেটি।

জিজ্ঞেস করলাম—তোমার নাম কী?

—আদিনাথ।

—তুমি কি মল্লিক মশাইয়ের ভাইপো?

আদিনাথ আশ্চর্য হয়ে গেছে। বললে—আপনি জানলেন কী করে?

বললাম—আমি জানি সব—কিন্তু মল্লিক মশাইএর সঙ্গে আমার দেখা করতেই হবে—

—কিন্তু—

আদিনাথ তবু যেন কেমন দ্বিধা করতে লাগলো

বললে—তিনি তো চোখে দেখতে পান না—

—সে কি ? আমার বিস্ময়ের আর অন্ত নেই।

—হ্যাঁ, আজ চার বছর অন্ধ হয়ে গেছেন, শুধু চুপ চাপ বসে থাকেন নিজের ঘরে—

বললাম—তা' হোক, আমাকে তিনি অনেকবার এখানে আসতে বলেছেন—একবার দেখা না করে যাবো না—

আদিনাথ তবু যেন কোনও উৎসাহ দেখায় না। কিন্তু এবার অন্ধকারের মধ্যেও দেখতে পেলাম তার মুখখানা যেন ফ্যাকাসে হয়ে এল। হারিকেনের মৃদু আলোয় তার দু'চোখের পাতাগুলো কেমন যেন ছল্ ছল্ করছে।

হঠাৎ কান্নার মতন করে যেন আদিনাথ ককিয়ে উঠলো।

বললে—আপনি যেন কিছু বলবেন না তাঁ'কে—কাকাবাবুর হার্ট বড় দুর্বল। ডাক্তারে কেবল বিশ্রাম নিতে বলেছে—আপনার পায়ে পড়ি, আপনি…

হঠাৎ ছেলেটির এই ব্যবহারে কেমন স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এই স্বল্পালোকিত পরিবেশে, চারদিকে ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দ আর অদূরের ঢোল আর শানাইয়ের মূর্চ্ছনার সঙ্গে এক মুহূর্তে সমস্ত অতীত থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম।

আদিনাথ বললে—চলুন, নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে, কিন্তু আপনি যেন কিছু বলবেন না—

আমি মন্ত্রচালিতের মত পেছন পেছন চলতে লাগলাম। সদর দরজা পেরিয়ে বাড়ির অন্দর মহলেও কোনও লোকজনের সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। যেন মৃত্যুপুরীর অলিন্দ দিয়ে আমি কোন্ অনাবিষ্কৃত অনন্তের সন্ধানে চলেছি।

আমি সামনে এগিয়ে একবার বললাম—বাড়িতে কোনও বিপদ চলছে নাকি ?

আদিনাথ হাতের সঙ্কেত করে বললে—চুপ, কাকাবাবু শুনতে পাবেন—

তারপর একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। গলা নীচু করে বললে, উনি যা বলবেন আপনি হ্যাঁ বলে যাবেন—আপনার পায়ে পড়ি, আমাদের বাঁচাবেন—

বললাম—কী হয়েছে ? কিছুই বুঝতে পারছি না যে—

আদিনাথ তেমনি গলা নিচু করে বললে—আর চেপে রাখা যাচ্ছিল না—আপনাকে সব বলবো পরে—কাকাবাবুর মেয়ের আজকে বিয়ে—

আমি রুদ্ধ নিশ্বাসে বললাম—কা'র ? মিনুর ?

আদিনাথ কী যেন উত্তর দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু বাধা পড়লো। ঘরের ভেতর থেকে মল্লিক মশাইএর গলা শোনা গেল—কে ? কে ওখানে কথা কয় ?

আদিনাথ আমাকে নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লো। বললে—আমি কাকাবাবু।

—সঙ্গে কে ? কার সঙ্গে কথা বলছিলে ?

—ইনি এসেছেন মিনুর বিয়েতে কলকাতা থেকে। আপনি বলেছিলেন নেমন্তন্ন করতে—বি-এন্-আর অফিসের লোক।

সঙ্গে সঙ্গে মল্লিক মশাই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন—কে ? সুধীর ? সনাতন ? মুকুন্দ ?

এগিয়ে গিয়ে বললাম—মল্লিক মশাই, আমি মুকুন্দ।

আমার উত্তরটা শুনেই মল্লিক মশাই যেন উত্তেজনায় আনন্দে উঠে বসবার চেষ্টা করতে লাগলেন। বললেন—মুকুন্দ ? মুকুন্দ, তুমি এসেছ ? —আর ওরা এল না—সুধীর, সনাতন ?

আদিনাথ এগিয়ে গিয়ে বললে—ইনি বলছিলেন ওঁদের আসবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু অফিসে ছুটি পাননি।

এবার ঘরের ভেতরে ভালো করে চেয়ে দেখলাম। মল্লিক মশাই একটা খাটের ওপর চিত হয়ে শুয়ে আছেন। সমস্ত শরীরে চাদর ঢাকা। মাথার

পেছনে একটা টেবিলের ওপর একটা হারিকেন জলছে। কয়েকটা ঔষধের শিশি, জলের গ্লাস।

আমি কথা বলতে চেষ্টা করলাম—আপনার চোখ খারাপ হয়েছে জানতাম না তো!

মল্লিক মশাই হাসলেন। বললেন—বয়েস হয়েছে, যাবারও সময় হয়ে এল মুকুন্দ, কিন্তু তার জন্যে আমার দুঃখু নেই, আর মিনুর বিয়েটা যে শেষ পর্যন্ত হলো, তাতেই আমার সব দুঃখু মিটে গেছে ভায়া—

তারপর থেমে বললেন—তুমি যে এসেছ মুকুন্দ, আমি ভারি খুসী হয়েছি, চিঠি ঠিক সময়ে পেয়েছিলে?

আদিনাথ আমার দিকে চাইলো।

আমি বললাম—হ্যাঁ, চিঠি ঠিক সময়ে পেয়েছিলাম, আমি আপনাকে কথা দিয়েছিলাম মিনুর বিয়েতে আসবো—

মল্লিক মশাই এবার বললেন—আদিনাথ—মুকুন্দকে তুমি ফার্স্ট ব্যাচেই খাইয়ে দেবে। ওর আবার ট্রেণের সময়—

আমি কেন জানি না বলে ফেললাম—আমার খাওয়া হয়ে গেছে মল্লিক মশাই।

মল্লিক মশাই যেন তৃপ্তি পেলেন, শুনে বললেন—ভালোই করেছ—মাংসটা কেমন খেলে? আর উমেশ ময়রার কাঁচাগোল্লা?

বললাম—খাসা—চমৎকার।

মল্লিক মশাই বললেন—আদিনাথ, তুমি নিজে খাবার সময় কাছে ছিলে তো?

আদিনাথ টপ্ করে বললে—হ্যাঁ কাকাবাবু, আমি নিজে খাইয়েছি ওঁকে—

মল্লিক মশাই আবার বললেন—বর দেখলে মুকুন্দ—জয়ন্তকে দেখলে? কেমন জামাই করেছি বলো? তখন তো সবাই তোমরা ঠাট্টা করতে?

বলতে জয়ন্ত বিয়ে করবে না—কিন্তু মাথার ওপর একজন ভগবান আছেন এ কথা মানো তো? তোমরা আজকালকার ছেলে ভগবান-টগবান মানো না—কিন্তু আমার অসীম বিশ্বাস ছিল ভাই ছোটবেলা থেকে।

তারপর একটু থেমে আবার বললেন—ওইযে যে-বাড়িতে বসে তুমি খেলে, ওই বাড়িটাতেই বিয়ের ব্যবস্থা করলাম ভাই, ওটা দিয়ে যাবো মেয়ে-জামাইকে, আর এই বাড়িটে হচ্ছে আমার পৈত্রিক, শরীরটা খারাপ বলে ওই সব হাঙ্গামার মধ্যে আমি আর গেলাম না—আমি আদিনাথকে বললাম—আমি নিরিবিলিতে এখানেই থাকবো—তা' আদিনাথ একাই সব করছে—

বললাম—ভালোই করছেন—

মল্লিক মশাই বললেন—দেখ ভাই, ভগবানের ওপর অসীম বিশ্বাস ছিল বলে বরাবর আমি বিশ্বাস করতুম জয়ন্ত রাজি হবেই—এদিকে চারশো টাকা মাইনে পায়, আর ওই তো বয়েস, এবার ফোরম্যান হয়েছে, এরপর একটা পরীক্ষা দিলেই একেবারে অফিসার হয়ে যাবে—তা জয়ন্তকে আমি কিছু খরচ করতে দিইনি—প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে আমি পনেরো হাজার টাকা পেয়েছিলাম জানো ত, সবই খরচ করলাম মিন্থর বিয়েতে—

তারপর আদিনাথকে লক্ষ্য করে বললেন—আদিনাথ, ওদিকে কোনও গোলমাল হচ্ছে না তো? সবদিকে নজর রাখবে, কেউ যেন না খেয়ে চলে যায় না—টাকার জন্যে ভেবো না—

আদিনাথ বললে—না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন কাকাবাবু, আমি সব দেখছি—

আমি আর স্থির থাকতে পারছিলাম না। বললাম—এবার আমি আসি মল্লিক মশাই, এরপর গেলে আর ট্রেণ পাবো না হয়ত—

মল্লিক মশাই বললেন—আচ্ছা এসো ভাই—খুব কষ্ট হলো তোমার—আদিনাথ, মুকুন্দর যাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিও—

সেই নিঃসঙ্গ ঘরের মধ্যে মল্লিক মশাইকে রেখে সোজা উঠে বাইরে এলাম। তারপর অন্ধকারে পা ফেলে ফেলে একেবারে সদর দরজার কাছে এসে পৌছুলাম। আমার যেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল। চেয়ে দেখি আদিনাথও হারিকেনটা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে।

আদিনাথও যেন আমার মত নির্বাক হয়ে গেছে।

তার চোখে চোখ পড়তেই দেখলাম আদিনাথ কাঁদছে।

মুখ দিয়ে যেন কিছু বলতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু কথা বেরুল না।

আদিনাথই মুখ খুললে। বললে—আপনি যেন কাউকে কিচ্ছু বলবেন না!

এতক্ষণে রাস্তায় নেমে এসেছি। বাইরে অন্ধকার। চারদিকে বাঁশ-ঝাড় আর জঙ্গল। কোনও দিকে কিছু স্পষ্ট দেখা গেল না। শুধু অদূরের ঢোল-শানাই-এর শব্দ ভেসে আসছে। দু' একবার শাঁখও বেজে উঠছে। মনে হলো—শানাইটা বিনিয়ে বিনিয়ে কেবল বুঝি বিসর্জনের সুরই বাজাচ্ছে।

হঠাৎ মুখ ফেরালাম।

আদিনাথও আমার দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়ালো।

বললে—আপনি খেয়ে যাবেন না?

মনে আছে আদিনাথের হাত দু'টো চেপে ধরেছিলাম। বলেছিলাম—কিছু মনে করো না তুমি—কিন্তু এর পর খেতে আমাকে তুমি বোল না ভাই—

—অন্ততঃ গরীবের বাড়িতে ডাল-ভাত-চচ্চড়ি যা জোটে—

সেদিন অভুক্ত অবস্থায়ই চলে এসেছিলাম মনে আছে। বারোয়ারীতলা পর্যন্ত আদিনাথ আমাকে এগিয়ে দিতে এসেছিল। আমাকে স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দিতে আসছিল। কিন্তু আমি বারণ করেছিলাম।

বললাম—তোমাকে আর আসতে হবে না ভাই, তুমি মল্লিক মশাইকে গিয়ে দেখো—

আদিনাথ বলেছিল—কিন্তু কাকাবাবু জানতে পারলে রাগ করবেন—

—কিন্তু জানাবে কেন তাঁকে?

এ-কথার উত্তরে আদিনাথ কোনও জবাব দেয়নি। আমার দিকে চেয়ে কেমন যেন কোনও নতুন প্রশ্নের অপেক্ষা করছিল।

আমি আর কৌতূহল দমন করতে পারলাম না। বললাম—জয়ন্ত কি চিঠি দিয়েছিল তোমাদের—শেষ পর্যন্ত?

আদিনাথ বললে—না—কাকাবাবুর একখানা চিঠিরও জবাব দেয়নি—

—সে কি জব্বলপুরেই আছে? একবার গেলে না কেন সেখানে?

—গিয়েছিলাম, কিন্তু দেখা হয়নি—

—কেন?

—তার চাকর ঢুকতেই দিলেনা বাড়ির ভেতর। দু'টো কালো কালো কুকুর তাড়া করে এল কামড়াতে—

—তার চাকর কী বললে?

—চাকরটা বললে—মেম-সাহেব মানা করে দিয়েছে। আমিও শুনলাম, জয়ন্ত এক মেম-সাহেবকে বিয়ে করেছে, ছেলেও হয়েছে—

—তারপর? যেন নিজেও হতবুদ্ধি হয়ে নির্বোধের মত প্রশ্ন করে বসলাম।

আদিনাথ বললে, তারপর আর কি, কাকাবাবুও অবুঝ, তাঁরও হার্ট খারাপ হয়ে গেছে, এ-খবর দিতে পারিনি তাঁর কাছে। ডাক্তারবাবু বারণ করেছিলেন—। কিন্তু আর বেশি দিন চেপে রাখাও যাচ্ছিল না—ওঁকে বাঁচাবার জন্যে এই পথ নিতে বাধ্য হলাম, এ-ছাড়া আর গতিও ছিলনা—আমার মা এই বুদ্ধিই দিলেন—

বারোয়ারীতলার বিরাট বিরাট বট গাছের তলায় কেমন নির্বোধের মতন খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। আশে পাশে চারদিকে পাকা-পাকা ফলগুলো টপ টপ করে পড়ছে। মনে হলো—যেন কারো চোখের

জল পড়ার শব্দ ওটা। তবে কি নির্জীব গাছটাও সব জানে। চেয়ে দেখলাম—আদিনাথ এখনও কাঁদছে। মনে পড়লো—মল্লিক মশাই বলেছিলেন—মাথার ওপর ভগবান বলে একজন আছেন তা মানো তো?

হঠাৎ বললাম—এবার আসি ভাই—.

আদিনাথ হারিকেনটা উঁচু করে ধরলো।

সে-আলোয় সামনের পথটা একটু ঘোলাটে হয়ে এল।

হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালাম। যে-মেয়েটিকে নিয়ে এত কিছু কাণ্ড, এত মুখর অভিনয়, তার কথা তো এতক্ষণ একবারও মনে আসেনি। মল্লিক মশাইএর দিকটাই সবাই দেখেছে। কিন্তু তার কথা তো কেউ ভাবছে না। ওই ঢাক ঢোল শানাই-এর মূর্চ্ছনা আর শাঁখের মঙ্গলধ্বনির অন্তরালে সে-ও কি একজন অন্যতম অভিনেত্রী হয়েই আছে? জয়ন্তর জন্যে তার গান শেখা আর রান্না শেখার কৃচ্ছ্রসাধনের ইতিহাস কি আজ এই পরিণতির জন্যে প্রস্তুত ছিল? মনে হলো—ও বটফল নয়, ও যেন সেই মেয়েটিরই চোখের জল—আমাদের আশে পাশে চারদিকে টপ্ টপ্ করে ঝরে পড়ছে। ওকে শুধু জয়ন্তই উপেক্ষা করেনি—মল্লিক মশাই, আদিনাথ, আদিনাথের মা সকলের কাছেই সে উপেক্ষিতা।

আদিনাথ আলোটা উঁচু করে তখনও দাঁড়িয়েছিল।

কাছে গিয়ে বললাম—আর···আর···

আদিনাথ আমার দ্বিধা ভেঙে দিয়ে বললে—বলুন—

—আর সেই মল্লিক মশাইএর মেয়ে? সে জানে?

আদিনাথ বললে—মিনুর কথা বলছেন। তার মত আছে, সে তো কাকাবাবুর মত অবুঝ নয়! তা ছাড়া এ পাত্রও তো খারাপ নয়, দেড়শো বিঘে ধানজমি আছে, এক বিঘের ওপর জমিতে বাস্তু বাড়ি, বছরের খাবার ঘরেই হয়, শুধু আগের পক্ষের একটা মেয়ে আছে—তা এত কাণ্ডের পর একজন যে রাজি হয়েছে এই তো সৌভাগ্য বলতে হবে মিনুর পক্ষে—

বংশীর মুখখানা পাংশু কঠিন হয়ে এসেছে। চোখ দু'টো স্থির। এখনি যেন স্খলিতমূল গাছের মত ভেঙ্গে পড়বে! ভয়ার্ত মুখখানা এক বীভৎস দৃশ্যের মত স্মৃতির পর্দায় আনাগোনা করে। সেই মুখখানাকে স্মরণ করতে গিয়ে এই মধ্যরাত্রির অন্ধকারেও সুপ্রিয় শিউরে উঠলো।

সুপ্রিয়র জীবনে প্রথম ফাঁসির হুকুম।

আগেও খুনের আসামী এসেছে। মেয়েমানুষের রেষারেষি নিয়ে দুই বন্ধুর খুনোখুনি। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম দিতে হয়েছিল সেবার। কিন্তু সে তবু ভাল। তবু এই পৃথিবীর আলো বাতাসের সংস্পর্শ পাওয়া যাবে। পরমায়ু হয়ত ক্ষয় হবে কিন্তু দম বন্ধ করে আইনের দোহাই দিয়ে হত্যা—সে বড় ভীষণ! ফাঁসি কখনও দেখেনি সুপ্রিয়! ফাঁসির আসামীরা ফাঁসির সময় কী ভাবে কে জানে! শেষ মুহূর্তে কত হাস্যকর অনুরোধ করে ফাঁসির আসামীরা। কে একজন ফাঁসির আগের দিন চেয়েছিল এক ছড়া ফুলের মালা, একটা আদ্দির পাঞ্জাবী আর এক শিশি আতর।

কিন্তু আর ভাবা যায় না। সমস্ত মাথাটা যেন পাথরের মত ভারী হয়েছে। ফাঁসির রায় দেবার পর সুপ্রিয় আইন মাফিক চোখ দু'টো বন্ধ করেছিল, তারপর তার দোয়াত আর কলম সরিয়ে নিয়েছিল ওরা। কিন্তু তিনটে য়্যাস্পিরিনের বড়ি খেয়েও সমস্ত শরীর যেন কেমন অসহনীয় হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যাবেলায় বাড়িতে আর থাকতে পারেনি সুপ্রিয়। চা খেয়েই

একলা বেরিয়ে পড়েছে। নদীর ধারের নিরিবিলিতে ঠাণ্ডা হাওয়ায় মাথাটা হাল্কা হওয়ারই কথা। কিন্তু এই এখানেও বংশীর পাংশু কঠিন মুখখানার চেহারা মনে পড়ে! চোখ দু'টো স্থির। এখনি এই অন্ধকারের দৃশ্যপটে বংশীর সহস্র মুখ যেন নিঃশব্দে অট্টহাস্য করে উঠছে।

কাল সারারাত জেগে রায় লিখেছিল সুপ্রিয়। তারপর আজকের বংশীর আর্তনাদ আর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়া। ঠিক তারপর থেকেই সুরু হয়েছে মাথা ধরা।

কিন্তু বিচারে যদি ভুল হ'য়ে থাকে! দণ্ডবিধির সূক্ষ্ম বিচারে যদি কোথাও গলদ থেকে থাকে! এমন হ'তে পারে পুলিশ মিথ্যে সাক্ষী সাজিয়েছে। তা অবশ্য হবে না। কিন্তু এমন হ'তে পারে খুন করার ইচ্ছে হয়ত বংশীর ছিল না। শুধু প্রতিহিংসার বশে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল বংশী আর মারাত্মকভাবে আঘাত করেছিল লক্ষ্মণকে! ওই একটু তফাতের জন্যে বংশীর বেঁচে থাকা আর মরার প্রশ্ন নির্ভর করছে।

পকেট থেকে সিগ্রেট কেস বার করে একটা সিগ্রেট ধরালে সুপ্রিয়।

এই প্রথম ফাঁসির হুকুম! চাকরীতে প্রমোশন পেয়ে প্রথম মামলা। আজ প্রমীলার সঙ্গে ভাল করে কথা বলেনি সুপ্রিয়। কোথায় বংশী দাসের বাড়ীতে এখন বংশীর বউ বাসন্তী হয়ত খুব কাঁদছে। সাক্ষ্য দিতে এসেছিল বাসন্তী। কাঠগড়ায় বংশীর দিকে চেয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিল।

জেরায় বাসন্তী বলেছিল—সব দোষ আমার হুজুর, আমাকে নিয়েই ওদের গণ্ডগোল—আমাকে জেলে দিন হুজুর—

সিগ্রেটের শেষ অংশটুকু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সুপ্রিয় বাড়ীর দিকে ফিরলো।

এ-দিকটা নির্জন। বড় বড় শিশুগাছ দু'পাশে। মাঝখান দিয়ে অন্ধকার রাস্তা। জনহীন রাস্তায় চলতে চলতে সুপ্রিয়র যেন মনে হয় পেছনে নিঃশব্দ পায়ে কে তাকে অনুসরণ করছে। অথচ সত্যি সত্যি তো আর তার

ফাঁসি হয়নি এখনও। এখনও অনেক সূর্যের আলো আর তাপ পড়বে এই পৃথিবীর ওপর। অনেক বায়ু নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করবে বংশী দাস।

এখানে এসে রাস্তাটা বাজারের দিকে ঘুরে গিয়েছে। ওদিকে উকীল-পাড়া! ভবনাথবাবু বংশী দাসের পক্ষ নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু সাক্ষ্য প্রমাণে এমন কিছুই ছিল না যাতে বংশী দাসকে বাঁচানো যায়। কিন্তু সুপ্রিয়র ক্ষমতা কতটুকুই বা!

সাক্ষী ভূষণ গাজীর কথাগুলো মনে পড়লো। সে দেখেছে সব। তিনবার ছোরা চালিয়েছিল বংশী দাস লক্ষ্মণের বুকে! তারপর বাড়ি ফিরে গিয়ে হঠাৎ কী মনে হয়েছে বংশীর। জামাকাপড় বদলে আবার বেরিয়েছে—

বাসন্তী বলেছে—ভাত বেড়েছি—খেয়ে যাও—

—দাঁড়া আসছি—বলে বংশী নাকি আবার এসেছিল এইখানে। এই শিশুগাছের জঙ্গলের পথে। তারপর সেই মৃত লক্ষ্মণের দেহটা নিয়ে......

—নমস্কার—

চমকে উঠেছে সুপ্রিয়। ভবনাথবাবু সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। সুপ্রিয়ও দু'হাত তুলে নমস্কার করলে।

ভবনাথবাবু বললেন—একটা কথা ছিল স্যার আপনার সঙ্গে—

সুপ্রিয় কৌতূহলী দৃষ্টিতে চাইলে। বংশী দাসের কথা! বংশী দাসের সঙ্গে জেলে দেখা করতে চেয়ে ওর বউ কাল নাকি দরখাস্ত করেছিল! তা সুপ্রিয় কি করতে পারে। বংশী দাস জেলখানায় আছে পুলিশের হেফাজতে। এখন বংশী দাসের জীবন ভারী দামী! অত্যন্ত যত্ন আর অত্যন্ত সাবধানতা নেওয়া হবে বংশী দাসের জীবনের জন্যে। যখন সে স্বাধীন ছিল তখন সে খেতে পাচ্ছে কি উপোস করছে দেখবার কেউ ছিল না। কিন্তু এখন আসামী সে। যে-সে আসামী নয়, খুনের আসামী। তার খাওয়া, থাকা, বাঁচার ব্যবস্থা নিয়ে পুলিশের ত্রুটি হবে না।

সুপ্রিয় বললে—বলুন—

ভবনাথবাবু বললেন—এখানে র‍্যাশনের দোকানে কাপড় যা এসেছে স্যার, পরা যায় না—ভেতরে ভেতরে ভাল কাপড়গুলো ব্ল্যাক মার্কেট হয়ে যাচ্ছে খবর পেলাম—

গোটাকতক বাজে কথা বলে ভবনাথবাবু চলে গেলেন। আশ্চর্য লাগলো সুপ্রিয়র। তার মক্কেলের আজ ফাঁসির রায় বেরুল আর আজই নিশ্চিন্ত মনে ভবনাথবাবু কাপড়ের কথা ভাবছেন। সুপ্রিয় ভাবলে একবার ডাকবে নাকি ভবনাথবাবুকে! প্রবীণ উকীল তিনি! পনেরো দিন সময় দিয়েছে সুপ্রিয় আপীলের জন্যে! আপীল করবার কথাটা একবার মনে করিয়ে দিলে হতো! কিন্তু ভবনাথবাবু তখন অনেক দূর চলে গেছেন।

বাড়ি ফিরে নিজেকে যেন কেমন দুর্বল মনে হলো সুপ্রিয়র।

প্রমীলা গায়ে হাত দিয়ে বললে—একি গা' যে গরম তোমার—জ্বর হলো নাকি—

সকাল বেলাই জ্বর বেড়ে গিয়ে একশ তিন ডিগ্রীতে দাঁড়াল। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। সমস্ত মাথাটা যেন কে কেটে ফেলছে। প্রমীলা বললে—পরশু রাত জেগেই তোমার এই হয়েছে—

রাত জাগার জন্যে জ্বর যে হয়নি সুপ্রিয় তা ভালো করেই জানে। তবু শরীর তার সহজে সারবে না মনে হলো। সেইদিনই লম্বা ছুটির দরখাস্ত করে দিল সুপ্রিয়।

লম্বা তিন মাসের ছুটি। কলকাতায় এসে সুপ্রিয় বিশ্রাম নিল অনেক দিন। জ্বর আজকাল আসে না। এখানে এসে পুরোন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলো। প্রচুর বই পাওয়া যায়—কিন্তু ভয় হয় মনের ভেতর। আবার যেতে হবে ফিরে। আবার সেই শিশুগাছের জঙ্গল—সেই ভবনাথবাবু—সেই আদালত।

বংশী দাস আপীল করেছে হাইকোর্টে!

খবরটা পেয়ে অনেকটা স্বস্তি পেলে সুপ্রিয় !

প্রমীলা গাড়ী নিয়ে বেরোয় এদিক ওদিকে। নানা লোকের সঙ্গে তার দেখা করা দরকার। সুপ্রিয়র চাকরীতে অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে—খবরটা বোধহয় চারিদিকে প্রচার করা দরকার। আত্মীয় অনাত্মীয় পরিচিত অপরিচিত সকলের ঈর্ষার উদ্রেক হলে প্রমীলার সার্থকতা প্রমাণ হবে !

সিনেমার শেষ শো'তে গিয়ে বসেছিল সুপ্রিয়। কখন আরম্ভ হয়েছে, কখন শেষ হলো বুঝতে পারা যায়নি। ট্রাম বাস বন্ধ হ'য়ে গেছে। ট্যাক্সি করা চলতো। কিন্তু গ্রীষ্মকালের রাত। আবার অনেকদিন পরে অন্ধকারে একলা একলা হাঁটতে ইচ্ছে হলো সুপ্রিয়র।

চৌরঙ্গী ধরে হাঁটতে লাগল সুপ্রিয়। বড় নির্জন রাস্তা। হঠাৎ অনেক দূর এসে সুপ্রিয়র মনে হলো কে যেন নিঃশব্দ পদে তাকে অনুসরণ করছে। পেছন ফিরে চাইলে সুপ্রিয়। কেউ তো কোথাও নেই। অনেকদিন আগের সেই শিশুগাছের জঙ্গলের রাস্তার কথা মনে পড়লো। সেদিন রায় দিয়েছে সুপ্রিয় বংশী দাসের খুনের মামলায়! বংশী দাস! নামটা মনে পড়তেই ভয়ে শিউরে উঠলো সুপ্রিয়। কিন্তু সে তো এখনো হাজতে! এখনও পুলিশ প্রহরী পাহারা দিচ্ছে বংশী দাসের অমূল্য পরমায়ুকে! সে তো এখনো বেঁচে আছে! সে আপীল করেছে! হাইকোর্ট পূজোর ছুটির পর খুললেই আবার তার মামলার আপীলের শুনানী হবে!

কে জানে! হয়ত অবিচার হয়েছে বংশী দাসের ওপর। ভারতীয় দণ্ডবিধির তিন শ' তুই ধারা প্রয়োগ করা হয়ত অন্যায় হয়েছে!

অনেক দূর আসতে আসতে ভবানীপুরের রাস্তায় সুপ্রিয় দেখলে এখানে রাত অনেক হয়েছে। তু' একটা পানের দোকান তখনও খোলা আছে। এবার একটা ট্যাক্সি করলে হয়!

হঠাৎ সুপ্রিয় দেখলে—জনহীন রাস্তার ওপর দিয়ে অত্যন্ত মৃত্ন গতিতে সাইকেল চালিয়ে চলেছে একটি পুলিশ সার্জেণ্ট আর তারই পিছন পিছন

চলেছে আর একটি কনস্টেবল্ একটা ছোট থলি হাতে নিয়ে। থলির ভেতরে যেন ভারি কিছু রয়েছে।

মন্থরগতি সাইকেলের ওপর পুলিশ সার্জেণ্ট এদিক ওদিক চাইছে।

হঠাৎ গতি থেমে গেল সাইকেলের। ফুটপাথের একধার থেকে একটা কুকুর 'ঘেউ' 'ঘেউ' শব্দে চীৎকার করতে করতে এগিয়ে এল।

সার্জেণ্টের ইঙ্গিত পেয়ে পিছনের কনস্টেবল্ তার থলি থেকে কী একটা জিনিষ ছুঁড়ে ফেললে কুকুরটার দিকে। কুকুরটা দৌড়ে গিয়ে নিমেষের মধ্যে মুখে পুরে দিলে। বোধহয় লোভনীয় মুখরোচক কোন খাদ্যপিণ্ড। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিকট চীৎকার করে কুকুরটা বন্ বন্ করে চরকীর মত ঘুরতে লাগলো। তার কিছুক্ষণ পরে আর নড়ল না কুকুরটা—

কিছুক্ষণ চেয়ে দেখলো সুপ্রিয়।

সার্জেণ্টের ইঙ্গিত পেয়ে কনস্টেবল্টা এসে সুপ্রিয়কে বললে—বাবুজী ওদিকে দেখবেন না—সরে যান্—

মাথাটা সত্যিই সেদিনকার মত আবার ঘুরতে সুরু করেছে সুপ্রিয়র। অনেক দূর গিয়ে সুপ্রিয়র মনে হলো যেন আর একটা কুকুরের ঠিক আগেকার মতন বিকট চীৎকার উঠল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সমস্ত নিস্তব্ধ। তবে কি সারা রাত এমনি চলবে ?

সামনে থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে উঠে পড়ল সুপ্রিয়। আজ আর হাঁটার শক্তি নেই তার।

প্রমীলা গায়ে হাত দিয়ে বললে—এ কি আবার তোমার জ্বর এল—রাত্রে হেঁটে বেড়িয়েই তোমার অসুখ করেছে—কী যে তোমার হাঁটার সখ—গাড়ী থাকতে এত হাঁটা—

রাস্তায় হাঁটার জন্যে যে জ্বর হয়নি তা' সুপ্রিয় ভাল করেই জানে! তবু শরীর তা'র সহজে সারবে না বলে মনে হলো। অথচ ছুটিও তার

ফুরিয়ে এসেছে। আবার সেই আদালত, শিশুগাছের জঙ্গল—সেই ভবনাথবাবু —সেই বংশী দাস, বাসন্তী, লক্ষ্মণের মৃত আত্মা···

সব জিনিষ সংগ্রহ করা হচ্ছে। বিদেশে অনেক জিনিষ পয়সা থাকলেও সময়মত পাওয়া যায় না। ছোটখাটো স্টেশনারী জিনিষ—টুথপেস্ট থেকে আরম্ভ করে তোয়ালে, গামছা, পাপোষ, ঝাড়ন, যাবতীয় সংসারের খুঁটিনাটি জিনিষ।

তারপর আছে প্রমীলার শাড়ী, ব্লাউজ, গয়না···

সুপ্রিয়র নিজের স্যুট, ছাতা, জুতো, ফ্লাস্ক, কী নয়?

প্রমীলা নিজের জিনিষগুলো সুযোগ মত নিজেই কিনে নিয়েছে। সুপ্রিয়কে কিনতে যেতে হলো টুকিটাকিগুলো। সকাল বেলা বেরিয়ে এ-দোকান ও-দোকান ঘুরে কিনতে হলো সব। আবার প্রায় বহুদিনের মত যাওয়া। হয়ত এক বছর পরে কলকাতায় আসবার সুযোগ হবে।

সুপ্রিয় জিনিষগুলো কিনে যখন বাড়ী ফিরল তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে।

চাকরটা গাড়ী থেকে মালপত্র এনে নামিয়ে রাখল।

প্রমীলা বললে—এটা কী? দড়ি একগাছা কিনেছ কী করতে?

—দড়ি?

নিজেই অবাক হয়ে গেছে সুপ্রিয়। দড়ি কেনবার তো কথা ছিল না। দড়িটা কখন সে কিনলে! সরু সাদা সুতোর তৈরী চমৎকার কয়েক গজ দড়ি! সুপ্রিয় চমকে উঠলো। এতখানি দড়ি সে কেন কিনেছে!

প্রমীলা বললে—দড়ি নিয়ে কি গলায় দেব নাকি?

তাই তো বটে! সুপ্রিয়র যেন মাথার ভেতর সব গোলমাল হয়ে গিয়েছে। চকচকে ঝকঝকে দড়িটা যেন জীবন্ত একটা সাপের মত সুপ্রিয়র

দিকে ফণা তুলে চেয়ে দেখছে! মাথাটা কি আবার ব্যথা করে উঠছে! আবার বোধহয় তার জ্বর আসবে!

খাওয়া দাওয়ার পর সুপ্রিয় ইজি চেয়ারে শুয়ে খবরের কাগজ নিয়ে বসলো। সকাল থেকে আজ খবরের কাগজ দেখাও হয়নি একবার।

কাগজটা খুলেই চমকে উঠলো সুপ্রিয়!

বড় বড় হেড লাইনে লেখা রয়েছে—কোন এক ফাঁসির আসামী আত্মহত্যা করেছে। ফাঁসির প্রাক্কালে বিষপানে আত্মহত্যা করেছে।

খবরটা পড়তে পড়তে হঠাৎ সুপ্রিয়র বংশী দাসের কথা মনে পড়লো। বাসন্তী তো বংশীকে বাঁচাতে পারে। দেখা করবার সময় লুকিয়ে বিষ নিয়ে গিয়ে দেখা করতে পারে সে। তারপর আর জেলের ফাঁসির দড়ি তাকে স্পর্শ করবে না। অব্যাহতি পাবে বংশী। ফাঁসির দড়ির অপমান থেকে অব্যাহতি পাবে! তা'ছাড়া শুধু কি বংশীই অব্যাহতি পাবে? সুপ্রিয়কেও তো অব্যাহতি দিয়ে যাবে! প্রতিদিনের এই মানসিক অশান্তির উপদ্রব থেকে বংশী তাকে অব্যাহতি দিতে পারে!

ছুটি ফুরিয়ে গেছে। রাত্রের ট্রেণে যাওয়া। আবার সেই আদালত—সেই শিশুগাছের জঙ্গল—সেই ভবনাথবাবু······প্রমীলা আত্মীয়স্বজনদের বাড়ি দেখা করতে চলে গেছে।

সকালবেলা খবরের কাগজ পড়তে পড়তে হঠাৎ একটা খবরে সুপ্রিয়র চোখ আটকে গেল।

বংশী দাসের মামলার আপীলের রায় বেরিয়েছে। সুপ্রিয়র সমস্ত শরীরে যেন রোমাঞ্চ হলো। পূজোর ছুটির পর হাইকোর্ট খোলার সঙ্গে সঙ্গে বংশী দাসের বিচার সুরু হয়েছিল। তার যবনিকা পাত হয়েছে। সুপ্রিয় একটা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেললে। হঠাৎ তার মনে হলো যেন বহুদিন পরে রোগমুক্ত হয়েছে সে। জানালা দিয়ে শরতের রোদ এসে মেঝেতে পড়েছে। সেই রোদের সোনা যেন বিধাতার আশীর্বাদ বলে মনে হলো সুপ্রিয়র।

পাশের বারান্দায় চাকরটা মালপত্র বাক্স বিছানা গুছিয়ে রাখছিল। সুপ্রিয় সেখানে গেল। সেই সেদিনের কেনা দড়িটা দিয়ে একটা বিছানার বাণ্ডিল কষে কষে বাঁধছে চাকরটা। সুপ্রিয়ই দড়িটা কিনে এনেছিল। কিন্তু চাকরটা সেটাকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। সুপ্রিয়র আর কোনও দায়িত্বই নেই—

অনেক দেরী করে প্রমীলা ফিরে এল। একতলায় প্রমীলার গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে জানালার বাইরে দৃষ্টি দিয়ে সুপ্রিয়র মনে হলো অবিচার তবে সে করেনি। আইন পাশ করা তার তবে ব্যর্থ হয়নি। বংশী দাসের ফাঁসি হয়েছে সুপ্রিয় বেঁচেছে! অন্ততঃ তার মান মর্যাদা বজায় রইল। তার বিচার নির্ভুল।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে সুপ্রিয়।

আর একজন মহাপুরুষ

"যে মহাপুরুষের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার জন্যে আমরা আজ এখানে সমবেত হয়েছি, তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যদি এই বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা তাদের জীবন গঠন করে—তাঁর জীবন-দর্শনকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করে, তবেই আমাদের আজকের এই সভা সার্থক—আমি সমবেত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাদের অনুরোধ করি, তাঁরা যেন এই মহাপুরুষের সাধনাকে সফল করতে চেষ্টা করেন। বাঙলা দেশ আজো নিঃস্ব হয়নি··· আমাদের অনেক সৌভাগ্য যে, করুণাপতিবাবু আমাদের এই বাঙলা দেশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন···রামমোহন বিবেকানন্দের বাঙলা দেশ, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বাঙলা দেশ, নেতাজী দেশবন্ধুর বাঙলা দেশ—এই বাঙলা দেশই আর একজন—আর একজন মহাপুরুষের জন্মভূমি—ধন্য বাঙলা দেশ, ধন্য করুণাপতিবাবু—ধন্য আমরা—"

এক-একজন বক্তৃতা দেন আর প্রচুর হাততালি।

করুণাপতি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে বিরাট সভা বসেছে। এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা করুণাপতি মজুমদারের জন্মবার্ষিকী। ওপাশে করুণা-পতিবাবুর বিরাট অয়েল পেন্টিং। তার ওপর প্রকাণ্ড ফুলের একটা মালা ঝুলছে। লাল শালু আর হলদে চাদরের ওপর পদ্মফুল আঁকা শামিয়ানা। ডায়াসের ওপর গণ্যমান্য কয়েকজন লোক। ফুড মিনিস্টর প্রধান সভাপতি। জেলখাটা কয়েকজন দেশনেতা। কয়েকজন সাহিত্যের পাণ্ডাও উপবিষ্ট।

একে একে অনুষ্ঠান হচ্ছে। প্রথম শ্রেণীর কয়েকজন ছাত্রীর সঙ্গীত। তারপর সভাপতি বরণ। নান্দীপাঠ, প্রধান অতিথি। সভার উদ্বোধক। মাল্যদান। তারপর কবিতা আবৃত্তি। নৃত্য। একক সঙ্গীত। বক্তৃতা। শোনা গেছে শেষে প্রচুর জলযোগের ব্যবস্থাও আছে।

করুণাপতির বড়ছেলে তথাগত মজুমদার বড় ব্যস্ত। তাঁকেই সব দেখাশোনা করতে হচ্ছে। বর্ধমানের এস. ডি. ও.। তারপরের ছেলে রাতুল মজুমদার বেহারের সিভিল সার্জেন। তারপরের ছেলে পল্লব মজুমদার রেলওয়ের চীফ ইঞ্জিনীয়ার। তারপর আরো অনেক আছে। সকলের নাম জানি না—মুখ চেনা। সবাই কৃতবিদ্য। সাত ছেলে তিন মেয়ে। সবাই আজ চারদিক থেকে এসে জুটেছে। বাবার জন্মবার্ষিকীতে তাদেরই তো খাটবার কথা। তবু মহাপুরুষরা কোনও দেশ-কালের গণ্ডিতে আবদ্ধ নন। তাই দেশের লোকেদেরও দায়িত্ব কি কিছু কম।

ওপাশে খবরের কাগজের রিপোর্টাররা সার বেঁধে খাতা পেন্সিল নিয়ে বসে লিখছে। বাঁ-পাশে মহিলাদের জায়গা। তিন মেয়ের সঙ্গে প্রধান শিক্ষয়িত্রীও বড় পরিশ্রম করছেন। গণ্যমান্যরা যদি অভ্যর্থিত না হন, জলযোগের আগেই যদি তাঁরা চলে যান! তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সব দিকে।

তথাগত একবার কাছে এসে নিচু হয়ে বললে—কাকাবাবু, আপনাকে কিছু বলতে হবে—

মুখ তুলে চাইলাম। অনেক ছোটবেলায় দেখেছি। সঙ্গে আর একটি ছেলে। বললাম—এটি কে—তোমার ছেলে নাকি ?

তথাগত বললে—না, ছোট ভাই—দেখেন নি একে—এর নাম পরাশর —পরাশর হাত জোড় করে নমস্কার করলে। বয়স বেশি নয়। দেখে মনে হলো যেন চিনি-চিনি।

করুণাপতির সব ছেলেমেয়েদেরই চিনতাম। সাতটি ছেলে তিনটি মেয়ে।

যতদূর মনে পড়ে, তখন কিন্তু নামের এত বাহার ছিল না। কিন্তু পরাশর? এ কবে হলো!

বললাম—একে তো কখনও দেখিনি—তথাগত বললে—এ আমার ছোট-ভাই···তাহলে এর পরেই কিন্তু আপনাকে বাবার সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে—

তখন দেশসেবকদের একজনের বক্তৃতা চলছিল। করুণাপতিবাবুর অসংখ্য গুণাবলীর বর্ণনা দিচ্ছিলেন। কত গোপন দান ছিল তাঁর। কত বিধবার ভরণপোষণ করতেন। দেশের ছেলেমেয়েরা কেমন করে একদিন মানুষ হবে, সেই চিন্তাই সারাদিন করতেন তিনি। আজীবনের সমস্ত উপার্জন কেমন করে এই 'করুণাপতি বালিকা বিদ্যালয়ের' জন্যে দান করে গেছেন। নীরব, একনিষ্ঠ কর্মী তিনি—কখনও যশের জন্যে লালায়িত হননি। ইনিয়ে বিনিয়ে তিনি প্রমাণ করতে লাগলেন করুণাপতিবাবু আমাদের দেশের আর একজন মহাপুরুষ—

একে একে সকলের বক্তৃতা হয়ে গেল।

তথাগত একবার কাছে এসে মুখ নীচু করে বললে—এবার আপনার পালা কিন্তু—

সভাপতি ফুড মিনিস্টর নাম ঘোষণা করলেন।

আমি উঠে মাইক্রোফোনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

করুণাপতির সম্বন্ধে আমি কী যে বলবো! অথচ এই সভায় আমার চেয়ে তাঁকে আর কে অমন করে জানতো! প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার ঘটনা।

তখন দুজনেরই রেলের চাকরি। সিভিল সার্জেনের বাড়িতে আমাদের তাসের আড্ডা। সন্ধ্যে থেকে শুরু হয়েছে—তারপর রাত এগারোটাও বাজতে চললো। কম্পাউণ্ডার হরনাথ তখন বেশ কিছু মোটারকম জমিয়ে

নিয়েছে। সিভিল সার্জেন হারছে; আমিও। আর স্যানিটারী ইন্সপেক্টর রামলিঙ্গমের না-হার, না-জিত। বাইরে ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি।

এমন সময় সিভিল সার্জেনের বাড়ির কুকুরটা ঘেউ-ঘেউ করে ডেকে উঠলো।

সিভিল সার্জেন বললে—দেখতো ফলাহারী কে ডাকে—

জুন মাসের মাঝামাঝি। সন্ধ্যে থেকে বৃষ্টি নেমেছে। খেলাটাও বেশ জমে উঠেছে। কারুরই এখন ওঠবার ইচ্ছে নেই। আর বাড়িও কারো দূরে নয়। দু'পা গেলেই যে-যার কোয়ার্টারে ঢুকে পড়া।

ভয় ছিল সিভিল সার্জেনের। কিন্তু শমন এল আমারই।

স্টেশনের জমাদারকে পাঠিয়েছে করুণাপতি। স্ত্রীর ভীষণ অসুখ। এখনি যেতে লিখেছে। জমাদার রামভক্ত হ্যাণ্ড-সিগন্যাল ল্যাম্প নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। অন্ধকার বারান্দায় নীল কোটপরা জমাদারকে যেন যমদূতের মত দেখাচ্ছে। কিন্তু তা হোক—তবু যেতে হবে। যেতেই হবে। স্টাফের অবশ্য মিথ্যে অসুখ করে। একদিন পরে দেখতে গেলেও চলে। শেষ পর্যন্ত একখানা আনফিট্ সার্টিফিকেটের পরোয়া। তাতে বড়জোর লাভ একটা রুইমাছ নয়ত কলকাতা থেকে আনিয়ে দেওয়া একসের পটোল। কিন্তু করুণাপতির সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধ। এক জেলার মানুষ। এক স্কুল থেকে পাশ-করা।

জিজ্ঞেস করলাম—ডাউন গাড়ি কিছু আছে নাকি যাবার—

রামভক্ত বললে, কণ্ট্রোল অফিসে খবর নিয়ে এসেছি—'টু-নাইন্টিন' অর্ডার হয়েছে সাড়ে বারোটায়। সেইটেতে যাওয়াই সুবিধের।

মাল গাড়ির ব্যাপার। সাড়ে বারোটায় যদি অর্ডার হয়ে থাকে, তাহলে সাড়ে বারোটাতেই যে ছাড়বে, তার কোনও ঠিক নেই। শেষ মুহূর্তে ড্রাইভার 'সিক্ রিপোর্ট' করতে পারে। গার্ড ঘুম থেকে উঠতে দেরি করতে পারে। কত রকমের হাঙ্গামা।

তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে খাওয়া-দাওয়া সেরে বেরুলাম। ঘটনাচক্রে গাড়িও রাইট টাইমে ছাড়লো। মাল গাড়ির ব্রেক-ভ্যানের মধ্যে টিম্ টিম্ করছে হ্যারিকেনের আলো। দুটি ছোট ছোট বেঞ্চি। গার্ড নিজের বিরাট বাক্সটার ওপর বসতে বললে। রামভক্তও দরজাটা ভেজিয়ে কমোডটার পাশে হাঁটু জুড়ে বসলো। বাইরে বৃষ্টির বিরাম নেই।

থ্রু ট্রেন। ঝড়ের মত উড়ে চলেছে। উড়ে চলুক আর নাই চলুক, অন্ততঃ ভেতরে বসে আমাদের তাই মনে হচ্ছে। ঝন্ ঝন্, কট্ কট্ শব্দ আর দুলুনি। ঠিক দুলুনি নয় ঝাঁকুনি। ঝাঁকুনির জ্বালায় বাক্সটা দু'হাতে ধরে বসে আছি। কণ্ট্রোল অফিসে বলা ছিল যেন বড়মুণ্ডায় থামান হয় গাড়ি। বড়মুণ্ডার স্টেশন মাস্টার করুণাপতি।

ছোট স্টেশন বড়মুণ্ডা। রাত্তিরবেলা স্টেশনটাকে দেখাই যায় না। ছোট্ট একটা ঘর। জানালার কাচ দিয়ে হ্যারিকেনের আলোটা পর্যন্ত বৃষ্টির জন্যে দেখা যাচ্ছে না। মাল গাড়ির ব্রেকটা থামলো স্টেশন থেকে এক মাইলটাক দূরে। সাবধানে দু'টো ধাপ নেবে রেলের লাইন আর দু'পাশে জড়ো-করা ব্যালাস্ট্। ক্রেপসোলের জুতো দু'টো লাইনের মধ্যেকার জঙ্গে ছপ্ ছপ্ শব্দ করে। চারিদিকে জলা আর আগাছা। আর ধূ ধূ করছে মাঠ। ঝড়ের ঝাপটা। ব্যাঙের আর ঝিঁঝিঁর ডাকে ভয় করে ওঠে। কেবল বিন্দুর মত দূরের সিগন্যালের লাল আলোটা স্থির হয়ে জ্বলছে। নামবার পরেই লাল বিন্দুটা নীলে রূপান্তরিত হলো—আর গাড়িটা একটা ঝাঁকানি দিলে। তারপর চাকায়, স্প্রিংয়ে, ব্রেকে, ওয়াগনে, ইঞ্জিনে মিলে সে এক বিচিত্র ঝঙ্কার দিতে দিতে চলতে শুরু করলো।

স্টেশন থেকে দোতলা সমান নীচুতে করুণাপতির কোয়ার্টার। রামভক্ত রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে গেল।

করুণাপতি জাফ্‌রিওয়ালা দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল। বললে—এসেছ ভাই—বাঁচালে—

সামনে জাফ্‌রি দেওয়া বারান্দা। বারান্দা মানে একফালি জায়গা। বৃষ্টির ছাটে ভেতরে সব ভিজে যায়। কিন্তু তারই ভেতরে ঘুটের বস্তা, একটা তেলচিটে ডেক্ চেয়ার, দুখানা দড়ির খাটিয়া, বেতের দোলনা, ছেলেমেয়েদের জুতোর আণ্ডিল—সব কিছু—

ছেঁড়া ফতুয়া গায়ে করুণাপতি যেন বড় বিব্রত বোধ করতে লাগলো। হঠাৎ একটা বিড়ি ধরিয়ে ফেললে। বললে—কোথায় যে তোমাকে বসতে দিই—

বললাম—বসতে তো আসিনি, তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন—

বললে—না, না, তবু—ওই দেখ না—ঘর দেখছ তো—

ঘরের ভেতরে চেয়ে দেখলাম। বারান্দার আলোটা ভেতরে গিয়ে পড়েছে। সমস্ত ঘরটা জোড়া ময়লা মশারি। ঘরের ভেতরে ঢোকবার উপায় নেই।

রামভক্ত ওষুধের ব্যাগটা নাবিয়ে দিয়েছে।

করুণাপতি বললে—তুমি আর দাঁড়িয়ে ভিজ্‌ছো কেন রামভক্ত, সারাদিন তো তোমার খাটুনির শেষ নেই—যাও একটু গড়িয়ে নাও গে—কাল সকাল থেকেই আবার ডিউটি—এখন তো ডাক্তারবাবু এসে গেছেন—বুঝলে ভাই, রামভক্ত আছে বলে তাই দু'টি ভাত পাচ্ছি—নইলে কী যে হতো—

বললাম—সে কথা থাক—বৌদিকে দেখি চল—

পাশের ঘরটাতেই রোগী শুয়ে। সাত ফুট বাই ছয় ফুট একখানা ঘর। দেয়ালের কুলুঙ্গীতে একটা ছোট টেবিল ল্যাম্প। খাটের ওপর গিয়ে বসলাম।

বললাম—জ্বরটা নেওয়া হয়েছে নাকি—

—জ্বর নেব কি করে, থারমোমিটার কি আছে, একটা সাবান কিনতে গেলেও সেই বিলাসপুরে যেতে হয়—আর কিনলেই কি থাকবে অপোগণ্ডদের

জ্বালায়—একটি-দুটি নয়তো—দশটি যে—সোজা কথা—গাছ যে ওদিকে খুব ফলন্ত—বুঝলে কিনা—

জ্বর রয়েছে খুব। বুক পরীক্ষা করলাম। জিভ্ দেখলাম। একটু বরফ থাকলে ভালো হতো। শাদা ফ্যাকাশে চোখ দুটো। চোখের তলাটা টেনে দেখলাম—রক্তহীন। সমস্ত শরীরটাই যেন বড় নীল-নীল বলে মনে হলো। হাতের পায়ের শিরাগুলো নীল হয়ে বাইরে ফুটে উঠেছে।

করুণাপতিকে জিজ্ঞেস করলাম—কখন থেকে এরকম হলো—

বললে—এই পরশু এমনি সময় থেকে, প্রথমে ভাবলাম পড়ে-ফড়ে গেছে বুঝি……তারপর কাল সকাল থেকে এমন হলো যে, কাপড় একেবারে ভেসে গেল ভাই—শয্যাশায়ী একেবারে, ভাবলাম কী করি—আমি বইটা খুলে দেখে দিলাম দু ডোজ ক্যামোমিলা টুহান্ড্রেড্—শেষে আজকের অবস্থা দেখে আর ভরসা হলো না—রামভক্তকে পাঠালাম তোমার কাছে—

জিজ্ঞেস করলাম—ক' মাস হলো—

করুণাপতিও জানে না। স্ত্রীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁগো, ক' মাস হলো তোমার—শুনছো—ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করছেন ক' মাস হলো—

কোনও উত্তর না পেয়ে করুণাপতি শেষে নিজেই বললে—পাঁচ-ছ' মাসের বেশি নয়—

বললাম—বরফ যখন নেই, তখন কপালে জলপটি দিতে হবে, আর একটু গরম জলের ব্যবস্থা করতে পারো—তলপেটে 'সেঁক্' দিলে ভালো হতো—

রামভক্তকে আবার ডাকতে হলো। করুণাপতি বললে—তোমার কষ্ট হলো রামভক্ত—কিন্তু আমি যে বিপদে পড়েছি কী করবে বলো—

সঙ্গে করে মিকশ্চার এনেছিলাম। দিলাম এক দাগ খাইয়ে। কোনও রকম চোট না লাগলে এমন হবার তো কথা নয়।

একটু পরেই রোগীর যেন বেশ আরাম হলো। দেখলাম ঘুম এসেছে।

করুণাপতি বললে—এবার বাইরে একটু বসবে চলো—তোমাকেও খুব কষ্ট দিলাম—

বাইরের ডেক্ চেয়ারটায় বসলাম। করুণাপতি সামনে টুল নিয়ে বসে আর একটা বিড়ি ধরালে। বাইরে তেমনি অঝোর বৃষ্টি। কল্ কল্ শব্দ করে সামনের রাস্তা দিয়ে জলের স্রোত বয়ে চলেছে।

করুণাপতি বললে—সেরে যাবে—কী বলো ডাক্তার—

—দেখা যাক্—

করুণাপতি আবার বললে—কপাল, সবই কপাল—এত লোকই তো বিয়ে করেছে—কিন্তু এমন বছর বছর ছেলে-হওয়া দেখেছ ভাই—এ যেন ঠিক কাঁঠাল গাছ—আজ বারো বছর বিয়ে হয়েছে, প্রথম দুটি বছর কেবল ফাঁক গিয়েছিল, তারপর সেই যে শুরু হলো, আর থামতে চায় না—নাগাড়ে চলেছে একটানা—কী খেয়ে যে এমন স্বাস্থ্য করেছে কে জানে বাবা, এমন ফলন্ত মেয়েমানুষ আমি আর দেখিনি—অথচ মাসের মধ্যে তো অর্ধেক রাত ঘরেই শুই না, নাইট্ ডিউটি করতে হয়—

মশারির মধ্যে ছোট ছেলের কান্না শোনা গেল।

করুণাপতি উঠলো।

ওই বাঁশী বেজেছে—ও নিশ্চয়ই ক্ষেন্তি—করুণাপতি মশারির ভেতর ঢুকতে গিয়ে কেমন টান পড়ে মশারির দুটো কোণ খুলে গেল।

—দুত্তোর ছাই—এমন জানলে কোন্ শালা বিয়ে করতো—দু'হাতে মশারিটা টেনে বাইরে সরিয়ে দিলে করুণাপতি। দেখলাম—গড়া গড়া ছেলেমেয়েরা শুয়ে আছে। একজন আর একজনের ঘাড়ে পা দিয়ে। গুণে দেখলাম দশটি। সাতটি ছেলে, তিনটি মেয়ে। দুটো-তিনটে ছেলে বিছানা বুঝি ভিজিয়ে দিয়েছিল। করুণাপতি সেই ভিজে বিছানার ওপরেই পিঠ চাপড়ে ক্ষেন্তিটার ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করলে। ছোটটির বয়েস ছ' মাসের বেশি নয়। করুণাপতির দিকে চেয়ে দেখলাম। ও তো এমন ছিল না

আগে। ও কি পৃথিবীর কিছু খবরই রাখে না। আজকাল তো কত রকমের উপায় বেরিয়েছে। খবরের কাগজেও তো সে-সব জিনিসের বিজ্ঞাপন থাকে!

ঘুম পাড়িয়ে উঠে এল করুণাপতি। আবার একটা বিড়ি ধরালে।

বললে—বিয়ের পর বোঁচা যখন প্রথম হলো, ভাবলাম আর নয়, একটি ছেলে—সামান্য যা চাকরি, একটি ছেলেকে ভালো করে মানুষ করে যাবো—কিন্তু বউ বললে আর একটি মেয়ে হলে হতো—তা হোক বাবা, তোমার যখন সখ, তখন হোক—কিন্তু পরের বছরেই হলো একটা ছেলে—তারপর থেকে আর কামাই দেয়নি ভাই—তাই বলি বউকে মাঝে মাঝে যে, তুমি কোন বড়লোকের ঘরে পড়লে ভালো হতো—ছেলেমেয়েগুলো অন্তত পেট পুরে তো খেতে পেতো—এ আমার কাছে এসে শুধু ব্যাঙাচির মত বাঁচা—একটা ভালো জামা কিনে দিতে পারি না—পেট ভরে খেতে দিতে পারি না—তারপর যদি বাঁচে, তো লেখাপড়া শেখাবোই বা কেমন করে, আর মেয়ে তিনটের বিয়েই বা দেব কি করে ভগবান জানেন—

ফস্ ফস্ করে করুণাপতি বিড়িতে টান দিলে কিছুক্ষণ।

—এদিকে ভাই চাকরিটাও যদি একটু ভদ্রলোকের মতন হতো তো বাঁচতুম—হেড অফিসে মুরুব্বি তো তেমন নেই কেউ—এখন কেবল মাদ্রাজীর রাজত্ব, এই দেখনা ছিলাম রায়গড়ে, দু-পয়সা হচ্ছিল, দিন গেলে কিছু না হোক তিন-চারটে টাকার মুখ দেখতে পেতাম, কারবারী মহাজন দু-পাঁচজন দিত হাতে গুঁজে, ওয়াগন-ভর্তি মুড়ি বুক হতো, মুড়িও পেতুম, ওয়াগন পিছু চার আনা হিসেবে আবার······তা ধর তোমার গিয়ে বেশ ছিলাম সেখেনে, মাইনেটায় হাত পড়তো না,—কিন্তু তেলেঙ্গীদের চক্ষুশূল হলো, হেড অফিসের আয়ার সাহেবকে ধরে ভেঙ্কটরাও সেখেনে গিয়ে এখন রাজত্ব করছে আর আমায় বদলি করে দিয়েছে এই বড়মুণ্ডায়, এখানে পানটি পর্যন্ত কিনে খেতে হয়—দুঃখের কথা আর কী বলবো ভাই—

রামভক্ত এসে বললে—এবার মা ঘুমোচ্ছে—আর কি জলপটি দিতে হবে—

করুণাপতি বললে—না থাক্—এবার তুমি একটু বিশ্রাম করগে যাও, রামভক্ত—কাল ভোরবেলা থেকেই তোমার তো আবার ডিউটি—

রামভক্ত চলে যাবার পর করুণাপতি বললে—এই রামভক্তকেই দেখ না—বেটা অনেক টাকার মালিক—সুদে খাটায়—এখনও আমার কাছে শত্-খানেক টাকা পায় বেটা—বিনা টিকিটের প্যাসেঞ্জাররা ছিটকে-ছুটকে ট্রেণ থেকে নেমে এদিক-ওদিক দিয়ে পালাবার চেষ্টা করে, ও গিয়ে ধরে, তা মাসে ওর পঞ্চাশ-ষাট টাকা উপ্‌রি আয়···দেশে বউ আছে, ছেলেপিলের বালাই নেই—টাকা পাঠিয়ে দেয়, আর এখানে একজন জোয়ান দেখে জাতওয়ালীকে রেখেছে, সে-ই রান্নাবান্না করে, রোগ হলে সেবা করে······ আর রোগ না হলে আরামসে পা টেপায়—

গল্প করতে করতে একটু যেন তন্দ্রার মতন আসছিল। হঠাৎ করুণাপতির ডাকে উঠে বসলাম। যন্ত্রণায় ছটফট করছে রোগী। উঠে ঘরে গেলাম। অবস্থা দেখে বড় ভয় হলো। পেটে অসম্ভব যন্ত্রণা। মুখ নীল হয়ে আসছে। সমস্ত শরীর সঙ্কুচিত হয়ে আসে একবার আর সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ। হাতের কাছে আর কোনও ওষুধও নেই। কিন্তু কেন এমন হলো।

বললাম—এখন বিলাসপুরে যাবার কোনও গাড়ি আছে করুণাপতি—একটা ওষুধ আনলে হতো—

বৃষ্টির মধ্যেই করুণাপতি দৌড়ে একবার স্টেশনে গেল। তখুনি আবার ফিরে এসে বললে—সেই ভোরের আগে তো আর গাড়ি নেই ডাক্তার—কী হবে—

সেদিন সেই রাত্রে মনে আছে, করুণাপতির স্ত্রীকে বাঁচাবার সে কি আপ্রাণ চেষ্টা আমার। যে-ওষুধটা দরকার শেষপর্যন্ত সেটা আনানোও

হয়েছিল বিলাসপুর থেকে। কিন্তু রোগীর সমস্ত শরীর যেন ক্রমেই নীল হয়ে আসছিল।

করুণাপতি বলেছিল—টাকা থাকলে কি আজ আমার ভাবনা—

বললাম—টাকা দিয়ে কি জীবন পাওয়া যায় নাকি—

করুণাপতি বলে—টাকা নেই বলেই তো এই বড়মুণ্ডায় পড়ে আছি—এখনি যদি হেড অফিসে গিয়ে হাজার খানেক টাকা নিতাইবাবুর হাতে গুঁজে দিতে পারতাম—আর আমার সাহেবকে হাজার চারেক, তাহলে দেখতে ওই ভেঙ্কটরাওয়ের জায়গায় আমিই গিয়ে বসতাম—বউও বাঁচতো, ছেলেপুলেগুলোকেও খাওয়াতে পরাতে, লেখাপড়া শেখাতে পারতাম—

সেদিন শেষ রাত্রে করুণাপতির স্ত্রী শেষ পর্যন্ত মারা গিয়েছিল। সমস্ত শরীরে কী যে একরকম বিষক্রিয়া শুরু হলো, কেমন সন্দেহ হলো আমার। এ তো সহজ স্বাভাবিক মৃত্যু নয়।

সেদিন শোকসন্তপ্ত করুণাপতির আমার হাত দুটো ধরে কী অঝোর ধারে কান্না। বললে—তোমাকে বলেই বলছি ভাই—বউটাকে আমিই মারলাম আজ—

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

করুণাপতি বলতে লাগলো—দশটা ছেলেমেয়ের পর একদিন যখন শুনলাম আবার নাকি একটা হবে—তখন ভাই খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে ওষুধ আনালাম একটা—সেইটে খাওয়ার পর থেকেই—

করুণাপতি কথা শেষ করতে পারলে না।

অবস্থা নিজের চোখে তো আমি দেখছি। তখনও ছেলেমেয়েরা সেই স্বল্প-পরিসর ঘরে গাদাগাদি করে শুয়ে আছে, করুণাপতির ছেঁড়া ফতুয়া আর ঘন ঘন বিড়ি খাওয়া, আর ওই নির্বান্ধব নিঃস্ব বড়মুণ্ডা স্টেশন—যেখানে স্টেশন মাস্টারকে পয়সা দিয়ে কিনে পান খেতে হয়।

সেদিন যে ডাক্তার হয়েও মিথ্যে ডেথ্-সার্টিফিকেট দিয়েছিলাম আমি,

সে শুধু করুণাপত্তির মুখের দিকে আর তার অসংখ্য অপোগণ্ডদের দিকে চেয়েই।

কিন্তু সেদিন আমিই কি ভেবেছিলাম, সেই করুণাপত্তিকেই কয়েক বছর পরে রঙ্গমঞ্চের আর এক দৃশ্যে আর এক নতুন ভূমিকায় দেখতে পাবো। কিন্তু অন্য ভূমিকা হলেও চামড়ার নিচের রক্তটা ছিল দুজনেরই এক জাতের।

আমি সেদিন একটা আলু চুরির মামলায় সাক্ষ্য দিয়ে ফিরছি। যুদ্ধ তখন বেশ ঘোরালো হয়ে বেধেছে। সিভিল টাউন থেকে বিকেল বেলা ফিরলাম তাজপুর জংশনে। যুদ্ধের প্রয়োজনে তাজপুর একটা বড় ঘাঁটি হয়ে উঠেছে। আশে পাশে ধানের আর কাপড়ের মিল। বড় বড় চার পাঁচটা শহরতলীর কাছাকাছি। শহরতলীর আশেপাশে। দুটো ডলোমাইটের খনি আছে ছ' মাইল দূরে। তারপর আছে চামড়ার কারবার। সিভিল টাউনটাই দেখবার মত। সিমেণ্ট-করা রাস্তা। আর একদিকে চলে গেছে ডিহিরির ব্রাঞ্চ লাইন। জি-আই-পি'তে গিয়ে মিশেছে। ঘি, দুধ আর ছানার দেশ। স্টেশনের সামনে বুকের পাঁজরার মত অসংখ্য লাইন মাইল দুই জুড়ে পড়ে আছে। কালো গ্র্যানাইট পাথরের স্টেশন বিল্ডিং। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান আর ইউরোপীয়ানদের কলোনী। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, মাড়োয়ারী, মহাজন, কিছুরই অভাব নেই।

দোতলার ওয়েটিং রুমের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে ওই সব দেখছিলাম।

একজন বেয়ারা এসে বললে—বড় সাহেব সেলাম দিয়া—

—কোন্ বড় সাহেব?

—টিশন মাস্টার—

স্টেশন মাস্টার! কোন্ সাহেব? তাজপুর জংশনের স্টেশন মাস্টার বরাবরই সাহেব। আগে ছিল ম্যাক্‌মারকুইস্, তারপর আসে লি-বেনেট্ তারপর আর কে ছিল জানি না। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের জন্যে নির্দিষ্ট আরো কয়েকটা স্টেশনের মধ্যে তাজপুর জংশন একটা।

বেয়ারা আমার প্রশ্নের উত্তরে বললে—মজুমদার সাব—

তারক মজুমদার। ওয়ালটেয়ারে ছিল। হয়ত প্রমোশন পেয়ে এসেছে। আমাকে চেনে। একবার এ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশন করেছিলাম তার। আমার হাতে জীবন ফিরে পেয়েছে।

খস্ খস্ দেওয়া ঘরে ঢুকে কিন্তু দেখলাম করুণাপতি মজুমদারকে—

বলাই বাহুল্য যে, অবাক হয়েছিলাম। সামনের য়্যাশ-ট্রেতে চুরোটটা রেখে উঠলো করুণাপতি। উঠলো আমাকে অভ্যর্থনা করতে।

সামনের চেয়ারে বসিয়ে বললে—শুনলাম তুমি এসেছিলে কোর্টে—শুনেই তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম, কিন্তু খবর পেলাম ওয়েটিংরুমে আরো অনেক প্যাসেঞ্জার রয়েছে, সে যা হোক—আজকে থাকছো তো—তোমার সঙ্গে আমার জরুরী দরকার আছে—

তারপর আমার উত্তরের প্রতীক্ষা না করে, চক্‌চকে পালিশ করা পেতলের কলিং বেলটা বাজিয়ে দিলে করুণাপতি। বেয়ারা আসতেই হুকুম হয়ে গেল—ডাক্তার সা'ব কা সামান মেরা বাঙলোমে পৌঁছা দেও ঔর পঁয়তালীকে মেরা পাশ ভেজ দেও—

পঁয়তালী এল। করুণাপতি বললে—ডাক্তার সাহেব খাবেন আজকে—বেশ মুখরোচক রাঁধো দিকিনি কিছু—

আমার অবশ্য অবাক হবারই কথা। টেবিলের সামনে টাই স্যুট্ পরা করুণাপতি। বনাতের টেবিলের ওপর এক টুকরো কাগজের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। সিগ্রেটের টিন রয়েছে একটা, তার পাশে জলন্ত চুরুট আধখানা। পুরোপুরি সাহেবি কায়দা কানুন। যেন ভিক্টোরিয়ান যুগের

রোমান্টিক লেখকের লেখা কোনও উপন্যাসের গল্পের মতন। বিশ্বাস না হবার গল্প।

দু'চারজন মারোয়াড়ী মহাজন ওয়াগন সাপ্লাই নিয়ে কথা বলতে ঢুকলো।

করুণাপতি তাদের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বললে। তারপর বললে—চলো যাই—

করুণাপতির সঙ্গে বাইরে এলাম। তখনও দু'চারজন পেছন পেছন আসছিল। করুণাপতি বললে—আজ হবে না—কাল সকালে সব এসো—ওয়াগন এসেছে সাত আটখানা—

যেন ক্ষুণ্ন মনে সবাই বিদায় নিলে।

এ বাংলোয় আগে সাহেবরা বাস করে গেছে। সাহেবদের জন্যেই তৈরি। বাংলোয় ঢুকতেই একজন এসে করুণাপতির হাতের টুপিটা আর গায়ের কোট খুলে নিলে। একটা গোল টেবিলের সামনে বসলাম দু'জনে। বললাম—সাতটায় যে আমার ট্রেন করুণাপতি—

—জানি—করুণাপতি বললে—কিন্তু এও জানি যে তোমার আজ না গেলেও চলবে—

তারপর দু'গ্লাস ঠাণ্ডা সরবৎ এল। করুণাপতি বললে—রাত্রে তোমার জন্যে ভাত না রুটি, কী হবে ডাক্তার—

বড়মুণ্ডা স্টেশনের সেই ছোট রেলের খলিটার কথাই আমার বার বার মনে পড়তে লাগলো। সাত ফুট বাই ছ' ফুট ঘর দুটোর চেহারা এখানে বসে মনে পড়া যেন অন্যায়। কিন্তু ক'টি বছরই বা কেটেছে! এরই মধ্যে কী এমন ঘটেছে যে এমন আমূল পরিবর্তন হতে হয়। যুদ্ধ অবশ্য বেধেছে—যুদ্ধ আমাদের পক্ষে হারও হচ্ছে বটে—জিনিসপত্রের দর বাড়ছে এই যা—বাঙলা দেশে একটা দুর্ভিক্ষও হয়ে গেছে—এ দূর দেশে সে খবরও পেয়েছি। কিন্তু তারা কোথায় সব? বাড়িটা যেন বড় নিস্তব্ধ মনে হলো। কোথায় বৌচা ক্ষেন্তির দল?

বললাম—ছেলেমেয়েদের কাউকে দেখছি নে—

—তা'রা তো কেউ এখানে থাকে না আর—তথাগত এবার ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হয়েছে ল'তে—ভাবছি ওকে দেব সিবিল সার্ভিসে আর রাতুল তো এবার ফাইন্যাল এম. বি. দিয়েছে, এখনও রেজল্ট্ বেরোয় নি—আর সেজ ছেলে পল্লবকে দিয়েছি শিবপুরে···আর সবগুলো হোস্টেলে বোর্ডিং-এ থেকে পড়ছে—জানো তো এখানে থাকলে লেখাপড়া কিচ্ছু হবে না—তাই······

শুধু বললাম—ভালোই করেছ—কিন্তু···

করুণাপতি যেন বুঝতে পারলে আমার মনের কথাটা। বললে—তুমি ভাবছ ডাক্তার—এ-সব কেমন করে হলো—কেমন করে যে হলো—আমিও ঠিক তোমায় বোঝাতে পারবো না—সেই যে বড়মুণ্ডা স্টেশনে আমার স্ত্রী· খুনই তাকে করলাম বলতে পারো—সেই হলো আমার শুরু—সেই : মরার পর থেকেই আমার সময় ভালো হলো ভাই—

তবু বুঝতে পারলাম না—

করুণাপতি বললে—আমার সাহেব রিটায়ার করলে আর রস্ সাহেব হলো এসট্যাবলিশ্‌মেণ্টের কর্তা—আর তখন হাতে ছিল বউএর গয়নাগুলো। সেইগুলো সব বেচলাম—কয়েক হাজার টাকা সঙ্গে নিয়ে গেলাম হেড্ অফিসে—নিতাইবাবুও এখন রিটায়ার করেছে—তখন সেই চেয়ারে প্রমোশন পেয়েছে জগদীশবাবু। লোকটা বরাবর মাতাল জানতাম—সোজা একেবারে বাড়িতে নিয়ে গেলাম দু'টি আসল মাল—বোতলের চেহারা দেখেই চোখ দু'টো চক্‌চক করে উঠলো জগদীশবাবুর—

করুণাপতি থামলো।

বললাম—তারপর—

—তোমাকে বলেই বলছি—আর কাউকে তো এসব বলাও যায় না—তা'ছাড়া যত সহজে বলছি—জিনিসটা তো অত সহজও নয়—কিন্তু আমার

যে তখন সঙ্গীন অবস্থা, হয় এস্পার নয়তো ওস্পার—শেষে যে কী করে কী হলো—টাকা আমি গড়িয়ে দিলুম—আর সে-ও গড়িয়ে চললো—। নইলে সেই জগদীশবাবু যে আগে দেখা হলে কথাই বলতো না—এক গ্লাসের বন্ধু হয়ে গেলাম—আর শুধু কি তাই—সেই বাঘের বাচ্ছা বস্ সাহেব, যাকে দেখলেই ভয় হতো, শেষকালে সে-ও নেশার ঝোঁকে কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলতে লাগলো—

করুণাপতি গল্প বলে আর থামে একটু।

কেমন করে করুণাপতি বড়মুণ্ডা থেকে বদলি হলো নবাবগঞ্জে, সেখানে দিন গেলে তিন চারটে টাকা হতো—সেখান থেকে বদলি হলো ভাটাপাড়ায় —সেখানে দিন গেলে গড়ে পঞ্চাশ ষাট টাকা—তারপর যুদ্ধ শুরু হলো। সেখান থেকে বদলি নাইনপুরে, তারপর বিলাসপুরে, তারপর টাটানগরে, তারপর এই তারপুরে। দিন গেলে এখানে তিনশো-চারশো টাকাও হয় কোনও কোনও দিন। এক-একটা ওয়াগন পিছু দু'শো তিনশো করে ঘুষ।

করুণাপতি বললে—গয়না বেচে সাত হাজার টাকা দিইচি বস্, দু'জনকে —সেটা ঘুষই বলতে পারো—কিন্তু ব্যাপারটা স্রেফ আসলে ভাগ্য—কই, কত লোকই তো এখন ঘুষ দেবার জন্যে তৈরি—কিন্তু ঘুষ দেওয়া বা নেওয়া কি অতই সহজ—

করুণাপতি আবার বললে—এই দেখ না, আড়াই শ' টাকা তো মোটে মাইনে পাই মাস গেলে, কিন্তু দশটা ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার পেছনেই মাসে সাতশো টাকা পড়ে যায়—তারপর আজকালকার বাজারে হোস্টেল বোর্ডিংএর খরচটা ভাবো একবার—তা রস্ সাহেবের সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে— বছরে বড়দিনের সময় পঁচিশ হাজার টাকা মেমসাহেবের কাছে দিয়ে আসি— কখনও আমায় বদলি করবে না এখান থেকে—আর দেবার মধ্যে আর একটা জিনিস দিতে হচ্ছে—জেনারেল ম্যানেজারকে একখানা নতুন ক্যাডিলাক্— কাজটা একেবারে পাকা করে নিয়েছি ভাই—

বাইরে অন্ধকার হয়ে এল। সামনের বাগানটায় অনেক ফুলের বাহার।

কথাবার্তার মধ্যেও কয়েকজন মহাজন দেখা করে গেল। সকলের একই বক্তব্য। ওয়াগন। যে কোনও প্রকারে ওয়াগন চাই। করুণাপতির বাড়িতে কয়েক ঘণ্টা বসে মনে হলো পৃথিবীতে বুঝি মানুষের একটি মাত্র পরমার্থ কাম্য—তা' হচ্ছে ওয়াগন। ওয়াগনের যে এত চাহিদা, এত বাজার দর—তা কে জানতো। এক একটা ওয়াগনের জন্যে দু'শো তিনশো টাকা অগ্রিম দিয়ে যায়। রেলের পাওনা যা', তা' পরে হবে—আগে তো গেট্-ফি দাও, পরে দর্শন।

সন্ধ্যে বেলা করুণাপতি বললে—যে জন্যে তোমায় ডাকা—সেইটে এবার বলি—

করুণাপতি কেমন গলাটা নামিয়ে আনলো।

—বড়মুণ্ডা স্টেশনে আমার স্ত্রীর বেলায় একবার সেই ভুল করেছিলাম—খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের ওষুধ খাইয়ে বউটাকে তো মেরেই ফেললাম—কিন্তু এবার আর ওই রিস্ক নেব না—তোমার সঙ্গে দেখা না হলে তোমাকে আমি খবর পাঠাতাম—

অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—তুমি কি আবার বিয়ে করেছ নাকি—

—না বিয়ে নয়, কিন্তু তবু ও-ঝঞ্ঝাটে দরকার কী?

আমি কিছু বলবার আগেই করুণাপতি ধুতি পাঞ্জাবী পরে নিয়ে ট্যাক্সি ডাকতে বলে দিয়েছে।

চক্‌বাজারের কাছে এসে একটা বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থামলো। নেমেই করুণাপতি বললে—এসো ডাক্তার—চলে এসো—

মাথা নিচু করে সিঁড়ি দিয়ে উঠছি। কিন্তু ওপরে উঠে ভারি ভালো লাগলো। করুণাপতিকে দেখে ঝি-চাকর ছুটে এসেছে। করুণাপতি গিয়ে

একেবারে খাটে বসে নির্মলাকে খবর দিতে বললে। সাদা ধবধবে উজ্জ্বল আলো। খানিক পরে নির্মলা এল।

করুণাপতি বললে—ডাক্তার, এরই। এরই কথা বলছিলাম—

এই সুদূর দেশে বাঙালী মেয়েকে কোথা থেকে সংগ্রহ করলে করুণাপতি।

করুণাপতি বললে—এমন ওষুধ দেবে ডাক্তার যাতে স্বাস্থ্যের কোনও ক্ষতি না হয়—কী বলো নির্মলা—আজ তিন মাস মাত্র হয়েছে—বেশী ভয়ের ব্যাপার নয়—এ-তোমার পাঁচ ছ' মাস নয় যে……

নির্মলা আমার দিকে একবার ভয়ে ভয়ে তাকাল। তার পাণ্ডুর চোখের দিকে চেয়ে আমি যেন কেমন ভয় পেয়ে গেলাম। চোখের সামনে নিজের ভাবী হত্যাকারীকে দেখলে কেমন ভাব হয় মনে, বলতে পারবো না। কিন্তু আমার মনে হলো—চাউনিটা যেন অনেকটা সেই রকম—

করুণাপতি বললে—তাজপুর বড় শহর—যা' কিছু ওষুধ পত্তর লাগবে, এখানে তোমায় আমি সব জোগাড় করে দিতে পারবো—তার জন্যে কিছু ভেবো না—তবে দেখো ভাই আমার ওই একটা অনুরোধ—এমন ওষুধ দেবে যাতে স্বাস্থ্যের কোনও ক্ষতি না হয়—কী বলো নির্মলা—

নির্মলাকে সাক্ষী মানা হচ্ছে, কিন্তু নির্মলা যেন কাঠের পুতুলের মত মুখ নিচু করে চেয়ারের ওপর স্থির হয়ে বসে রইল। সুডোল ফরসা দু'টো পা যেন থর থর করে কাঁপছে মনে হলো।

—তা' হলে ওই কথাই রইল—কাল ওষুধ পত্তর যোগাড় করে একেবারে নির্মলাকে দেখে যাবে—কী বলো—করুণাপতি আবার বললে।

অনেক দিন আগেকার সব কথা। তবু স্পষ্ট সব মনে আছে। সেদিন আর ফিরে যাওয়া হয়নি, পরদিন রাত্রের ট্রেনে গিয়েছিলাম।

করুণাপতির হাজার অনুরোধও আমাকে টলাতে পারে নি। যা' হোক, পরদিন সকালে করুণাপতি যেতে পারে নি চক্‌বাজারের বাড়িতে। ওষুধ-পত্র নিয়ে আমি একলাই গিয়েছিলাম। ওর বুঝি হঠাৎ কাজ পড়ে গেল একটা।

নির্মলার সেদিনকার কথাগুলো যেন এখনও আমার কানে বাজছে—

নির্মলা অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর বলেছিল—আপনাদের দু'জনের খুব বন্ধুত্ব বলে মনে হলো—কিন্তু আপনার বন্ধুকে একটা উপদেশ দিতে পারেন না—

জিজ্ঞেস করেছিলাম—কী? কী সে উপদেশ—

হঠাৎ চুপ করে গিয়েছিল নির্মলা। আমার প্রশ্নের কোনও জবাব দেয়নি—।

তবু বার বার প্রশ্ন করার পর শুধু বলেছিল—না থাক্, উনি বড়লোক, কথাটা ওঁর কানে গেলে ক্ষতিই হবে আমার, মিছিমিছি মাঝখান থেকে হয়ত রেগে গিয়ে মাসোহারা বন্ধ করে দেবেন—দেশে আমার মা উপোষ করবে, বাবার চিকিৎসা হবে না, ভাইবোনদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাবে —তার চেয়ে আপনি যা' করতে এসেছেন তাই করুন—

নির্মলার চোখের ওপর চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলাম—তবে কি এতে তোমার অনিচ্ছে আছে?

নির্মলা বলেছিল—আমার ইচ্ছে অনিচ্ছের প্রশ্ন কেন তুলছেন—আমার তো স্বাধীন ইচ্ছে বলে কিছু থাকতে নেই—আমার কাছে আমার বাবার চিকিৎসা, মা'র সংসার খরচ, ভাইবোনদের মানুষ হওয়ার প্রশ্নটাই বড়ো— যাক কী করতে হবে আমায় বলুন—

দুপুর বেলা ফিরে এসে করুণাপতিকে বলেছিলাম—হলো না করুণাপতি—

করুণাপতি অবাক্ হয়ে গেল।—কেন?

—তিন মাস বাজে কথা—দেখে বুঝলাম ছ'মাস—এখন কোনও রকম রিস্ক নেওয়া উচিত নয়। জীবন হানি হতে পারে—

—তা' হলে কী হবে? করুণাপতি যেন চিন্তিত হয়ে পড়লো।

—একটা উপায় আছে।

করুণাপতি উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে রইল আমার দিকে।

—একটা উপায়। নির্মলা মেয়েটি তো ভালো মেয়ে বলেই মনে হয়, আর তোমারও তো ঘরে স্ত্রী নেই—বিয়ে করো না কেন ওকে—

হো হো করে সাড়ম্বরে হেসে উঠেছিল করুণাপতি। বিয়ে? পাগল নাকি! এতগুলো ছেলের বাবা হয়ে! হো হো করে করুণাপতি সেদিন হেসে উঠেছিল। সেই রাত্রের ট্রেনেই আমি তাজপুর ছেড়ে চলে এসেছিলাম।

তারপর করুণাপতির সঙ্গে আর দেখা হয়নি। চাকরি থেকে রিটায়ার করে করুণাপতি কলকাতায় বাড়ী করেছিল। দেখা ক্বচিৎ হতো। একবার খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম তার বালিকা বিদ্যালয়ের জন্যে একজন সুন্দরী শিক্ষিতা স্বাস্থ্যবতী হেড মিস্ট্রেস চাই। তেমন হেড মিস্ট্রেস পেয়েছিল কি না, সে খবর পাইনি। তবে শুনেছিলাম ছেলেমেয়েরা কৃতী হয়েছে।

রাস্তায় ঘটনাচক্রে একদিন দেখা হয়েছিল করুণাপতির সঙ্গে। বললে—ভালো হেড মিস্ট্রেস পাচ্ছি না ভাই—তোমার সন্ধানে আছে কেউ?

তারপর বলেছিল—গোটা পঞ্চাশেক ফ্যান কিনবো, মোটা কমিশন দেবে এমন কোনও পার্টি আছে—আর গোটা ছয়েক সেলাই-এর কল—

জিজ্ঞেস করেছিলাম—রিটায়ার্ড লাইফ কেমন লাগছে তোমার করুণাপতি?

করুণাপতি বললে—রিটায়ার আর করলাম কোথায় ভাই—এখন ওই ইস্কুল চালাচ্ছি—তা মাস গেলে ফেলে ছড়িয়ে শ' পাঁচ-ছয় থাকে—আর অনারেবল্ প্রফেসন তো বটে—

সেই শেষ দেখা। তারপর বোঁচা কবে তথাগত হলো, ক্ষেন্তি কবে তপতী হলো—সে খবর কানে আসেনি।

বহুদিন পরে এবার কলকাতায় আসাতে 'করুণাপতি বালিকা বিদ্যালয়ে' করুণাপতির জন্মবার্ষিকী উৎসবে নিমন্ত্রণ হয়ে গেল।

সভায় ডায়াসের ওপর বসে ভাবছিলাম পুরোন সব কথা! তথাগতর পাশে ওর ছোট-ভাই পরাশর—অনেকটা যেন নির্মলার মতই মুখের আদলটা। তবে শেষ পর্যন্ত নির্মলাকে কি বিয়ে করেছিল করুণাপতি? কিম্বা······কিম্বা······কিন্তু সে কথাটা কল্পনা করতেও কেমন লজ্জা হলো।

তা' হোক—করুণাপতি আসলে যাই হোক, পৃথিবী হয়ত তাকে মহাপুরুষ বলেই একদিন জানবে। আমি নগণ্য ডাক্তার—আমি চিরকাল বাঁচবো না। করুণাপতির কলঙ্কময় অতীতের সব সাক্ষ্য যখন একেবারে মুছে যাবে—তখন আমিই বা কোথায়? কলকাতার কোনো বড় রাস্তা করুণাপতির নামের সঙ্গে হয়ত জড়িয়ে থাকবে। ভেজাল ঘি-তেল খাইয়ে যারা লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটিয়েছে—তাদের কত মর্মর মূর্তি কলকাতার রাস্তায় পার্কে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁরা। তবে মাঝখান থেকে আমি কেন নিমিত্তের ভাগী হয়ে থাকি। আগামীকালের স্কুলের ছাত্ররা হয়ত পাঠ্যপুস্তকের পাতায় করুণাপতির জীবনী পড়ে নতুন আদর্শ গ্রহণ করবে—তাতে আমি বাধা দেবার কে?

কী জানি কী যে হলো, মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে আমিও বললাম—"করুণাপতিকে আমি ছোটবেলা থেকে চিনতাম, করুণাপতি ছিলেন সত্যিকার করুণাপতি, সদাশয়, মহৎ, মহাপ্রাণ পুরুষ। অতি ছোট অবস্থা থেকে কেবলমাত্র পুরুষকার, আত্মবিশ্বাস ও কর্মনিষ্ঠার ওপর নির্ভর করে

তিনি বড় হয়েছিলেন—তাঁর জীবনে অসত্যের বা মিথ্যার কোনও স্থান ছিল না। তাঁর জীবন আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, সত্যের জয় একদিন অনিবার্য—সত্যনিষ্ঠ মানুষ একদিন স্বপ্রতিষ্ঠ হবেই। বহুদিন আগে বহুবার করে বহু মহাপুরুষ ওই একই কথা বলে গেছেন। বুদ্ধ, চৈতন্য, বিবেকানন্দ, গান্ধী, তাঁরা যা বলে গেছেন—করুণাপতি নিজের জীবন দিয়ে তা-ই কাজে পরিণত করে গেছেন—করুণাপতি বার বার বলতেন, 'ফাঁকি দিয়ে কিছু লাভ হয় না—' মহাপুরুষের এই বাণীই করুণাপতিকে প্রাতঃস্মরণীয় করে রাখবে—"